গল্পগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গল্পগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



চতুর্থ খণ্ড

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

গল্পগুচ্ছ। চতুর্থ খণ্ড

সংকলন ও গ্রন্থপরিচয়-রচনা : পুলিনবিহারী সেন

সম্পাদনা : শ্রীকানাই সামন্ত

প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬৯

সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৭০

পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৭৬, বৈশাখ ১৩৮২

বৈশাখ ১৩৮৮, বৈশাখ ১৩৯৩

ফাল্গুন ১৩৯৪

প্রকাশক শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক

বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

মুদ্রক শ্রীকালীচরণ পাল

নবজীবন প্রেস। ৬৬ গ্রে স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

গল্পগুচ্ছের পূর্ববর্তী তিন খণ্ডে বাংলা ১২৯১ কার্তিক হইতে ১৩৪০ কার্তিকের মধ্যে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রায় সকল ছোটোগল্প সংকলিত হইয়াছে। উক্ত সময়ের পূর্বে বা পরে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল ছোটোগল্প লিখিয়াছেন, বর্তমান খণ্ড প্রধানতঃ তাহারই সংকলন। অ-পূর্ব-সংকলিত 'করুণা' আখ্যানকে বড়ো গল্প মনে করা যাইতে পারে। 'মুকুট'—১২৯২ বঙ্গাব্দে বালক পত্রে প্রথম প্রকাশিত, রবীন্দ্র-রচনাবলীর চতুর্দশ খণ্ডে গল্পগুচ্ছ পর্যায়ে প্রথম সংকলিত হইয়াছে।

প্রত্যেক গল্পের শেষে সাময়িক পত্রে প্রকাশের কাল ক্ষুদ্র হরপে মুদ্রিত। যে ক্ষেত্রে দুইটি সময়ের উল্লেখ আছে, প্রথমটি রচনার কাল বুঝিতে হইবে।

সূচীপত্র

১ শেষ কথা'র পাঠান্তর

সূচীপত্র : গল্পগুচ্ছ ১-৩

১, ২, ৩ সংখ্যা যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড-জ্ঞাপক

গল্পগুচ্ছ

চতুর্থ খণ্ড

রবিবার

আমার গল্পের প্রধান মানুষটি প্রাচীন ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বংশের ছেলে। বিষয়ব্যাপারে বাপ ওকালতি ব্যবসায়ে আঁঠি পর্যন্ত পাকা, ধর্মকর্মে শাক্ত আচারের তীব্র জারক রসে জারিত। এখন আদালতে আর প্র্যাকটিস করতে হয় না। এক দিকে পুজো-অর্চনা আর-এক দিকে ঘরে বসে আইনের পরামর্শ দেওয়া, এই দুটোকে পাশাপাশি রেখে তিনি ইহকাল পরকালের জোড় মিলিয়ে অতি সাবধানে চলেছেন। কোনো দিকেই একটু পা ফসকায় না।

এই রকম নিরেট আচার-বাঁধা সনাতনী ঘরের ফাটল ফুঁড়ে যদি দৈবাৎ কাঁটাওয়ালা নাস্তিক ওঠে গজিয়ে, তা হলে তার ভিত-দেয়াল-ভাঙা মন সাংঘাতিক ঠেলা মারতে থাকে ইঁটকাঠের প্রাচীন গাঁথুনির উপরে। এই আচারনিষ্ঠ বৈদিক ব্রাহ্মণের বংশে দুর্দান্ত কালাপাহাড়ের অভ্যুদয় হল আমাদের নায়কটিকে নিয়ে।

তার আসল নাম অভয়াচরণ। এই নামের মধ্যে কুলধর্মের যে ছাপ আছে সেটা দিল সে ঘষে উঠিয়ে। বদল করে করলে অভীককুমার। তা ছাড়া ও জানে যে প্রচলিত নমুনার মানুষ ও নয়। ওর নামটা ভিড়ের নামের সঙ্গে হাটে-বাজারে ঘেঁষাঘেঁষি করে ঘর্মাক্ত হবে সেটা ওর রুচিতে বাধে।

অভীকের চেহারাটা আশ্চর্য রকমের বিলিতি ছাঁদের। আঁট লম্বা দেহ গৌরবর্ণ, চোখ কটা, নাক তীক্ষ্ম, চিবুকটা ঝুঁকেছে যেন কোনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে। আর ওর মুষ্টিযোগ ছিল অমোঘ, সহপাঠীরা যারা কদাচিৎ এর পাণি-পীড়ন সহ্য করেছে তারা একে শতহস্ত দূরে বর্জনীয় ব'লে গণ্য করত।

ছেলের নাস্তিকতা নিয়ে বাপ অম্বিকাচরণ বিশেষ উদ্‌বিগ্ন ছিলেন না। মস্ত তাঁর নজির ছিল প্রসন্ন ন্যায়রত্ন, তাঁর আপন জেঠামশায়। বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন তর্কশাস্ত্রের গোলন্দাজ, চতুষ্পাঠীর মাঝখানে বসে অনুস্বার-বিসর্গ-ওয়ালা গোলা দাগেন ঈশ্বরের অস্তিত্ববাদের উপরে। হিন্দুসমাজ হেসে বলে 'গোলা খা ডালা', দাগ পড়ে না সমাজের পাকা প্রাচীরের উপরে। আচারধর্মের খাঁচাটাকে ঘরের দাওয়ায় দুলিয়ে রেখে ধর্মবিশ্বাসের পাখিটাকে শূন্য আকাশে উড়িয়ে দিলে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটে না। কিন্তু অভীক কথায় কথায় লোকাচারকে চালান দিত ভাঙা কুলোয় চড়িয়ে ছাইয়ের গাদার উদ্দেশে। ঘরের চার দিকে মোরগদম্পতিদের অপ্রতিহত সঞ্চরণ সর্বদাই মুখরধ্বনিতে প্রমাণ করত তাদের উপরে বাড়ির বড়োবাবুর আভ্যন্তরিক আকর্ষণ। এ-সমস্ত ম্লেচ্ছাচারের কথা ক্ষণে ক্ষণে বাপের কানে পৌঁচেছে, সে তিনি কানে তুলতেন না। এমন-কি, বন্ধুভাবে যে ব্যক্তি তাঁকে খবর দিতে আসত, সগর্জনে দেউড়ির অভিমুখে তার নির্গমনপথ দ্রুত নির্দেশ করা হত। অপরাধ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ না হলে সমাজ নিজের গরজে তাকে পাশ কাটিয়ে যায়। কিন্তু অবশেষে অভীক একবার এত বাড়াবাড়ি করে বসল যে তার অপরাধ অস্বীকার করা অসম্ভব হল। ভদ্রকালী ওদের গৃহদেবতা, তাঁর খ্যাতি ছিল জাগ্রত ব'লে। অভীকের সতীর্থ বেচারা ভজু ভারি ভয় করত ওই দেবতার অপ্রসন্নতা। তাই অসহিষ্ণু হয়ে তার ভক্তিকে

অশ্রদ্ধেয় প্রমাণ করবার জন্যে পুজোর ঘরে অভীক এমন-কিছু অনাচার করেছিল যাতে ওর বাপ আগুন হয়ে ব'লে উঠলেন, 'বেরো আমার ঘর থেকে, তোর মুখ দেখব না।' এতবড়ো ক্ষিপ্রবেগের কঠোরতা নিয়মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বংশের চরিত্রেই সম্ভব।

ছেলে মাকে গিয়ে বললে, "মা, দেবতাকে অনেক কাল ছেড়েছি, এমন অবস্থায় আমাকে দেবতার ছাড়াটা নেহাত বাহুল্য। কিন্তু জানি বেড়ার ফাঁকের মধ্য দিয়ে হাত বাড়ালে তোমার প্রসাদ মিলবেই। ওইখানে কোনো দেবতার দেবতাগিরি খাটে না, তা যত বড়ো জাগ্রত হোন-না তিনি।"

মা চোখের জল মুছতে মুছতে আঁচল থেকে খুলে ওকে একখানি নোট দিতে গেলেন। ও বললে, "ওই নোটখানায় যখন আমার অত্যন্ত বেশি দরকার আর থাকবে না তখনই তোমার হাত থেকে নেব। অলক্ষ্মীর সঙ্গে কারবার করতে জোর লাগে, ব্যাঙ্ক্‌নোট হাতে নিয়ে তাল ঠোকা যায় না।"

অভীকের সম্বন্ধে আরও দুটো-একটা কথা বলতে হবে। জীবনে ওর দু উলটো জাতের শখ ছিল, এক কলকারখানা জোড়াতাড়া দেওয়া, আর-এক ছবি আঁ ওর বাপের ছিল তিনখানা মোটরগাড়ি, তাঁর মফস্বল-অভিযানের বাহন। যন্ ওর হাতেখড়ি সেইগুলো নিয়ে। তা ছাড়া তাঁর ক্লায়েন্টের ছিল মোটরের কারখানা, সেইখানে ও শখ ক'রে বেগার খেটেছে অনেক দিন।

অভীক ছবি আঁকা শিখতে গিয়েছিল সরকারী আর্ট্‌স্কুলে। কিছুকালের মধ্যেই ওর এই বিশ্বাস দৃঢ় হল যে, আর বেশিদিন শিখলে ওর হাত হবে কলে-তৈরি, ওর মগজ হবে ছাঁচে-ঢালা। ও আর্টিস্ট্‌, সেই কথাটা প্রমাণ করতে লাগল নিজের জোর আওয়াজে। প্রদর্শনী বের করলে ছবির, কাগজের বিজ্ঞাপনে তার পরিচয় বেরোল আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আর্টিস্ট্‌ অভীককুমার, বাঙালি টিশিয়ান। ও যতই গর্জন করে বললে 'আমি আর্টিস্ট্‌', ততই তার প্রতিধ্বনি উঠতে থাকল একদল লোকের ফাঁকা মনের গুহায়, তারা অভিভূত হয়ে গেল। শিষ্য এবং তার চেয়ে বেশি-সংখ্যক শিষ্যা জমল ওর পরিমণ্ডলীতে। তারা বিরুদ্ধদলকে আখ্যা দিল ফিলিস্টাইন। বলল বুর্জোয়া।

অবশেষে দুর্দিনের সময় অভীক আবিষ্কার করলে যে তার ধনী পিতার তহবিলের কেন্দ্র থেকে আর্টিস্টের নামের 'পরে যে রজতচ্ছটা বিচ্ছুরিত হত তারই দীপ্তিতে ছিল তার খ্যাতির অনেকখানি উজ্জ্বলতা। সঙ্গে সঙ্গে সে আর-একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিল যে অর্থভাগ্যের বঞ্চনা উপলক্ষ করে মেয়েদের নিষ্ঠার কোনো ইতরবিশেষ ঘটে নি। উপাসিকারা শেষ পর্যন্ত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে উচ্চমধুর কণ্ঠে তাকে বলছে 'আর্টিস্ট্‌'। কেবল নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে সন্দেহ করেছে যে স্বয়ং তারা দুই-একজন ছাড়া বাকি সবাই আর্টের বোঝে না কিছুই, ভণ্ডামি করে, গা জ্বলে যায়!

অভীকের জীবনে এর পরবর্তী ইতিহাস সুদীর্ঘ এবং অস্পষ্ট। ময়লা টুপি আর তেলকালীমাখা নীলরঙের জামা-ইজের প'রে বার্‌ন্‌কোম্পানির কারখানায় প্রথমে মিস্ত্রিগিরি ও পরে হেডমিস্ত্রির কাজ পর্যন্ত চালিয়ে দিয়েছে। মুসলমান খালাসিদের দলে মিশে চার পয়সার পরোটা আর তার চেয়ে কম দামের শাস্ত্রনিষিদ্ধ

পশুমাংস খেয়ে ওর দিন কেটেছে সস্তায়। লোকে বলেছে, ও মুসলমান হয়েছে; ও বলেছে, মুসলমান কি নাস্তিকের চেয়েও বড়ো। হাতে যখন কিছু টাকা জমল তখন অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে এসে আবার সে পূর্ণ পরিস্ফুট আর্টিস্টরূপে বোহেমিয়ানি করতে লেগে গেল। শিষ্য জুটল, শিষ্যা জুটল। চশমাপরা তরুণীরা তার স্টুডিয়োতে আধুনিক বে-আব্রু রীতিতে যেসব নগ্নমনস্তত্ত্বের আলাপ-আলোচনা করতে লাগল, ঘন সিগারেটের ধোঁয়া জমল তার কালিমা আবৃত করে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি কটাক্ষপাত ও অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললে 'পুঁজিটিভ্লি ভাল্গর'।

বিভা ছিল এই দলের একেবারে বাইরে। কলেজের প্রথম ধাপের কাছেই অভীকের সঙ্গে ওর আলাপ শুরু। অভীকের বয়স তখন আঠারো, চেহারায় নবযৌবনের তেজ ঝক্ঝক্ করছে, আর তার নেতৃত্ব বড়োবয়সের ছেলেরাও স্বভাবতই নিয়েছে স্বীকার করে।

ব্রাহ্মসমাজে মানুষ হয়ে পুরুষদের সঙ্গে মেশবার সংকোচ বিভার ছিল না। কিন্তু কলেজে বাধা ঘটল। তার প্রতি কোনো কোনো ছেলের অশিষ্টতা হাসিতে কটাক্ষে ইঙ্গিতে আভাসে স্ফুরিত হয়েছে। কিন্তু একদিন একটি শহুরে ছেলের অভদ্রতা একটু গায়ে-পড়া হয়ে প্রকাশ পেল। সেটা অভীকের চোখে পড়তেই সেই ছেলেটাকে বিভার কাছে হিড়্হিড়্ করে টেনে নিয়ে এসে বললে 'মাপ চাও'। মাপ তাকে চাইতেই হল নতশিরে আমতা আমতা করে। তার পর থেকে অভীক দায় নিল বিভার রক্ষাকর্তার। তা নিয়ে সে অনেক বক্রোক্তির লক্ষ্য হয়েছে, সমস্তই ঠিকরে পড়েছে তার চওড়া বুকের উপর থেকে। সে গ্রাহ্যই করে নি। বিভা লোকের কানাকানিতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ করেছে কিন্তু সেই সঙ্গে তার মনে একটা রোমাঞ্চকর আনন্দও দিয়েছিল।

বিভার চেহারায় রূপের চেয়ে লাবণ্য বড়ো। কেমন করে মন টানে ব্যাখ্যা করে বলা যায় না। অভীক ওকে একদিন বলেছিল, "অনাহূতের ভোজে মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ। কিন্তু তোমার সৌন্দর্য ইতরজনের মিষ্টান্ন নয়। ও কেবল আর্টিস্টের; লিওনার্দো ডা ভিঞ্চির ছবির সঙ্গেই মেলে, ইনস্ক্রুটেব্ল্।"

একদা কলেজের পরীক্ষায় বিভা অভীককে ডিঙিয়ে গিয়েছিল, তা নিয়ে তার অজস্র কান্না আর বিষম রাগ। এ যেন তার নিজের অসম্মান। বললে, "তুমি দিনরাত কেবল ছবি এঁকে এঁকে পরীক্ষায় পিছিয়ে পড়, আমার লজ্জা করে।"

কথাটা দৈবাৎ পাশের বারান্দা থেকে কানে যেতেই বিভার এক সখী চোখ টিপে বলেছিল, "মরি মরি, তোমারি গরবে গরবিনী আমি, রূপসী তোমারি রূপে।"

অভীক বললে, "মুখস্থ বিদ্যার দিগ্গজেরা জানেই না আমি কোন্ মার্কাশূন্যো পরীক্ষায় পাস করে চলেছি। আমার ছবি আঁকা নিয়ে তোমার চোখে জল পড়ে, আর তোমার শুকনো পণ্ডিতি দেখে আমার চোখের জল শুকিয়ে গেল। কিছুতেই বুঝবে না, কেননা তোমরা নামজাদা দলের পায়ের তলায় থাক চোখ বুজে, আর আমরা থাকি বদনামি দলের শিরোমণি হয়ে।"

এই ছবির ব্যাপারে দুজনের মধ্যে তীব্র একটা দ্বন্দ্ব ছিল। বিভা অভীকের ছবি বুঝতেই পারত না সে কথা সত্যি। অন্য মেয়েরা যখন ওর আঁকা যা-কিছু নিয়ে হই-হই করত, সভা করে গলায় মালা পরাত, সেটাকে বিভা অশিক্ষিতের ন্যাকামি

মনে করে লজ্জা পেত। কিন্তু তীব্র ক্ষোভে ছট্‌ফট্‌ করেছে অভীকের মন বিভার অভ্যর্থনা না পেয়ে। দেশের লোকে ওর ছবিকে পাগলামি বলে গণ্য করছে, বিভাও যে মনে মনে তাদেরই সংগে যোগ দিতে পারলে এইটেই ওর কাছে অসহ্য। কেবলই এই কল্পনা ওর মনে জাগে যে, একদিন ও য়ুরোপে যাবে আর সেখানে যখন জয়ধ্বনি উঠবে তখন বিভাও বসবে জয়মাল্য গাঁথতে।

রবিবার সকালবেলা। ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা থেকে ফিরে এসেই বিভা দেখতে পেলে অভীক বসে আছে তার ঘরে। বইয়ের পার্সেলের ব্রাউন মোড়ক ছিল আবর্জনার ঝুড়িতে। সেইটে নিয়ে কালী-কলমে একখানা আঁচড়কাটা ছবি আঁকছিল।

বিভা জিজ্ঞাসা করল, "হঠাৎ এখানে যে!"

অভীক বললে, "সংগত কারণ দেখাতে পারি, কিন্তু সেটা হবে গৌণ, মুখ্য কারণটা খুলে বললে সেটা হয়তো সংগত হবে না। আর যাই হোক, সন্দেহ কোরো না যে চুরি করতে এসেছি।"

বিভা তার ডেস্কের চৌকিতে গিয়ে বসল; বললে, "দরকার যদি হয় নাহয় চুরি করলে, পুলিসে খবর দেব না।"

অভীক বললে, "দরকারের হাঁ-করা মুখের সামনে তো নিত্যই আছি। পরের ধন হরণ করা অনেক ক্ষেত্রেই পুণ্যকর্ম, পারি নে পাছে অপবাদটা দাগা দেয় পবিত্র নাস্তিক মতকে। ধার্মিকদের চেয়ে আমাদের অনেক বেশি সাবধানে চলতে হয় আমাদের নৈতি দেবতার ইজ্জত বাঁচাতে।"

"অনেক ক্ষণ তুমি বসে আছ?"

"তা আছি, বসে বসে সাইকলজির একটা দুঃসাধ্য প্রব্লেম মনে মনে নাড়াচাড়া করছি যে তুমি পড়াশুনো করেছ, আর বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বুদ্ধিসুদ্ধিও কিছু আছে, তবু ভগবানকে বিশ্বাস কর কী করে। এখনও সমাধান করতে পারি নি। বোধ হয় বার বার তোমার এই ঘরে এসে এই রিসর্চের কাজটা আমাকে সম্পূর্ণ করে নিতে হবে।"

"আবার বুঝি আমার ধর্মকে নিয়ে লাগলে?"

"তার কারণ তোমার ধর্ম যে আমাকে নিয়ে লেগেছে। আমাদের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে সেটা মর্মঘাতী। সে আমি ক্ষমা করতে পারি নে। তুমি আমাকে বিয়ে করতে পার না, যেহেতু তুমি যাকে বিশ্বাস কর আমি তাকে করি নে, বুদ্ধি আছে ব'লে। কিন্তু তোমাকে বিয়ে করতে আমার তো কোনো বাধা নেই তুমি অবুঝের মতো সত্য মিথ্যে যাই বিশ্বাস কর-না কেন। তুমি তো নাস্তিকের জাত মারতে পার না। আমার ধর্মের শ্রেষ্ঠতা এইখানে। সব দেবতার চেয়ে তুমি আমার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য, এ কথা ভুলিয়ে দেবার জন্যে একটি দেবতাও নেই আমার সামনে।"

বিভা চুপ করে বসে রইল। খানিক বাদে অভীক বলে উঠল, "তোমার ভগবান কি আমার বাবারই মতো? আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন?"

"আঃ! কী বকছ!"

অভীক জানে বিয়ে না করবার শক্ত কারণটা কোন্‌খানে। কথাটা বিভাকে দিয়ে

বলিয়ে নিতে চায়, বিভা চুপ করে থাকে।

জীবনের আরম্ভ থেকেই বিভা তার বাবারই মেয়ে সম্পূর্ণরূপে। এত ভালোবাসা, এত ভক্তি সে আর-কোনো মানুষকে দিতে পারে নি। তার বাপ সতীশও এই মেয়েটির উপরে তাঁর অজস্র স্নেহ ঢেলে দিয়েছেন। তাই নিয়ে ওর মার মনে একটু ঈর্ষা ছিল। বিভা হাঁস পুষেছিল, তিনি কেবলই খিট্‌খিট্ করে বলেছিলেন, 'ওগুলো বড্ড বেশি ক্যাক্ ক্যাক্ করে'। বিভা আসমানি রঙের শাড়ি জ্যাকেট করিয়েছিল, মা বলেছিলেন 'এ কাপড় বিভার রঙে একটুও মানায় না'। বিভা তার মামাতো বোনকে খুব ভালোবাসত, তার বিয়েতে যেতে চাইলেই মা বলে বসলেন 'সেখানে ম্যালেরিয়া'।

মায়ের কাছ থেকে পদে পদে বাধা পেয়ে পেয়ে বাপের উপরে বিভার নির্ভর আরও গভীর এবং মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল।

মার মৃত্যু হয় প্রথমেই। তার পরে ওর বাপের সেবা অনেক দিন পর্যন্ত ছিল বিভার জীবনের একমাত্র ব্রত। এই স্নেহশীল বাপের সমস্ত ইচ্ছাকে সে নিজের ইচ্ছা করে নিয়েছে। সতীশ তাঁর বিষয়সম্পত্তি দিয়ে গেছেন মেয়েকে। কিন্তু ট্রাস্টীর হাতে। নিয়মিত মাসহারা বরাদ্দ ছিল। মোট টাকাটা ছিল উপযুক্ত পাত্রের উদ্দেশে বিভার বিবাহের অপেক্ষায়। বাপের আদর্শে এই উপযুক্ত পাত্র কে তা বিভা জানত। অন্তত অনুপযুক্ত যে কে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। একদিন অভীক এ কথা তুলেছিল; বলেছিল, "যাঁকে তুমি কষ্ট দিতে চাও না তিনি তো নেই, আর কষ্ট যাকে নিষ্ঠুর ভাবে বাজে সেই লোকটাই আছে বেঁচে। হাওয়ায় তুমি ছুরি মারতে ব্যথা পাও, আর দরদ নেই এই রক্তমাংসের বুকের 'পরে।"

শুনে বিভা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। অভীক বুঝেছিল ভগবানকে নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু বাবাকে নিয়ে নয়।

বেলা প্রায় দশটা। বিভার ভাইঝি সুস্মি এসে বললে, "পিসিমা, বেলা হয়েছে।"

বিভা তার হাতে চাবির গোছা ফেলে দিয়ে বললে, "তুই ভাঁড়ার বের করে দে। আমি এখনি যাচ্ছি।"

বেকারদের কাজের বাঁধা সীমা না থাকাতেই কাজ বেড়ে যায়। বিভার সংসারও সেই রকম। সংসারের দায়িত্ব আত্মীয়পক্ষে হালকা ছিল বলেই অনাত্মীয়পক্ষে হয়েছে বহুবিস্তৃত। এই ওর আপনগড়া সংসারের কাজ নিজের হাতে করাই ওর অভ্যাস চাকরবাকর পাছে কাউকে অবজ্ঞা করে। অভীক বললে, "অন্যায় হবে তোমার এখনই যাওয়া, কেবল আমার 'পরে নয়, সুস্মির 'পরেও। ওকে স্বাধীন কর্তৃত্বের সময় দাও না কেন। ডোমিনিয়ন স্টাটস, অন্তত আজকের মতো। তা ছাড়া আমি তোমাকে নিয়ে একটা পরীক্ষা করতে চাই। কখনও তোমাকে কাজের কথা বলি নি, আজ বলে দেখব। নতুন অভিজ্ঞতা হবে।"

বিভা বললে, "তাই হোক, বাকি থাকে কেন।"

পকেট থেকে অভীক চামড়ার কেস বের করে খুলে দেখালে। একটা কবজিঘড়ি। ঘড়িটা প্লাটিনমের, সোনার মণিবন্ধ, হীরের টুকরোর ছিট দেওয়া। বললে, "তোমাকে বেচতে চাই।"

"অবাক করেছ, বেচবে?"

"হাঁ, বেচব, আশ্চর্য হও কেন।"

বিভা মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে বললে, "এই ঘড়ি যে মনীষা তোমাকে জন্মদিনে দিয়েছিল। মনে হচ্ছে তার বুকের ব্যথা এখনও ওর মধ্যে ধুক্‌ধুক্‌ করছে। জান সে কত দুঃখ পেয়েছিল, কত নিন্দে সয়েছিল আর কত দুঃসাধ্য অপব্যয় করেছিল উপহারটাকে তোমার উপযুক্ত করবার জন্যে?"

অভীক বললে, "এ ঘড়ি সেই তো দিয়েছিল, কে দিয়েছে শেষ পর্যন্ত জানতেই দেয় নি। কিন্তু আমি তো পৌত্তলিক নই যে বুকের পকেটে এই জিনিসটার বেদি বাঁধিয়ে মনের মধ্যে দিনরাত শাঁখঘণ্টা বাজাতে থাকব।"

"আশ্চর্য করেছ তুমি। এই ক'মাস হল সে টাইফয়েডে—"

"এখন সে তো সুখদুঃখের অতীত।"

"শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে এই বিশ্বাস নিয়ে মরেছিল যে তুমি তাকে ভালোবাসতে।"

"ভুল বিশ্বাস করে নি।"

"তবে?"

"তবে আবার কী। সে নেই, কিন্তু তার ভালোবাসার দান আজও যদি আমাকে ফল দেয় তার চেয়ে আর কী হতে পারে।"

বিভার মুখে অত্যন্ত একটা পীড়ার লক্ষণ দেখা দিল। একটু ক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "এত দেশ থাকতে আমার কাছে বেচতে এলে কেন।"

"কেননা জানি তুমি দর-কষাকষি করবে না।"

"তার মানে কলকাতার বাজারে আমিই কেবল ঠকবার জন্যে তৈরি হয়ে আছি?"

"তার মানে ভালোবাসা খুশি হয়ে ঠকে।"

এমন মানুষের 'পরে রাগ করা শক্ত। জোরের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে ছেলেমানুষি। কিছুতে যে লজ্জার কারণ আছে তা যেন ও জানেই না। এই ওর অকৃত্রিম অবিবেক, এই-যে উচিত-অনুচিতের বেড়া অনায়াসে লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে চলা, এতেই মেয়েদের স্নেহ ওকে এত করে টানে। ভর্ৎসনা করবার জোর পায় না। কর্তব্যবোধকে যারা অত্যন্ত সামলে চলে মেয়েরা তাদের পায়ের ধুলো নেয়। আর যে-সব দুর্দাম দুরন্তের কোনো বালাই নেই ন্যায়-অন্যায়ের, মেয়েরা তাদের বাহুবন্ধনে বাঁধে।

ডেস্কের ব্লটিঙ কাগজটার উপর খানিক ক্ষণ নীল পেনসিলের দাগ-কাটাকাটি করে শেষকালে বিভা বললে, "আচ্ছা, যদি আমার হাতে টাকা থাকে তবে অমনি তোমাকে দেব। কিন্তু তোমার ওই ঘড়ি আমি কিছুতেই কিনব না।"

উত্তেজিত কণ্ঠে অভীক বললে, "ভিক্ষা! তোমার সমান ধনী যদি হতুম, তা হলে তোমার দান নিতুম উপহার বলে, দিতুম প্রত্যুপহার সমান দামের। আচ্ছা, পুরুষের কর্তব্য আমিই বরণ করছি। এই নাও এই ঘড়ি, এক পয়সাও নেব না।"

বিভা বললে, "মেয়েদের তো নেবারই সম্বন্ধ। তাতে কোনো লজ্জা নেই। তাই ব'লে এ ঘড়ি নয়। আচ্ছা শুনি, কেন তুমি ওটা বিক্রি করছ।"

"তবে শোনো, তুমি তো জান আমার অত্যন্ত বেহায়া একটা ফোর্ড্‌ গাড়ি আছে। সেটার চালচলনের ঢিলেমি অসহ্য। কেবল আমি বলেই ওর দশম দশা ঠেকিয়ে রেখেছি। আটশো টাকা দিলেই ওর বদলে ওর বাপদাদার বয়সী একটা পুরোনো

ক্রাইসলার পাবার আশা আছে। তাকে নতুন করে তুলতে পারব আমার নিজের হাতের গুণে।"

"কী হবে ক্রাইসলারের গাড়িতে।"

"বিয়ে করতে যাব না।"

"এমন ভদ্র কাজ তুমি করবে, এ সম্ভব নয়।"

"ধরেছ ঠিক। তা হলে প্রথমে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—শীলাকে দেখেছ—কুলদা মিত্তিরের মেয়ে?"

"দেখেছি তোমারই পাশে যখন-তখন যেখানে-সেখানে।"

"আমার পাশেই ও বুক ফুলিয়ে জায়গা করে নিয়েছে আরও পাঁচজনকে ঠেকিয়ে। ও যে প্রগতিশীলা। ভদ্রসম্প্রদায়ের পিলে চমকে যাবে এইটেতেই ওর আনন্দ।"

"শুধু কি তাই, মেয়ে-সম্প্রদায়ের বুকে শেল বিঁধবে তাতেও আনন্দ কম নয়।"

"আমারও মনে ছিল ওই কথাটা, তোমার মুখে শোনালো ভালো। আচ্ছা মন খুলে বলো, ওই মেয়েটির সৌন্দর্য কি অন্যায় রকমের নয়, যাকে বলা যেতে পারে বিধাতার বাড়াবাড়ি।"

"সুন্দরী মেয়ের বেলাতেই বিধাতাকে মান বুঝি?"

"নিন্দে করবার দরকার হলে যেমন করে হোক একটা প্রতিপক্ষ খাড়া করতে হয়। দুঃখের দিনে যখন অভিমান করবার তাগিদ পড়েছিল তখন রামপ্রসাদ মা'কে খাড়া করে বলেছিলেন, তোমাকে মা ব'লে আর ডাকব না। এতদিন ডেকে যা ফল হয়েছিল, না ডেকেও ফল তার চেয়ে বেশি হবে না—মাঝের থেকে নিন্দে করবার ঝাঁজটা ভক্ত মিটিয়ে নিলেন। আমিও নিন্দে করবার বেলায় বিধাতার নাম নিয়েছি।"

"নিন্দে কিসের।"

"বলছি। শীলাকে আমার গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিলুম ফুটবলের মাঠ থেকে খড়্‌খড়্ শব্দ করতে করতে, পিছনের পদাতিকদের নাসারন্ধ্রে ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে। এমন সময় পাকড়াশিগিন্নি—ওকে জান তো, লম্বা গজের অত্যুক্তিতেও ওকে চলনসই বলতে গেলে বিষম খেতে হয়—সে আসছিল কোথা থেকে তার নতুন একটা ফায়াট গাড়িতে। হাত তুলে আমাদের গাড়িটা থামিয়ে দিয়ে পথের মধ্যে খানিক ক্ষণ হাঁ-ভাই-ও-ভাই করে নিলে। আর ক্ষণে ক্ষণে আড়ে আড়ে তাকাতে লাগল আমার রঙ-চটে-যাওয়া গাড়ির হুড আর জরাজীর্ণ পাদানটার দিকে। তোমাদের ভগবান যদি সাম্যবাদী হতেন, তা হলে মেয়েদের চেহারায় এত বেশি উঁচুনিচু ঘটিয়ে রাস্তায় ঘাটে এ রকম মনের আগুন জ্বালিয়ে দিতেন না।"

"তাই বুঝি তুমি—"

"হাঁ, তাই ঠিক করেছি যত শিগ্‌গির পারি শীলাকে ক্রাইসলারের গাড়িতে চড়িয়ে পাকড়াশিগিন্নির নাকের সামনে দিয়ে শিঙা বাজিয়ে চলে যাব। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলো, তোমার মনে একটুখানি খোঁচা কি—"

"আমাকে এর মধ্যে টান কেন। বিধাতা আমার রূপ নিয়ে তো খুব বেশি বাড়াবাড়ি করেন নি। আর আমার গাড়িখানাও তোমার গাড়িখানার উপর টেক্কা দেবার যোগ্য নয়।"

অভীক তাড়াতাড়ি চৌকি থেকে উঠে মেঝের উপর বিভার পায়ের কাছে বসে তার হাত চেপে ধরে বললে, "কার সঙ্গে কার তুলনা। আশ্চর্য, তুমি আশ্চর্য, আমি বলছি তুমি আশ্চর্য। আমি তোমাকে দেখি আর আমার ভয় হয় কোনদিন ফস করে মেনে বসব তোমার ভগবানকে। শেষে কোনো কালে আর আমার পরিত্রাণ থাকবে না। তোমার ঈর্ষা আমি কিছুতেই জাগাতে পারলুম না। অন্তত সেটা জানতে দিলে না আমাকে। অথচ তুমি জান—"

"চুপ করো। আমি কিছু জানি নে। কেবল জানি অদ্ভুত, তুমি অদ্ভুত, সৃষ্টিকর্তার তুমি অট্টহাসি!"

অভীক বললে, "আমাকে তুমি মুখ ফুটে বলবে না, কিন্তু নিশ্চিত বুঝতে পারি শীলার সম্বন্ধে তুমি আমার সাইকলজি জানতে চাও। ওকে আমার ঘোরতর অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। অল্প বয়সে যেমন করে সিগারেট অভ্যাস হয়েছিল। মাথা ঘুরত, তবু ছাড়তুম না। মুখে লাগত তিতো, মনে লাগত গর্ব। ও জানে কী করে দিনে দিনে মৌতাত জমিয়ে তুলতে হয়। মেয়েদের ভালোবাসায় যে মদটুকু আছে, সেটাতে আমার ইন্‌স্‌পিরেশন। আমি আর্টিস্ট্‌, ও যে আমার পালের হাওয়া। ও নইলে আমার তুলি যায় আটকে বালির চরে। বুঝতে পারি আমার পাশে বসলে শীলার হৃৎপিণ্ডে একটা লালরঙের আগুন জ্বলতে থাকে, ডেন্‌জার সিগ্‌নাল, তার তেজ প্রবেশ করে আমার শিরায় শিরায়।— দোষ নিয়ো না তপস্বিনী, ভাবছ সেটাতে আমার বিলাস, না গো না— সেটাতে আমার প্রয়োজন।"

"তাই তোমার এত প্রয়োজন ক্রাইসলারের গাড়িতে!"

"তা স্বীকার করব। শীলার মধ্যে যখন গর্ব জাগে তখন ওর ঝলক বাড়ে। মেয়েদের এত গয়না কাপড় জোগাতে হয় সেইজন্যেই। আমরা চাই মেয়েদের মাধুর্য, ওরা চায় পুরুষের ঐশ্বর্য। তারই সোনালি পূর্ণতার উপরে ওদের প্রকাশের ব্যাক্‌গ্রাউন্ড্‌। প্রকৃতির এই ফন্দি পুরুষদের বড়ো করে তোলবার জন্যে। সত্যি কি না বলো।"

"সত্যি হতে পারে। কিন্তু কাকে বলে ঐশ্বর্য তাই নিয়ে তর্ক। ক্রাইসলারের গাড়িকে যারা ঐশ্বর্য বলে, আমি তো বলি, তারা পুরুষকে ছোটো করবার দিকে টানে।"

অভীক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "জানি জানি, তুমি যাকে ঐশ্বর্য বল তারই সর্বোচ্চ চূড়ায় তুমি আমাকে পৌঁছিয়ে দিতে পারতে। তোমার ভগবান মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।"

অভীকের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিভা বললে, "ওই এক কথা বার বার বোলো না। আমি তো বরাবর উলটোই শুনেছি। বিয়েটা আর্টিস্টের পক্ষে গলার ফাঁস। ইন্‌স্‌পিরেশনের দম বন্ধ করে দেয়। তোমাকে বড়ো করতে যদি আমি পারতুম, আমার যদি সে শক্তি থাকত, তা হলে—"

অভীক ঝেঁকে উঠে বললে, "পারতুম কী, পেরেছ। আমার এই দুঃখ যে আমার সেই ঐশ্বর্য তুমি চিনতে পার নি। যদি পারতে তা হলে তোমার ধর্মকর্মের সব বাঁধন ছিঁড়ে আমার সঙ্গিনী হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াতে; কোনো বাধা মানতে না। তরী তীরে এসে পৌঁছয়, তবু যাত্রী তীর্থে ওঠবার ঘাট খুঁজে পায় না।

আমার হয়েছে সেই দশা। বী, আমার মধুকরী, কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে আবিষ্কার করবে বলো।"

"যখন আমাকে তোমার আর দরকার হবে না।"

"ও-সব অত্যন্ত ফাঁপাকথা। অনেকখানি মিথ্যের হাওয়া দিয়ে ফুলিয়ে তোলা। স্বীকার করো, 'আমাকে না হলে নয়' ব'লে জেনেই উৎকণ্ঠিত তোমার সমস্ত দেহমন। সে কি আমার কাছে লুকোবে।"

"এ কথা বলেই বা কী হবে, লুকোবই বা কেন। মনে যাই থাক্, আমি কাঙালপনা করতে চাই নে।"

"আমি চাই, আমি কাঙাল। আমি দিনরাত বলব, আমি চাই, আমি তোমাকেই চাই।"

"আর সেই সঙ্গে বলবে 'আমি ক্রাইসলারের গাড়িও চাই'।"

"ওই তো, ওটা তো জেলাসি। পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ। মাঝে মাঝে ঘনিয়ে উঠুক ধোঁয়া জেলাসির, প্রমাণ হোক ভালোবাসার অন্তর্গূঢ় আগুন। নিবে-যাওয়া ভল্‌ক্যানো নয় তোমার মন। তাজা ভিসুভিয়স।"

ব'লে দাঁড়িয়ে উঠে অভীক হাত তুলে বললে, "হুরে!"

"এ কী ছেলেমানুষি করছ! এইজন্যেই বুঝি আজ সকালবেলায় এসেছিলে আগে থাকতে প্ল্যান করে?"

"হাঁ, এইজন্যেই। মানছি সে কথা। নইলে এমন মুগ্ধ কেউ কেউ জানা আছে যাকে এ ঘড়ি এখনি বেচতে পারি বিনা ওজরে অন্যায় দামে। কিন্তু তোমার কাছে কেবল তো দাম চাইতে আসি নি, যেখানে তোমার ব্যথার উৎস সেখানে ঘা মেরে অঞ্জলি পাততে চেয়েছিলেম। কিন্তু হতভাগার ভাগ্যে না হল এটা, না হল ওটা।"

"কেমন করে জানলে। ভাগ্য তো সব সময় দেখাবিন্তি খেলে না। কিন্তু দেখো, একটা কথা তোমাকে বলি— তুমি মাঝে মাঝে আমাকে জিগ্‌গেসা করেছ তোমার লীলাখেলা দেখে আমার মনে খোঁচা লাগে কি না। সত্য কথা বলি, লাগে খোঁচা।"

অভীক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "এটা তো সুসংবাদ।"

বিভা বললে, "অত উৎফুল্ল হোয়ো না। এ জেলাসি নয়, এ অপমান। মেয়েদের নিয়ে তোমার এই গায়ে-পড়া সখ্য, এই অসভ্য অসংকোচ, এতে সমস্ত মেয়েজাতের প্রতি তোমার অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। আমার ভালো লাগে না।"

"এ তোমার কী রকম কথা হল? শ্রদ্ধার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব নেই? জাতকে জাত যেখানে যাকেই দেখব শ্রদ্ধা করে করে বেড়াব? মাল যাচাই নেই, একেবারে wholesale শ্রদ্ধা? একে বলে protection, ব্যাবসাদারিতে বাইরে থেকে কৃত্রিম মাসুল চাপিয়ে দর-বাড়ানো।"

"মিথ্যে তর্ক কোরো না।"

"অর্থাৎ তুমি তর্ক করবে, আমি করব না। একেই বলে 'দিন ভয়ংকর, মেয়েরা বাক্য কবে কিন্তু পুরুষরা রবে নিরুত্তর'।"

"অভী, তুমি কেবলই কথা-কাটাকাটি করবার ওজর খুঁজছ। বেশ জান আমি বলতে চাইছিলুম মেয়েদের থেকে স্বভাবত একটা দূরত্ব বাঁচিয়ে চলাই পুরুষের

পক্ষে ভদ্রতা।"

"স্বভাবত দুরন্ত বাঁচানো, না অ-স্বভাবত? আমরা মডার্ন্, মেকি ভদ্রতা মানি নে, খাঁটি স্বভাবকে মানি। শীলাকে পাশে নিয়ে ঝাঁকানি-দেওয়া ফোর্ড্গাড়ি চালাই, স্বাভাবিকতা হচ্ছে তার পাশাপাশিটাই। ভদ্রতার খাতিরে মাঝখানে দেড়-হাত জায়গা রাখলে অশ্রদ্ধা করা হত স্বভাবকে।"

"অভী, তোমরা নিজের থেকে মেয়েদের বিশেষ মূল্য দিয়ে দামী করে তুলে-ছিলে, তাদের খেলো কর নি নিজের গরজেই। সেই দাম আজ যদি ফিরিয়ে নাও, নিজের খুশিকেই করবে সস্তা, ফাঁকি দেবে নিজের পাওনাকেই। কিন্তু মিথ্যে বকছি, মডার্ন্ কালটাই খেলো।"

অভীক জবাব দিলে, "খেলো বলব না, বলব বেহায়া। সেকালের বুড়োশিব চোখ বুজে বসেছেন ধ্যানে, এ কালের নন্দীভৃঙ্গী আয়না হাতে নিয়ে নিজেদের চেহারাকে ব্যঙ্গ করছে— যাকে বলে debunking। জন্মেছি এ কালে, বোম্-ভোলানাথের চেলা হয়ে কপালে চোখ তুলে বসে থাকতে পারব না; নন্দীভৃঙ্গীর বিদঘুটে মুখভঙ্গির নকল করতে পারলে আজকের দিনে নাম হবে।"

"আচ্ছা আচ্ছা, যাও নাম করতে দশ দিককে মুখ ভেঙচিয়ে। কিন্তু তার আগে আমাকে একটা কথা সত্যি করে বলো, তোমার কাছে আশকারা পেয়ে রাজ্যের যত মেয়ে তোমাকে নিয়ে এই-যে টানাটানি করে এতে কি তোমার ভালো লাগার ধার ভোঁতা হয়ে যায় না। তোমরা কথায় কথায় যাকে বল thrill, ঠেলাঠেলিতে তাকে কি পায়ের নীচে দ'লে ফেলা হয় না।"

"সত্যি কথাই বলি তবে, বী, যাকে বলে thrill, যাকে বলে ecstasy, সে হল পয়লা নম্বরের জিনিস, ভাগ্যে দৈবাৎ মেলে। কিন্তু তুমি যাকে বলছ ভিড়ের মধ্যে টানাটানি, সে হল সেকেন্ড্হ্যান্ড্ দোকানের মাল, কোথাও বা দাগী, কোথাও বা ছেঁড়া, কিন্তু বাজারে সেও বিকোয়, অল্প দামে। সেরা জিনিসের পুরো দাম দিতে পারে ক'জন ধনী।"

"তুমি পার অভী, নিশ্চয় পার, পুরো মূল্য আছে তোমার হাতে। কিন্তু অদ্ভুত তোমার স্বভাব, ছেঁড়া জিনিসে ময়লা জিনিসে তোমাদের আর্টিস্টের একটা কৌতুক আছে, কৌতূহল আছে। সুসম্পূর্ণ জিনিস তোমাদের কাছে picturesque নয়। থাক্ গে এ-সব বৃথা তর্ক। আপাতত ক্লাইসলারের পালাটা যতদূর সম্ভব এগিয়ে দেওয়া যাক।"

এই বলে চৌকি ছেড়ে বিভা পাশের ঘরে চলে গেল। ফিরে এসে অভীকের হাতে একতাড়া নোট দিয়ে বললে, "এই নাও তোমার ইন্স্পিরেশন্, কোম্পানি-বাহাদুরের-মার্কা-মারা। কিন্তু তাই বলে তোমার ওই ঘড়ি আমাকে নিতে বোলো না।"

চৌকিতে মাথা রেখে অভীক মেঝের উপরে বসে রইল। বিভা দ্রুতপদে তার হাত টেনে নিয়ে বললে, "আমাকে ভুল বুঝো না। তোমার অভাব ঘটেছে, আমার অভাব নেই, এমন সুযোগে—"

বিভাকে থামিয়ে দিয়ে অভীক বললে, "অভাব আছে আমার, দারুণ অভাব। তোমার হাতেই রয়েছে সুযোগ, তা পূরণ করবার। কী হবে টাকায়।"

বিভা অভীকের হাতের উপরে স্নিগ্ধভাবে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, "যা পারি নে তার দুঃখ রইল আমার মনে চিরদিন। যতটুকু পারি তার সুখ থেকে কেন আমাকে বঞ্চিত করবে।"

"না না না, কিছুতেই না। তোমারই কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে শীলাকে আমি গাড়ি চড়িয়ে বেড়াব? এ প্রস্তাবে ধিক্কার দেবে এই ভেবেছিলুম, রাগ করবে এই ছিল আশা।"

"রাগ করব কেন। তোমার দুষ্টুমি কত ক্ষণের। এটা সাংঘাতিক শীলার পক্ষে, তোমার পক্ষে একটুও না। এমন ছেলেমানুষি কতবার তোমার দেখেছি, মনে মনে হেসেছি। জানি কিছুদিনের মতো এ খেলা না হলে তোমার চলে না। এও জানি স্থায়ী হলে আরও অচল হয়। হয়তো তুমি কিছু পেতে চাও, কিন্তু তোমাকে কিছু পাবে এ সইতে পার না।"

"বী, আমাকে তুমি অত্যন্ত বেশি জান, তাই এমন ঘোরতর নিশ্চিন্ত থাক। জানতে পেরেছ আমার ভালো লাগে মেয়েদের কিন্তু সে ভালো লাগা নাস্তিকেরই, তাতে বাঁধন নেই। পাথরে-গাঁথা মন্দিরে সে পূজাকে বন্দী করব না। বান্ধবীদের সংগে গলাগলির গদ্‌গদ দৃশ্য মাঝে মাঝে দেখেছি, সেই বিহ্বল স্ত্রৈণতায় আমার গা কেমন করে। কিন্তু মেয়েরা আমার কাছে নাস্তিকের দেবতা, অর্থাৎ আর্টিস্টের। আর্টিস্ট্ খাবি খেয়ে মরে না, সে সাঁতার দেয়, দিয়ে অনায়াসে পার হয়ে যায়। আমি লোভী নই, আমাকে নিয়ে যে মেয়ে ঈর্ষা করে সে লোভী। তুমি লোভী নও, তোমার নিরাসক্ত মনের সব চেয়ে বড়ো দান স্বাধীনতা।"

বিভা হেসে বললে, "তোমার স্তব এখন রাখো। আর্টিস্ট্, তোমরা সাবালক শিশু, এবার যে খেলাটা ফেঁদেছ তার খেলনাটি নাহয় আমার হাত থেকেই নেবে।"

"নৈব নৈব চ। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার ট্রাস্টীদের মুঠো থেকে এ টাকা খসিয়ে নিলে কী করে?"

"খোলসা করে বললে হয়তো খুশি হবে না। তুমি জান অমরবাবুর কাছে আমি ম্যাথাম্যাটিক্‌স্ শিখছি।"

"সব-তাতেই আমাকে বহু দূরে এড়িয়ে যেতে চাও, বিদ্যেতেও?"

"বোকো না, শোনো। আমার ট্রাস্টীদের মধ্যে একজন আছেন আদিত্য মামা। নিজে তিনি গণিতে ফার্স্ট্‌ক্লাস মেডালিস্ট। তাঁর বিশ্বাস—যথেষ্ট সুযোগ পেলে অমরবাবু দ্বিতীয় রামানুজম্ হবেন। ওঁর কষা একটুখানি প্রব্লেম আইন্‌স্টাইনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যা উত্তর পেয়েছিলেন সেটা আমি দেখেছি। এমন লোককে সাহায্য করতে হলে তাঁর মান বাঁচিয়ে করতে হয়। আমি তাই বললুম, ওঁর কাছে গণিত শিখব। মামা খুব খুশি। শিক্ষাখাতে ট্রাস্ট্‌ফান্ড্ থেকে কিছু থোক টাকা আমার হাতে রেখে দিয়েছেন। তারই থেকে আমি ওঁকে বৃত্তি দিই।"

অভীকের মুখ কেমন এক রকম হয়ে গেল। একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, "এমন আর্টিস্ট্‌ও হয়তো আছে যে উপযুক্ত সুযোগ পেলে মিকেল আঞ্জেলোর অন্তত দাড়ির কাছটাতে পৌঁছতে পারত।"

"কোনো সুযোগ না পেলেও হয়তো পারবে পৌঁছতে। এখন বলো আমার কাছ থেকে টাকাটা নেবে কি না।"

"খেলনার দাম?"

"হাঁ গো, আমরা তো চিরকাল তোমাদের খেলনার দামই দিয়ে থাকি। তাতে দোষ কী। তার পরে আছে আঁস্তাকুড়।"

"ক্রাইসলারের আজ শ্রাদ্ধশান্তি হল এইখানেই। প্রগতিশীলার প্রগতিবেগ ভাঙা ফোর্ডেই নড়্‌নড়্ করতে করতে চল্‌ক। এখন ও-সব কথা আর ভালো লাগছে না। অমরবাবু শুনেছি টাকা জমাচ্ছেন বিলেতে যাবার জন্যে, সেখান থেকে প্রমাণ করে আসবেন তিনি সামান্য লোক নন।"

বিভা বললে, "একান্ত আশা করি তাই যেন ঘটে। তাতে দেশের গৌরব।"

উচ্চকণ্ঠে বললে অভীক, "আমাকেও তাই প্রমাণ করতে হবে, তুমি আশা কর আর নাই কর। ওঁর প্রমাণ সহজ, লজিকের বাঁধা রাস্তায়—আর্টের প্রমাণ রুচির পথে, সে রসিক লোকের প্রাইভেট পথ। সে গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোড নয়। আমাদের এই চোখে-ঠুলি-পরা ঘানি ঘোরানোর দেশে আমার চলবে না। যাদের দেখবার স্বাধীন দৃষ্টি আছে, আমি যাবই তাদের দেশে। একদিন তোমার মামাকে যেন বলতে হয় আমিও সামান্য লোক নই, আর তাঁর ভাগনীকেও—"

"ভাগনীর কথা বোলো না। তুমি মিকেল আঞ্জেলোর সমান মাপের কি না তা জানবার জন্যে তাকে সবুর করতে হয় নি। তার কাছে তুমি বিনা প্রমাণেই অসামান্য। এখন বলো, তুমি যেতে চাও বিলেতে?"

"সে আমার দিনরাত্রির স্বপ্ন।"

"তা হলে নাও-না আমার এই দান। প্রতিভার পায়ে এই সামান্য আমার রাজকর।"

"থাক্ থাক্, ও কথা থাক্; কানে ঠিক সুর লাগছে না। সার্থক হোক গণিত-অধ্যাপকের মহিমা। আমার জন্যে এ যুগ না হোক পরযুগ আছে, অপেক্ষা করে থাকবে পস্টারিটি। এই আমি বলে দিচ্ছি—একদিন আসবে যেদিন অর্ধেক রাত্রে বালিশে মুখ গুঁজে তোমাকে বলতে হবে, নামের সঙ্গে নাম গাঁথা হতে পারত চিরকালের মতো, কিন্তু হল না।"

"পস্টারিটির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না অভী, নিষ্ঠুর শাস্তি আমার আরম্ভ হয়েছে।"

"কোন্ শাস্তির কথা তুমি বলছ জানি নে, কিন্তু জানি তোমার সব চেয়ে বড়ো শাস্তি তুমি বুঝতে পার নি আমার ছবি। এসেছে নতুন যুগ, সেই যুগের বরণসভায় আধুনিক বড়ো চৌকিটাতে আমার দেখা তোমার মিলল না।"

ব'লেই অভীক উঠে চলল দরজার দিকে।

বিভা বললে, "যাচ্ছ কোথায়।"

"মিটিং আছে।"

"কিসের মিটিং।"

"ছুটির সময়কার ছাত্রদের নিয়ে দুর্গাপুজো করব।"

"তুমি পুজো করবে?"

"আমিই করব। আমি যে কিছুই মানি নে। আমার সেই না-মানার ফাঁকার মধ্যে তেত্রিশ কোটি দেবতা আর অপদেবতার জায়গার টানাটানি হবে না। বিশ্ব-

সৃষ্টির সমস্ত ছেলেখেলা ধরাবার জন্যে আকাশ শূন্য হয়ে আছে।"

বিভা বুঝল বিভারই ভগবানের বিরুদ্ধে ওর এই বিদ্রূপ। কোনো তর্ক না করে সে মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইল।

অভীক দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে বললে, "দেখো বী, তুমি প্রচণ্ড ন্যাশনালিস্ট্। ভারতবর্ষে ঐক্যস্থাপনের স্বপ্ন দেখ। কিন্তু যে দেশে দিনরাত্রি ধর্ম নিয়ে খুনোখুনি সে দেশে সব ধর্মকে মেলাবার পুণ্যব্রত আমার মতো নাস্তিকেরই। আমিই ভারতবর্ষের ত্রাণকর্তা।"

অভীকের নাস্তিকতা কেন যে এত হিংস্র হয়ে উঠেছে বিভা তা জানে। তাই তার উপরে রাগ করতে পারে না। কিছুতে ভেবে পায় না কী হবে এর পরিণাম। বিভার আর যা-কিছু আছে সবই সে দিতে পারে, কেবল ঠেকেছে ওর পিতার ইচ্ছায়। সে ইচ্ছা তো মত নয়, বিশ্বাস নয়, তর্কের বিষয় নয়। সে ওর স্বভাবের অঙ্গ। তার প্রতিবাদ চলে না। বার বার মনে করেছে এই বাধা সে লঙ্ঘন করবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কিছুতে তার পা সরতে চায় না।

বেহারা এসে খবর দিলে অমরবাবু এসেছেন। অভীক অবিলম্বে দুড়্দাড়্ করে সিঁড়ি বেয়ে চলে গেল। বিভার বুকের মধ্যে মোচড়াতে লাগল। প্রথমটাতে ভাবলে অধ্যাপককে বলে পাঠাই আজ পাঠ নেওয়া হবে না। পরক্ষণেই মনটাকে শক্ত করে বললে, "আচ্ছা, এইখানে নিয়ে আয়। বসতে বল্। একটু বাদেই আসছি।"

শোবার ঘরে উপুড় হয়ে বিছানায় গিয়ে পড়ল। বালিশ আঁকড়ে ধরে কান্না। অনেক ক্ষণ পরে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে হাসিমুখে ঘরে এসে বললে, "আজ মনে করেছিলুম ফাঁকি দেব।"

"শরীর ভালো নেই বুঝি?"

"না, বেশ আছে। আসল কথা, কতকাল ধরে রবিবারের ছুটি রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে, থেকে থেকে তার প্রকোপ প্রবল হয়ে ওঠে।"

অধ্যাপক বললেন, "আমার রক্তে এ পর্যন্ত ছুটির মাইক্রোব ঢোকবার সময় পায় নি। কিন্তু আমিও আজ ছুটি নেব। কারণটা বুঝিয়ে বলি। এ বছর কোপেন-হেগেনে সার্বজাতিক ম্যাথামেটিক্স্ কন্ফারেন্স্ হবে। আমার নাম কী করে ওদের নজরে পড়ল জানি নে। ভারতবর্ষের মধ্যে আমিই নিমন্ত্রণ পেয়েছি। এতবড়ো সুযোগ তো ব্যর্থ হতে দিতে পারি নে।"

বিভা উৎসাহের সঙ্গে বললে, "নিশ্চয় আপনাকে যেতে হবে।"

অধ্যাপক একটুখানি হেসে বললেন, "আমার উপরওয়ালা যাঁরা আমাকে ডেপুটেশনে পাঠাতে পারতেন তাঁরা রাজি নন, পাছে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। অতএব তাঁদের সেই উৎকণ্ঠা আমার ভালোর জন্যেই। তেমন কোনো বন্ধু যদি পাই যে লোকটা খুব বেশি সেয়ানা নয়, তারই সন্ধানে আজ বেরব। ধারের বদলে যা বন্ধক দেবার আশা দিতে পারি সেটাকে না পারব দাঁড়িপাল্লায় চড়াতে, না পারব কষ্টিপাথরে ঘষে দেখাতে। আমরা বিজ্ঞানীরা কিছু বিশ্বাস করবার পূর্বে প্রত্যক্ষ প্রমাণ খুঁজি, বিষয়বুদ্ধিওয়ালারাও খোঁজে—ঠকাবার জো নেই কাউকে।"

বিভা উত্তেজিত হয়ে বললে, "যেখান থেকে হোক বন্ধু একজনকে বের করবই,

হয়তো সে খুব সেয়ানা নয়, সেজন্যে ভাববেন না।"

দু-চার কথায় সমস্যার মীমাংসা হয় নি। সেদিনকার মতো একটা আধাখেঁচড়া নিষ্পত্তি হল।

অমরবাবু লোকটি মাঝারি সাইজের, শ্যামবর্ণ, দেহটি রোগা, কপাল চওড়া, মাথার সামনেদিককার চুল ফুরফুরে হয়ে এসেছে। মুখটি প্রিয়দর্শন, দেখে বোঝা যায় কারও সঙ্গে শত্রুতা করবার অবকাশ পান নি। চোখদুটিতে ঠিক অন্যমনস্কতা নয়, যাকে বলা যেতে পারে দূরেমনস্কতা— অর্থাৎ রাস্তায় চলবার সময় ওঁকে নিরাপদ রাখবার দায়িত্ব বাইরের লোকদেরই। বন্ধু ওঁর খুব অল্পই, কিন্তু যে কজন আছে তারা ওঁর সম্বন্ধে খুব উচ্চ আশা রাখে, আর বাকি যে-সব চেনা লোক তারা নাক সিটকে ওঁকে বলে হাইব্রাউ। কথাবার্তা অল্প বলেন, সেটাকে লোকে মনে করে হৃদ্যতারই স্বল্পতা। মোটের উপর ওঁর জীবনযাত্রায় জনতা খুব কম। তাঁর সাইকলজির পক্ষে আরামের বিষয় এই যে, দশজনে ওঁকে কী ভাবে সে উনি জানেনেই না।

অভীকের কাছে বিভা আজ তাড়াতাড়ি যে আটশো টাকা এনে দিয়েছিল সে একটা অন্ধ আবেগে মরিয়া হয়ে। বিভার নিয়মনিষ্ঠার প্রতি তার মামার বিশ্বাস অটল। কখনও তার ব্যত্যয় হয় নি। মেয়েদের জীবনে নিয়মের প্রবল ব্যতিক্রমের ঝটকা হঠাৎ কোন্ দিক থেকে এসে পড়ে, তিনি বিষয়ী লোক সেটা কল্পনাও করতে পারেন নি। এই অকস্মাৎ অকাজের সমস্ত শাস্তি ও লজ্জা মনের মধ্যে স্পষ্ট করে দেখে নিয়েই এক মুহূর্তের ঝড়ের ঝাপটে বিভা উপস্থিত করেছিল তার উৎসর্গ অভীকের কাছে। প্রত্যাখ্যাত সেই দান আবার নিয়মের পিল্‌পেগাড়ির মধ্যে ফিরে এসেছে। বর্তমান ক্ষেত্রে ভালোবাসার সেই স্পর্ধাবেগ তার মনে নেই। স্বাধিকার লঙ্ঘন করে কাউকে টাকা ধার দেবার কথা সে সাহস করে মনে আনতে পারলে না। তাই বিভা প্ল্যান করেছে, মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া দামী গয়না বেচে যা পাবে সেই টাকা অমরকে উপলক্ষ করে দেবে আপন স্বদেশকে।

বিভার কাছে যে-সব ছেলেমেয়ে মানুষ হচ্ছে, ও তাদের পড়ায় সাহায্য করে। আজ রবিবার। খাওয়ার পরে এতক্ষণ ওর ক্লাস বসেছিল। সকাল-সকাল দিল ছুটি।

বাক্স বের করে মেঝের উপর একখানা কাঁথা পেতে তাতে একে একে বিভা গয়না সাজাচ্ছিল। ওদের পরিবারের পরিচিত জহুরিকে ডেকে পাঠিয়েছে।

এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেল অভীকের। প্রথমেই গয়নাগুলো তাড়াতাড়ি লুকোবার ঝোঁক হল, কিন্তু যেমন পাতা ছিল তেমনি রেখে দিলে। কোনো কারণেই অভীকের কাছে কোনো কিছু চাপা দেবে, সে ওর স্বভাবের বিরুদ্ধে।

অভীক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে খানিক ক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, বুঝল ব্যাপারখানা কী। বললে, "অসামান্যের পারানি কড়ি। আমার বেলায় তুমি মহামায়া, ভুলিয়ে রাখো; অধ্যাপকের বেলায় তুমি তারা, তরিয়ে দাও। অধ্যাপক জানেন কি অবলা নারী মৃণালভুজে তাঁকে পারে পাঠাবার উপায় করেছে।"

"না, জানেন না।"

"জানলে কি এই বৈজ্ঞানিকের পৌরুষে ঘা লাগবে না?"

"ক্ষুদ্র লোকের শ্রদ্ধার দানে মহৎ লোকের অকুণ্ঠিত অধিকার, আমি তো এই জানি। এই অধিকার দিয়ে তাঁরা অনুগ্রহ করেন, দয়া করেন।"

"সে কথা বুঝলুম, কিন্তু মেয়েদের গায়ের গয়না আমাদেরই আনন্দ দেবার জন্যে, আমরা যত সামান্যই হই—কারও বিলেতে যাবার জন্যে নয়, তিনি যত বড়োই হোন-না। আমাদের মতো পুরুষদের দৃষ্টিকে এ তোমরা প্রথম থেকেই উৎসর্গ করে রেখেছ। এই হারখানি চুনির সঙ্গে মুক্তোর মিল করা, এ আমি একদিন তোমার গলায় দেখেছিলেম, যখন আমাদের পরিচয় ছিল অল্প। সেই প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিতে এই হারখানি এক হয়ে মিশিয়ে আছে। ওই হার কি একলা তোমার, ও যে আমারও।"

"আচ্ছা, ওই হারটা নাহয় তুমিই নিলে।"

"তোমার সত্তা থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া হার একেবারেই যে নিরর্থক। সে যে হবে চুরি। তোমার সঙ্গে নেব ওকে সবসুদ্ধু সেই প্রত্যাশা করেই বসে আছি। ইতিমধ্যে ওই হার হস্তান্তর কর যদি, তবে ফাঁকি দেবে আমাকে।"

"গয়নাগুলো মা দিয়ে গেছেন আমার ভাবী বিবাহের যৌতুক। বিবাহটা বাদ দিলে ও গয়নার কী সংজ্ঞা দেব। যাই হোক, কোনো শুভ কিংবা অশুভ লগ্নে এই কন্যাটির সালংকারা মূর্তি আশা কোরো না।"

"অন্যত্র পাত্র স্থির হয়ে গেছে বুঝি?"

"হয়েছে, বৈতরণীর তীরে। বরঞ্চ এক কাজ করতে পারি, তুমি যাকে বিয়ে করবে সেই বধূর জন্যে আমার এই গয়না কিছু রেখে যাব।"

"আমার জন্যে বুঝি বৈতরণীর তীরে বধূর রাস্তা নেই?"

"ও কথা বোলো না। সজীব পাত্রী সব আঁকড়ে আছে তোমার কুষ্ঠি।"

"মিথ্যে কথা বলব না। কুষ্ঠির ইশারাটা একেবারে অসম্ভব নয়। শনির দশায় সঙ্গিনীর অভাব হঠাৎ মারাত্মক হয়ে উঠলে, পুরুষের আসে ফাঁড়ার দিন।"

"তা হতে পারে, কিন্তু তার কিছুকাল পরেই সঙ্গিনীর আবির্ভাবটাই হয় মারাত্মক। তখন ওই ফাঁড়াটা হয়ে ওঠে মুশকিলের। যাকে বলে পরিস্থিতি।"

"ওই যাকে বলে বাধ্যতামূলক উদ্‌বন্ধন। প্রসঙ্গটা যদিচ হাইপথেটিক্যাল, তবু সম্ভাবনার এত কাছ-ঘেঁষা যে এ নিয়ে তর্ক করা মিথ্যে। তাই বলছি, একদিন যখন লালচেলি-পরা আমাকে হঠাৎ দেখবে পরহস্তগতং ধনং, তখন—"

"আর ভয় দেখিয়ো না, তখন আমিও হঠাৎ আবিষ্কার করব, পরহস্তের অভাব নেই।"

"ছি ছি মধুকরী, কথাটা তো ভালো শোনালো না তোমার মুখে। পুরুষেরা তোমাদের দেবী বলে স্তুতি করে, কেননা তাদের অন্তর্ধান ঘটলে তোমরা শুকিয়ে মরতে রাজি থাক। পুরুষদের ভুলেও কেউ দেবতা বলে না। কেননা অভাবে পড়লেই বুদ্ধিমানের মতো অভাব পূরণ করিয়ে নিতে তারা প্রস্তুত। সম্মানের মুশকিল তো ওই। একনিষ্ঠতার পদবিটা বাঁচাতে গিয়ে তোমাদের প্রাণে মরতে হয়। সাইকলজি এখন থাক্, আমার প্রস্তাব এই—অমরবাবুর অমরত্বলাভের দায়িত্ব আমাদেরই উপরে দাও-না। আমরা কি ওর মূল্য বুঝি নে। গয়না বেচে পুরুষকে লজ্জা দাও কেন।"

"ও কথা বোলো না। পুরুষদের যশ মেয়েদেরই সব চেয়ে বড়ো সম্পদ। যে

দেশে তোমরা বড়ো সে দেশে আমরা ধন্য।"

"এ দেশ সেই দেশই হোক। তোমাদের দিকে তাকিয়ে সেই কথাই ভাবি প্রাণপণে। এ প্রসঙ্গে আমার কথাটা এখন থাক্, অন্য এক সময় হবে। অমরবাবুর সফলতায় ঈর্ষা করে এমন খুদে লোক বাংলাদেশে অনেক আছে। এ দেশের মানুষরা বড়ো-লোকের মড়ক। কিন্তু দোহাই তোমার, আমাকে সেই বামনদের দলে ফেলো না। শোনো আমি কত বড়ো একটা ক্রিমিন্যাল পুণ্যকর্ম করেছি।—দুর্গাপুজোর চাঁদার টাকা আমার হাতে ছিল। সে টাকা দিয়ে দিয়েছি অমরবাবুর বিলেতযাত্রার ফণ্ডে। দিয়েছি কাউকে না ব'লে। যখন ফাঁস হবে, জীববলি খোঁজবার জন্যে মায়ের ভক্তদের বাজারে দৌড়তে হবে না। আমি নাস্তিক, আমি বুঝি সত্যকার পুজো কাকে বলে। ওরা ধর্মপ্রাণ, ওরা কী বুঝবে।"

"এ কী কাজ করলে অভীক! তুমি যাকে বল তোমার পবিত্র নাস্তিকধর্ম এ কাজ কি তার যোগ্য, এ যে বিশ্বাসঘাতকতা!"

"মানি। কিন্তু আমার ধর্মের ভিত কিসে দুর্বল করে দিয়েছিল তা বলি। খুব ধুম করে পুজো দেবে বলে আমার চেলারা কোমর বেঁধেছিল। কিন্তু চাঁদায় যে সামান্য টাকা উঠল সে যেমন হাস্যকর তেমনি শোকাবহ। তাতে ভোগের পাঁঠাদের মধ্যে বিয়োগান্ত নাট্য জমত না, পঞ্চমাঙ্কের লাল রঙটা হত ফিকে। আমার তাতে আপত্তি ছিল না। স্থির করেছিলেম নিজেরাই কাঠি হাতে ঢাকে ঢোলে বেতালা চাঁটি লাগাব অসহ্য উৎসাহে আর লাউ-কুমড়োর বক্ষ বিদীর্ণ করব স্বহস্তে খড়্গাঘাতে। নাস্তিকের পক্ষে এই যথেষ্ট, কিন্তু ধর্মপ্রাণের পক্ষে নয়। কখন সন্ধ্যা-বেলায় আমাকে না জানিয়ে ওদের একজন সাজল সাধুবাবা, পাঁচজন সাজল চেলা, কোনো একজন ধনী বিধবা বুড়িকে গিয়ে বললে—তার যে ছেলে রেঙ্গুনে কাজ করে, জগদম্বা স্বপ্ন দিয়েছেন, যথেষ্ট পাঁঠা আর পুরোবহরের পুজো না পেলে মা তাঁকে আস্ত খাবেন। তাঁর কাছ থেকে স্ক্রু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাঁচ হাজার টাকা বের করেছে। যেদিন শুনলুম, সেইদিনই টাকাটার সৎকার করেছি। তাতে আমার জাত গেল। কিন্তু টাকাটার কলঙ্ক ঘুচল। এই তোমাকে করলুম আমার কন্‌ফেশনাল। পাপ কবুল করে পাপ ক্ষালন করে নেওয়া গেল। পাঁচ হাজার টাকার বাইরে আছে উনত্রিশটি মাত্র টাকা। সে রেখেছি কুমড়োর বাজারের দেনাশোধের জন্যে।"

সুস্মি এসে বললে, "বচ্চু বেহারার জ্বর বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে কাশি, ডাক্তার-বাবু কী লিখে দিয়ে গেছেন, দেখে দাও-সে।"

বিভার হাত চেপে ধরে অভীক বললে, "বিশ্বহিতৈষিণী, রোগতাপের তদ্‌বির করতে দিনরাত ব্যস্ত আছ, আর যে-সব হতভাগার শরীর অতি বিশ্রী রকমে সুস্থ তাদের মনে করবার সময় পাও না।"

"বিশ্বহিত নয় গো, কোনো একজন অতি সুস্থ হতভাগাকে ভুলে থাকবার জন্যেই এত করে কাজ বানাতে হয়। এখন ছাড়ো, আমি যাই, তুমি একটু বোসো, আমার গয়না সামলিয়ে রেখো।"

"আর আমার লোভ কে সামলাবে।"

"তোমার নাস্তিকধর্ম।"

কিছুকাল দেখা নেই অভীকের। চিঠিপত্র কিছু পাওয়া যায় নি। বিভার মুখ শুকিয়ে গেছে। কোনো কাজ করতে মন যাচ্ছে না। তার ভাবনাগুলো গেছে ঘুলিয়ে। কী হয়েছে, কী হতে পারে, তার ঠিক পাচ্ছে না। দিনগুলো যাচ্ছে পাঁজর-ভেঙে-দেওয়া বোঝার মতন। ওর কেবলই মনে হচ্ছে অভীক ওর উপরেই অভিমান করে চলে গেছে। ও ঘরছাড়া ছেলে, ওর বাঁধন নেই, উধাও হয়ে চলে গেল— ও হয়তো আর ফিরবে না। ওর মন কেবলই বলতে লাগল, 'রাগ কোরো না, ফিরে এসো, আমি তোমাকে আর দুঃখ দেব না।' অভীকের সমস্ত ছেলেমানুষি, ওর অবিবেচনা, ওর আবদার, যতই মনে পড়তে লাগল ততই জল পড়তে লাগল ওর দুই চক্ষু বেয়ে— কেবলই নিজেকে পাষাণী বলে ধিক্‌কার দিলে।

এমন সময়ে এল চিঠি স্টীমারের-ছাপ-মারা। অভীক লিখেছে—

জাহাজের স্টোকার হয়ে চলেছি বিলেতে। এঞ্জিনে কয়লা জোগাতে হবে। বলছি বটে ভাবনা কোরো না, কিন্তু ভাবনা করছ মনে করে ভালো লাগে। তবু বলে রাখি এঞ্জিনের তাতে পোড়া আমার অভ্যেস আছে। জানি তুমি এই বলে রাগ করবে যে, কেন পাথেয় দাবি করি নি তোমার কাছ থেকে। একমাত্র কারণ এই যে, আমি যে আর্টিস্ট্‌ এ পরিচয়ে তোমার একটুও শ্রদ্ধা নেই। এ আমার চিরদুঃখের কথা ; কিন্তু এজন্যে তোমাকে দোষ দেব না। আমি নিশ্চয়ই জানি, একদিন সেই রসজ্ঞ দেশের গুণী লোকেরা আমাকে স্বীকার করে নেবে যাদের স্বীকৃতির খাঁটি মূল্য আছে।

অনেক মূঢ় আমার ছবির অন্যায় প্রশংসা করেছে। আবার অনেক মিথ্যুক করেছে ছলনা। তুমি আমার মন ভোলানোর জন্যে কোনোদিন কৃত্রিম স্তব কর নি। যদিও তোমার জানা ছিল তোমার একটুখানি প্রশংসা আমার পক্ষে অমৃত। তোমার চরিত্রের অটল সত্য থেকে আমি অপরিমেয় দুঃখ পেয়েছি, তবু সেই সত্যকে দিয়েছি আমি বড়ো মূল্য। একদিন বিশ্বের কাছে যখন সম্মান পাব, তখন সব চেয়ে সত্য সম্মান আমাকে তুমিই দেবে, তার সঙ্গে হৃদয়ের সুধা মিশিয়ে। যতক্ষণ তোমার বিশ্বাস অসন্দিগ্ধ সত্যে না পৌঁছবে ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা করবে। এই কথা মনে রেখে আজ দুঃসাধ্যসাধনার পথে চলেছি।

এতক্ষণে জানতে পেরেছ তোমার হারখানি গেছে চুরি। এ হার তুমি বাজারে বিক্রি করতে যাচ্ছ, এই ভাবনা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলুম না। তুমি পাঁজর ভেঙে সিঁধ কাটতে যাচ্ছিলে আমার বুকের মধ্যে। তোমার ওই হারের বদলে আমার একতাড়া ছবি তোমার গয়নার বাক্সের কাছে রেখে এসেছি। মনে মনে হেসো না। বাংলাদেশের কোথাও এই ছবিগুলো ছেঁড়া কাগজের বেশি দর পাবে না। অপেক্ষা কোরো বী, আমার মধুকরী, তুমি ঠকবে না, কখনোই না। হঠাৎ যেমন কোদালের মুখে গুপ্তধন বেরিয়ে পড়ে, আমি জাঁক করে বলছি, তেমনি আমার ছবিগুলির দুর্মূল্য দীপ্তি হঠাৎ বেরিয়ে পড়বে। তার আগে পর্যন্ত হেসো, কেননা সব মেয়ের কাছেই সব পুরুষ ছেলেমানুষ— যাদের তারা ভালোবাসে। তোমার সেই স্নিগ্ধ কৌতুকের হাসি আমার কল্পনায় ভরতি করে নিয়ে চললুম সমুদ্রের পারে। আর নিলুম তোমার সেই মধুময় ঘর থেকে একখানি মধুময় অপবাদ। দেখেছি তোমার ভগবানের কাছে তুমি কত দরবার নিয়ে প্রার্থনা কর,

এবার থেকে এই প্রার্থনা কোরো— তোমার কাছ থেকে চলে আসার দারুণ দুঃখ যেন একদিন সার্থক হয়।

তুমি মনে মনে কখনও আমাকে ঈর্ষা করেছ কি না জানি নে। এ কথা সত্য, মেয়েদের আমি ভালোবাসি। ঠিক ততটা না হোক, মেয়েদের আমার ভালো লাগে। তারা আমাকে ভালোবেসেছে, সেই ভালোবাসা আমাকে কৃতজ্ঞ করে। কিন্তু নিশ্চয় তুমি জান যে, তারা নীহারিকামণ্ডলী, তার মাঝখানে তুমি একটিমাত্র ধ্রুবনক্ষত্র। তারা আভাস, তুমি সত্য। এ-সব কথা শোনাবে সেন্টিমেন্টাল। উপায় নেই, আমি কবি নই। আমার ভাষাটা কলার ভেলার মতো, ঢেউ লাগলেই বাড়াবাড়ি করে দোলা দিয়ে। জানি বেদনার যেখানে গভীরতা সেখানে গম্ভীর হওয়া চাই, নইলে সত্যের মর্যাদা থাকে না। দুর্বলতা চঞ্চল, অনেকবার আমার দুর্বলতা দেখে হেসেছ। এই চিঠিতে তারই লক্ষণ দেখে একটু হেসে তুমি বলবে, এই তো ঠিক তোমার অভীর মতোই ভাবখানা। কিন্তু এবার হয়তো তোমার মুখে হাসি আসবে না। তোমাকে পাই নি বলে অনেক খুঁতখুঁত করেছি, কিন্তু হৃদয়ের দানে তুমি যে কৃপণ এ কথার মতো এতবড়ো অবিচার আর কিছু হতে পারে না। আসলে এ জীবনে তোমার কাছে আমার সম্পূর্ণ প্রকাশ হতে পারল না। হয়তো কখনও হতে পারবে না। এই তীব্র অতৃপ্তি আমাকে এমন কাঙাল করে রেখেছে। সেই জন্যেই আর কিছু বিশ্বাস করি বা না করি, হয়তো জন্মান্তরে বিশ্বাস করতে হবে। তুমি স্পষ্ট করে আমাকে তোমার ভালোবাসা জানাও নি, কিন্তু তোমার স্তব্ধতার গভীর থেকে প্রতিক্ষণে যা তুমি দান করেছ, এই নাস্তিক তাকে কোনো সংজ্ঞা দিতে পারে নি— বলেছে 'অলৌকিক'। এরই আকর্ষণে কোনো-এক ভাবে হয়তো তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভগবানেরই কাছাকাছি ফিরেছি। ঠিক জানি নে। হয়তো সবই বানানো কথা। কিন্তু হৃদয়ের একটা গোপন জায়গা আছে আমাদের নিজেরই অগোচরে, সেখানে প্রবল ঘা লাগলে কথা আপনি বানিয়ে বানিয়ে ওঠে, হয়তো সে এমন কোনো সত্য যা এতদিনে নিজে জানতে পারি নি।

বী, আমার মধুকরী, জগতে সব চেয়ে ভালোবেসেছি তোমাকে। সেই ভালোবাসার কোনো একটা অসীম সত্যভূমিকা আছে বলে যদি মনে করা যায়, আর তাকেই যদি বল তোমাদের ঈশ্বর, তা হলে তাঁর দুয়ার আর তোমার দুয়ার এক হয়ে রইল এই নাস্তিকের জন্যে। আবার আমি ফিরব— তখন আমার মত, আমার বিশ্বাস, সমস্ত চোখ বুজে সমর্পণ করে দেব তোমার হাতে; তুমি তাকে পৌঁছিয়ে দিয়ো তোমার তীর্থপথের শেষ ঠিকানায়, যাতে বুদ্ধির বাধা নিয়ে তোমার সঙ্গে এক মুহূর্তের বিচ্ছেদ আর কখনও না ঘটে। তোমার কাছ থেকে আজ দূরে এসে ভালোবাসার অভাবনীয়তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আমার মনের মধ্যে, যুক্তিতর্কের কাঁটার বেড়া পার করিয়ে দিয়েছে আমাকে— আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাকে লোকাতীত মহিমায়। এতদিন বুঝতে চেয়েছিলুম বুদ্ধি দিয়ে, এবার পেতে চাই আমার সমস্তকে দিয়ে।

তোমার নাস্তিক ভক্ত
অভীক

আশ্বিন ১৩৪৬

শেষ কথা

জীবনের প্রবহমান ঘোলা রঙের হ-য-ব-র-ল'র মধ্যে হঠাৎ যেখানে গল্পটা আপন রূপ ধরে সদ্য দেখা দেয়, তার অনেক পূর্ব থেকেই নায়ক-নায়িকারা আপন পরিচয়ের সূত্র গেঁথে আসে। পিছন থেকে সেই প্রাক্-গাল্পিক ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতেই হয়। তাই কিছু সময় নেব, আমি যে কে সেই কথাটাকে পরিষ্কার করবার জন্যে। কিন্তু নামধাম ভাঁড়াতে হবে। নইলে জানাশোনা মহলের জবাবদিহি সামলাতে পারব না। কী নাম নেব তাই ভাবছি, রোম্যাণ্টিক নামকরণের দ্বারা গোড়া থেকেই গল্পটাকে বসন্তরাগে পঞ্চমসুরে বাঁধতে চাই নে। নবীনমাধব নামটা বোধ হয় চলে যেতে পারবে। ওর বাস্তবের শ্যাম্‌লা রঙটা ধুয়ে ফেলে করা যেতে পারত নবারুণ সেনগুপ্ত; কিন্তু তা হলে খাঁটি শোনাত না, গল্পটা নামের বড়াই করে লোকের বিশ্বাস হারাত, লোকে মনে করত ধার-করা জামিয়ার প'রে সাহিত্যসভায় বাবুয়ানা করতে এসেছে।

আমি বাংলাদেশের বিপ্লবীদলের একজন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহাকর্ষশক্তি আণ্ডামানতীরের খুব কাছাকাছি টান মেরেছিল। নানা বাঁকা পথে সি. আই. ডি.'র ফাঁস এড়িয়ে এড়িয়ে গিয়েছিলুম আফগানিস্থান পর্যন্ত। অবশেষে পৌঁচেছি আমেরিকায় খালাসির কাজ নিয়ে। পূর্ববঙ্গীয় জেদ ছিল মজ্জায়, একদিনও ভুলি নি যে ভারতবর্ষের হাতপায়ের শিকলে উখো ঘষতে হবে দিনরাত, যতদিন বেঁচে থাকি। কিন্তু বিদেশে কিছুদিন থাকতেই একটা কথা নিশ্চিত বুঝেছিলুম— আমরা যে প্রণালীতে বিপ্লবের পালা শুরু করেছিলুম, সে যেন আতশবাজিতে পটকা ছোঁড়ার মতো, তাতে নিজের পোড়াকপাল পুড়িয়েছি অনেকবার, দাগ পড়ে নি ব্রিটিশ রাজতক্তে। আগুনের উপর পতঙ্গের অন্ধ আসক্তি। যখন সদর্পে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছিলুম, তখন বুঝতে পারি নি সেটাতে ইতিহাসের যজ্ঞানল জ্বালানো হচ্ছে না, জ্বালাচ্ছি নিজেদের খুব ছোটো ছোটো চিতানল। ইতিমধ্যে য়ুরোপীয় মহাসমরের ভীষণ প্রলয়রূপ তার অতি বিপুল আয়োজন-সমেত চোখের সামনে দেখা দিয়েছিল— এই যুগান্তরসাধিনী সর্বনাশাকে আমাদের খোড়োঘরের চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিষ্ঠা করতে পারব সে দুরাশা মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেল; সমারোহ করে আত্মহত্যা করবার মতোও আয়োজন ঘরে নেই। তখন ঠিক করলুম—ন্যাশনাল দুর্গের গোড়া পাকা করতে হবে। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলুম—বাঁচতে যদি চাই আদিম যুগের হাত দুখানায় যে কটা নখ আছে তা দিয়ে লড়াই করা চলবে না। এ যুগে যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের দিতে হবে পাল্লা; যেমন-তেমন করে মরা সহজ, কিন্তু বিশ্বকর্মার চেলাগিরি করা সহজ নয়। অধীর হয়ে ফল নেই, গোড়া থেকেই কাজ শুরু করতে হবে— পথ দীর্ঘ, সাধনা কঠিন।

দীক্ষা নিলুম যন্ত্রবিদ্যায়। ডেট্রয়েটে ফোর্ডের মোটর-কারখানায় কোনোমতে ঢুকে পড়লুম। হাত পাকাচ্ছিলুম, কিন্তু মনে হচ্ছিল না খুব বেশি দূর এগোচ্ছি। একদিন কী দুর্বুদ্ধি ঘটল; মনে হল ফোর্ড্‌কে যদি একটুখানি আভাস দিই যে, আমার উদ্দেশ্য নিজের উন্নতি করা নয়, দেশকে বাঁচানো, তা হলে স্বাধীনতাপূজারী

আমেরিকার ধনসৃষ্টির জাদুকর বুঝি খুশি হবে, এমন-কি আমার রাস্তা হয়তো করে দেবে প্রশস্ত। ফোর্ড্‌ চাপা হাসি হেসে বললে, 'আমার নাম হেন্‌রি ফোর্ড্‌, পুরোতন ইংরেজি নাম। আমাদের ইংলণ্ডের মামাতো ভাইরা অকেজো, তাদের আমি কেজো করব—এই আমার সংকল্প।' আমি ভেবেছিলুম, ভারতীয়কেও কেজো করে তুলতে উৎসাহ হতেও পারে। একটা কথা বুঝতে পারলুম, টাকাওয়ালার দরদ টাকাওয়ালাদেরই 'পরে। আর দেখলুম, এখানে চাকাতৈরির চক্রপথে শেখা বেশি দূর এগোবে না। এই উপলক্ষে একটা বিষয়ে চোখ খুলে গেল, সে হচ্ছে এই যে, যন্ত্রবিদ্যাশিক্ষার আরও গোড়ায় যাওয়া চাই; যন্ত্রের মালমসলা-সংগ্রহ শিখতে হবে। ধরণী শক্তিমানদের জন্যে জমা করে রেখেছেন তাঁর দুর্গম জঠরে কঠিন খনিজ পদার্থ, এই নিয়ে দিগ্বিজয় করেছে তারা, আর গরিবদের জন্যে রয়েছে তার উপরের স্তরে ফসল—হাড় বেরিয়েছে তাদের পাঁজরায়, চুপসে গেছে তাদের পেট। আমি লেগে গেলুম খনিজবিদ্যা শিখতে। ফোর্ড্‌ বলেছে ইংরেজ অকেজো, তার প্রমাণ হয়েছে ভারতবর্ষে—একদিন হাত লাগিয়েছিল তারা নীলের চাষে, আর-একদিন চায়ের চাষে—সিবিলিয়ানের দল দপ্তরখানায় তকমাপরা 'ল অ্যান্‌ড্‌ অর্ডর'এর ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু ভারতের বিশাল অন্তর্ভাণ্ডারের সম্পদ উদ্ঘাটিত করতে পারে নি, কী মানবচিত্তের, কী প্রকৃতির। বসে বসে পাটের চাষীর রক্ত নিংড়েছে। জামশেদ টাটাকে সেলাম করেছি সমুদ্রের ওপার থেকে। ঠিক করেছি আমার কাজ পটকা ছোঁড়া নয়। সিঁধ কাটতে যাব পাতালপুরীর পাথরের প্রাচীরে। মায়ের-আঁচল-ধরা বুড়ো খোকাদের দলে মিশে 'মা মা' ধ্বনিতে মন্তর পড়ব না, আর দেশের দরিদ্রকে অক্ষম অভুক্ত অশিক্ষিত দরিদ্র বলেই মানুব, 'দরিদ্রনারায়ণ' বুলি দিয়ে তার নামে মন্তর বানাব না। প্রথম বয়সে এ রকম 'বচনের পুতুল গড়া' খেলা অনেক খেলেছি—কবিদের কুমোরবাড়িতে স্বদেশের যে রাংতা-লাগানো প্রতিমা গড়া হয়, তারই সামনে বসে বসে অনেক চোখের জল ফেলেছি। কিন্তু আর নয়, এই জাগ্রত বুদ্ধির দেশে এসে বাস্তবকে বাস্তব বলে জেনেই শুকনো চোখে কোমর বেঁধে কাজ করতে শিখেছি। এবার গিয়ে বেরিয়ে পড়বে এই বিজ্ঞানী বাঙাল কোদাল নিয়ে, কুড়ুল নিয়ে, হাতুড়ি নিয়ে, দেশের গুপ্তধনের তল্লাসে—এই কাজটাকে কবির গদগদকণ্ঠের চেলারা দেশমাতৃকার পুজো বলে চিনতেই পারবে না।

ফোর্ডের কারখানাঘর ছেড়ে তার পরে ন' বছর কাটিয়েছি খনিবিদ্যা খনিজবিদ্যা শিখতে। য়ুরোপের নানা কেন্দ্রে ঘুরেছি, হাতে কলমে কাজ করেছি, দুই-একটা যন্ত্রকৌশল নিজেও বানিয়েছি—তাতে উৎসাহ পেয়েছি অধ্যাপকদের কাছে, নিজের উপরে বিশ্বাস হয়েছে, ধিক্‌কার দিয়েছি ভূতপূর্ব মন্ত্রমুগ্ধ অকৃতার্থ নিজেকে।

আমার ছোটোগল্পের সঙ্গে এই-সব বড়ো বড়ো কথার একান্ত যোগ নেই—বাদ দিলে চলত, হয়তো ভালোই হত। কিন্তু এই উপলক্ষে একটা কথা বলার দরকার ছিল, সেটা বলি। যৌবনের গোড়ার দিকে নারীপ্রভাবের ম্যাগ্‌নেটিজ্‌মে জীবনের মেরুপ্রদেশের আকাশে যখন অরোরার রঙিন ছটার আন্দোলন ঘটতে থাকে, তখন আমি ছিলুম অন্যমনস্ক, একেবারে কোমর বেঁধে অন্যমনস্ক। আমি সন্ন্যাসী, আমি কর্মযোগী—এই-সব বাণীর দ্বারা মনের আগল শক্ত করে আঁটা ছিল। কন্যাদায়িকরা যখন আশেপাশে আনাগোনা করেছিল আমি স্পষ্ট করেই বলেছি—কন্যার কুষ্ঠিতে

যদি অকালবৈধব্যযোগ থাকে, তবেই যেন কন্যার পিতা আমার কথা চিন্তা করেন।

পাশ্চাত্য মহাদেশে নারীসঙ্গ ঠেকাবার বেড়া নেই। সেখানে আমার পক্ষে দুর্যোগের বিশেষ আশঙ্কা ছিল। আমি যে সুপুরুষ, দেশে থাকতে নারীদের মুখে সে কথা চোখের মৌন ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় শোনবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তাই এ তথ্যটা আমার চেতনার বাইরে পড়ে ছিল। বিলেতে গিয়ে যেমন আবিষ্কার করেছি সাধারণের তুলনায় আমার বুদ্ধি বেশি আছে, তেমনি ধরা পড়েছিল আমাকে দেখতে ভালো। আমার এদেশী পাঠকদের মনে ঈর্ষা জন্মাবার মতো অনেক কাহিনীর ভূমিকা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু হলফ করে বলছি— আমি তাদের নিয়ে ভাবের কুহকে মনকে জমাট বাঁধতে দিই নি। হয়তো আমার স্বভাবটা কড়া, পশ্চিমবঙ্গের শৌখিনদের মতো ভাবালুতায় আর্দ্রচিত্ত নই, নিজেকে পাথরের সিন্ধুক করে তার মধ্যে আমার সংকল্পকে ধরে রেখেছিলুম। মেয়েদের নিয়ে রসের পালা শুরু করে তার পরে সময় বুঝে খেলা ভঙ্গ করা, সেও ছিল আমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। আমি নিশ্চয় জানতুম, যে জেদ নিয়ে আমি আমার ব্রতের আশ্রয়ে বেঁচে আছি, এক-পা ফসকালে সেই জেদ নিয়েই আমার ভাঙা ব্রতের তলায় পিষে মরতে হবে। আমার পক্ষে এর মাঝখানে কোনো ফাঁকির পথ নেই। তা ছাড়া আমি জন্ম-পাড়াগেঁয়ে, মেয়েদের সম্বন্ধে আমার সেকেলে সংকোচ ঘুচতে চায় না। তাই মেয়েদের ভালোবাসা নিয়ে যারা অহংকারের বিষয় করে, আমি তাদের অবজ্ঞা করি।

বিদেশী ভালো ডিগ্রি পেয়েছিলুম। সেটা এখানে সরকারী কাজে লাগবে না জেনে ছোটোনাগপুরে চন্দ্রবংশীয় এক রাজার— মনে করা যাক, চণ্ডবীর সিংহের দরবারে— কাজ নিয়েছিলুম। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর ছেলে দেবিকাপ্রসাদ কিছুদিন কেম্‌ব্রিজে পড়াশুনো করেছিলেন। দৈবাৎ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল জুরিকে, সেখানে আমার খ্যাতি তাঁর কানে গিয়েছিল। তাঁকে বুঝিয়েছিলুম আমার প্ল্যান। শুনে খুব উৎসাহিত হয়ে তাঁদের স্টেটে আমাকে জিয়লজিকাল সর্ভের কাজে লাগিয়ে দিলেন। এমন কাজ ইংরেজকে না দেওয়াতে উপরিস্তরের বায়ুমণ্ডল বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু দেবিকাপ্রসাদ ছিলেন ঝাঁঝালো লোক। বুড়ো রাজার মন টল্‌মল্‌ করা সত্ত্বেও টিঁকে গেলুম।

এখানে আসবার আগে মা আমাকে বললেন, "বাবা, ভালো কাজ পেয়েছ, এইবার একটি বিয়ে করো, আমার অনেক দিনের সাধ মিটুক।"

আমি বললুম, "অর্থাৎ, 'কাজ মাটি করো'। আমার যে কাজ তার সঙ্গে বিয়ের তাল মিলবে না।"

দৃঢ় সংকল্প— ব্যর্থ হল মায়ের অনুনয়। যন্ত্রতন্ত্র সমস্ত বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে চলে এলুম জঙ্গলে।

এইবার আমার দেশব্যাপী কীর্তিসম্ভাবনার ভাবী দিগন্তে হঠাৎ যে একটুকু গল্প ফুটে উঠল, তাতে আলেয়ার চেহারাও আছে, আরও আছে শুকতারার।

নীচের পাথরকে প্রশ্ন করে মাটির সন্ধানে বেড়াচ্ছিলুম বনে বনে। পলাশফুলের

রাঙা রঙের মাতলামিতে তখন বিভোর আকাশ। শালগাছে ধরেছে মঞ্জরি, মৌমাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। ব্যাবসাদাররা জো-সংগ্রহে লেগে গিয়েছে। কুলের পাতা থেকে জমা করছে তসরের রেশমের গুটি। সাঁওতালরা কুড়োচ্ছে পাকা মহুয়া ফুল। ঝির্‌ঝির্‌ শব্দে হালকা নাচের ওড়না ঘুরিয়ে চলেছিল একটি ছিপ্‌ছিপে নদী, আমি তার নাম দিয়েছিলুম তনিকা। এটা কারখানাঘর নয়, কলেজক্লাস নয়, এ সেই সুখতন্দ্রায় আবিল প্রদোষের রাজ্য যেখানে একলা মন পেলে প্রকৃতিমায়াবিনী তার উপরেও রঙরেঙ্গিনীর কাজ করে—যেমন সে করে সূর্যাস্তের পটে।

মনটাতে একটু আবেশের ঘোর লেগেছিল। মন্থর হয়ে এসেছিল কাজের চাল, নিজের উপরে বিরক্ত হয়েছিলুম ; ভিতর থেকে জোর লাগাচ্ছিলুম দাঁড়ে। মনে ভাবছিলুম, ট্রপিকাল আবহাওয়ার মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়লুম বুঝি। শয়তানি ট্রপিক্‌স্‌ এ দেশে জন্মকাল থেকে হাতপাখার হাওয়ায় হারের মন্ত্র চালাচ্ছে আমাদের রক্তে—এড়াতে হবে তার স্বেদসিক্ত জাদু।

বেলা পড়ে এল। এক জায়গায় মাঝখানে চর ফেলে দুভাগে চলে গিয়েছে নদী। সেই বালুর দ্বীপে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে বকের দল। দিনাবসানে রোজ এই দৃশ্যটি ইঙ্গিত করত আমার কাজের বাঁক ফিরিয়ে দিতে। ঝুলিতে মাটি-পাথরের নমুনা নিয়ে ফিরে চলেছিলুম আমার বাংলোঘরে, সেখানে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করতে যাব। অপরাহ্ণ আর সন্ধ্যার মাঝখানে দিনের যে একটা পোড়ো জমির মতো ফালতো অংশ আছে, একলা মানুষের পক্ষে সেইটে কাটিয়ে চলা শক্ত। বিশেষত নির্জন বনে। তাই আমি ওই সময়টা রেখেছি পরখ করার কাজে। ডাইনামোতে বিজলি বাতি জ্বালাই—কেমিক্যাল নিয়ে, মাইক্রস্‌কোপ নিয়ে, নিক্তি নিয়ে বসি। এক-একদিন রাত দুপুর পেরিয়ে যায়। আজ আমার সন্ধানে এক জায়গায় ম্যাঙ্গানিজের লক্ষণ যেন ধরা পড়েছিল। তাই দ্রুত উৎসাহে চলেছিলুম। কাকগুলো মাথার উপর দিয়ে গেরুয়া রঙের আকাশে কা কা শব্দে চলেছিল বাসায়।

এমন সময় হঠাৎ বাধা পড়ল আমার কাজে ফেরায়। পাঁচটি শালগাছের ব্যূহ ছিল বনের পথে একটা ঢিবির উপরে। সেই বেষ্টনীর মধ্যে কেউ বসে থাকলে কেবল একটিমাত্র ফাঁকের মধ্যে দিয়ে তাকে দেখা যায়, হঠাৎ চোখ এড়িয়ে যাবারই কথা। সেদিন মেঘের মধ্যে আশ্চর্য একটা দীপ্তি ফেটে পড়েছিল। বনের সেই ফাঁকটাতে ছায়ার ভিতরে রাঙা আলো যেন দিগঙ্গনার-গাঁঠ-ছেঁড়া সোনার মুঠোর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক সেই আলোর পথে বসে আছে মেয়েটি, গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে পা দুটি বুকের কাছে গুটিয়ে একমনে লিখছে একটি ডায়ারির খাতা নিয়ে। এক মুহূর্তে আমার কাছে প্রকাশ পেল একটি অপূর্ব বিস্ময়। জীবনে এ রকম দৈবাৎ ঘটে। পূর্ণিমার বান ডেকে আসার মতো বক্ষতটে ধাক্কা দিতে লাগল জোয়ারের ঢেউ।

গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলুম। একটি আশ্চর্য ছবি চিহ্নিত হতে লাগল মনের চিরস্মরণীয়াগারে। আমার বিস্তৃত অভিজ্ঞতার পথে অনেক অপ্রত্যাশিত মনোহরের দরজায় ঠেকেছে মন, পাশ কাটিয়ে চলে গেছি, আজ মনে হল জীবনের একটা কোন্‌ চরমের সংস্পর্শে এসে পৌঁছলুম। এমন করে ভাবা, এমন করে বলা আমার একেবারে অভ্যস্ত নয়। যে আঘাতে মানুষের নিজের অজানা

একটা অপূর্ব স্বরূপ ছিটকিনি খুলে অবারিত হয়, সেই আঘাত আমাকে লাগল কী করে! বরাবর জানি আমি পাহাড়ের মতো খট্‌খটে, নিরেট। ভিতর থেকে উছলে পড়ল ঝরনা।

একটা-কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু মানুষের সঙ্গে সব চেয়ে বড়ো আলাপের প্রথম কথাটি কী হতে পারে ভেবে পাই নে। সে হচ্ছে খৃস্টীয় পুরাণের প্রথম সৃষ্টির বাণী—আলো জাগুক, অব্যক্ত হয়ে যাক ব্যক্ত। এক সময়ে মনে হল—মেয়েটি—ওর আসল নাম পরে জেনেছি কিন্তু সেটা ব্যবহার করব না, ওকে নাম দিলুম অচিরা। মানে কী। মানে এই, যার প্রকাশ হতে বিলম্ব হল না, বিদ্যুতের মতো। রইল ঐ নাম—মুখ দেখে মনে হল অচিরা জানতে পেরেছে কে একজন আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। উপস্থিতির একটা নীরব ধ্বনি আছে বুঝি! লেখা বন্ধ করেছে, অথচ উঠতে পারছে না। পলায়নটা পাছে বড্ড বেশি স্পষ্ট হয়। একবার ভাবলুম বলি, 'মাপ করুন'—কী মাপ করা, কী অপরাধ, কী বলব তাকে। একটু তফাতে গিয়ে বিলিতি বেঁটে কোদাল নিয়ে মাটিতে খোঁচা মারবার ভান করলুম, ঝুলিতে একটা কী পুরলুম, সেটা অত্যন্ত বাজে। তার পরে ঝুঁকে পড়ে মাটিতে বিজ্ঞানী দৃষ্টি চালনা করতে করতে চলে গেলুম। কিন্তু নিশ্চয় মনে জানি, যাঁকে ভোলাবার চেষ্টা করেছিলুম তিনি ভোলেন নি। মুগ্ধ পুরুষচিত্তের দুর্বলতার আরও অনেক প্রমাণ তিনি আরও অনেকবার পেয়েছেন, সন্দেহ নেই। আশা করলুম আমার বেলায় এটা তিনি মনে-মনে উপভোগ করেছেন। এর চেয়ে বেড়া আর অল্প-একটু যদি ডিঙোতুম, তা হলে—তা হলে কী হত কী জানি। রাগতেন, না রাগের ভান করতেন? অত্যন্ত চঞ্চল মন নিয়ে চলেছি আমার বাংলোঘরের পথে, এমন সময় আমার চোখে পড়ল দুই টুকরায় ছিন্ন করা একখানা চিঠির খাম। এটাকে জিয়লজিকাল নমুনা বলে না। তবু তুলে দেখলুম। নামটা ভবতোষ মজুমদার আই. সি. এস ; ঠিকানা ছাপরা, মেয়েলি হাতে লেখা। টিকিট লাগানো আছে, তাতে ডাকঘরের ছাপ নেই। যেন কুমারীর দ্বিধা। আমার বিজ্ঞানী বুদ্ধি ; স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, এই ছেঁড়া চিঠির খামের মধ্যে একটা ট্র্যাজেডির ক্ষতচিহ্ন আছে। পৃথিবীর ছেঁড়া স্তর থেকে তার বিপ্লবের ইতিহাস বের করা আমাদের কাজ। সেই আমার সন্ধানপটু হাত এই ছেঁড়া খামের রহস্য আবিষ্কার করতে সংকল্প করলে।

ইতিমধ্যে ভাবছি নিজের অন্তঃকরণের রহস্য অভূতপূর্ব। এক-একটা বিশেষ অবস্থার সংস্পর্শে তার ভাবখানা কী যে একটা নতুন আকারে দানা বেঁধে দেখা দেয়, এবারে তার পরিচয়ে বিস্মিত হয়েছি। এতদিন যে মনটা নানা কঠিন অধ্যবসায় নিয়ে শহরে শহরে জীবনের লক্ষ্য-সন্ধানে ঘুরেছে, তাকে স্পষ্ট করে চিনেছিলুম। ভেবেছিলুম সেই আমার সত্যকার স্বভাব, তার আচরণের ধ্রুবত্ব সম্বন্ধে আমি হলপ করতে পারতুম। কিন্তু তার মধ্যে বুদ্ধিশাসনের বহির্ভূত যে-একটা মূঢ় লুকিয়ে ছিল, তাকে এই প্রথম দেখা গেল। ধরা পড়ে গেল আরণ্যক, যে যুক্তি মানে না, যে মোহ মানে। বনের একটা মায়া আছে, গাছপালার নিঃশব্দ চক্রান্ত, আদিম প্রাণের মন্ত্রধ্বনি। দিনে দুপুরে ঝাঁ ঝাঁ করে তার উদাত্ত সুর, রাতে দুপুরে মন্দ্রগম্ভীর ধ্বনি, গুঞ্জন করতে থাকে জীবচেতনায়—আদিম প্রাণের গূঢ় প্রেরণায় বুদ্ধিকে দেয় আবিষ্ট করে।

জিয়লজির চর্চার মধ্যেই ভিতরে ভিতরে এই আরণ্যক মায়ার কাজ চলছিল— খুঁজছিলুম রেডিয়মের কণা, যদি কৃপণ পাথরের মুঠির মধ্য থেকে বের করা যায়— দেখতে পেলুম অচিরাকে, কুসুমিত শালগাছের ছায়ালোকের বন্ধনে। এর পূর্বে বাঙালি মেয়েকে দেখেছি সন্দেহ নেই। কিন্তু সবকিছু থেকে স্বতন্ত্র ভাবে এমন একান্ত করে তাকে দেখবার সুযোগ পাই নি। এখানে তার শ্যামল দেহের কোমলতায় বনের লতাপাতা আপন ভাষা যোগ করে দিল। বিদেশিনী রূপসী তো অনেক দেখেছি, যথোচিত ভালোও লেগেছে। কিন্তু বাঙালি মেয়ে এই যেন প্রথম দেখলুম, ঠিক যে জায়গায় তাকে সম্পূর্ণ দেখা যেতে পারে। এই নিভৃত বনের মধ্যে সে নানা পরিচিত-অপরিচিত বাস্তবের সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে নেই ; দেখে মনে হয় না সে বেণী দুলিয়ে ডায়োসিশনে পড়তে যায়, কিম্বা বেথুন কলেজের ডিগ্রিধারিণী, কিম্বা বালিগঞ্জের টেনিসপার্টিতে উচ্চ কলহাস্যে চা পরিবেশন করে। অনেক দিন আগে ছেলেবেলায় হরু ঠাকুর কিম্বা রাম বসুর যে গান শুনে তার পরে ভুলে গিয়েছিলুম, যে গান আজ রেডিয়োতে বাজে না, গ্রামোফোনে পাড়া মুখরিত করে না, জানি নে কেন মনে হল সেই গানের সহজ রাগিণীতে ঐ বাঙালি মেয়েটির রূপের ভূমিকা—'মনে রইল, সই, মনের বেদনা'। এই গানের সুরে যে একটি করুণ ছবি আছে সে আজ রূপ নিয়ে আমার চোখে স্পষ্ট ফুটে উঠল। এও সম্ভব হল। কোন্ প্রবল ভূমিকম্পে পৃথিবীর-যে তলায় লুকোনো আগ্নেয় সামগ্রী উপরে উঠে পড়ে, জিয়লজি শাস্ত্রে তা পড়েছি, নিজের মধ্যে দেখলুম সেই নীচের তলার অন্ধকারের তপ্তবিগলিত জিনিসকে হঠাৎ উপরের আলোতে। কঠোর বিজ্ঞানী নবীনমাধবের অটল অন্তঃস্তরে এই উলটপালট আমি কোনোদিন আশা করতে পারি নি।

বুঝতে পারছি যখন আমি রোজ বিকেলবেলায় এই পথ দিয়ে আমার কাজে ফিরেছি, ও আমাকে দেখেছে, অন্যমনস্ক আমি ওকে দেখি নি। বিলেতে যাবার পর থেকে নিজের চেহারার উপর একটা গর্ব জন্মেছে। ও, হাউ হ্যান্ড্‌সম— এই প্রশস্তি কানাকানিতে আমার অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিলেতফেরত আমার কোনো কোনো বন্ধুর কাছে শুনেছি বাঙালি মেয়ের রুচি আলাদা, তারা মোলায়েম মেয়েলি রূপেই পুরুষের রূপে খোঁজে। চলিত কথা হচ্ছে—কার্তিকের মতো চেহারা। বাঙালি কার্তিক আর যাই হোক, কোনো পুরুষে দেবসেনাপতি নয়। প্যারিসে একজন বান্ধবীর মুখে শুনেছি, 'বিলিতি সাদা রঙ রঙের অভাব ; ওরিয়েন্টালের দেহে গরম আকাশ যে রঙ এঁকে দেয় সে সত্যিকার রঙ, সে ছায়ার রঙ, ঐ রঙই আমাদের ভালো লাগে।' এ কথাটা বঙ্গোপসাগরের ধারে বোধ হয় খাটে না।

এতদিন এ-সব আলোচনা আমার মনেই ওঠে নি। কয়েক দিন ধরে আমাকে ভাবিয়েছে। রোদে-পোড়া আমার রঙ, লম্বা আমার প্রাণসার দেহ, শক্ত আমার বাহু, দ্রুত আমার গতি, শুনেছি দৃষ্টি আমার তীক্ষ্ণ— নাক চিবুক কপাল নিয়ে সুস্পষ্ট জোরালো আমার চেহারা। এপ্‌স্টাইন পাথরে আমার মূর্তি গড়তে চেয়েছিল, সময় দিতে পারি নি। কিন্তু বাঙালিকে আমি মায়ের খোকা বলেই জানি, আর মায়েরা তাদের কোলের ধনকে মোমে-গড়া পুতুলের মতো দেখতেই ভালোবাসে। এ-সব কথা মনের মধ্যে ঘুলিয়ে উঠে আমাকে রাগিয়ে তুলছিল। আগেভাগেই কল্পনায় ঝগড়া করছিলুম অচিরার সঙ্গে। বলছিলুম, 'তুমি যাকে বলো সুন্দর সে বিসর্জনের

দেবতা, তোমাদের স্তব যদি বা পায় সে, টেঁকে না বেশিদিন।' বলছিলুম, 'আমি বড়ো বড়ো দেশের স্বয়ম্বরসভার মালা উপেক্ষা করে এসেছি, আর তুমি আমাকে উপেক্ষা করবে?' গায়ে পড়ে এই বানানো ঝগড়া এমনি ছেলেমানুষি যে, একদিন হেসে উঠেছি আপন উষ্মায়। এ দিকে বিজ্ঞানীর যুক্তি কাজ করছে ভিতরে ভিতরে। মনকে জানাই, এটাও একটা মস্ত কথা, আমার যাতায়াতের পথের ধারে ও বসে থাকে— একান্ত নিভৃতই যদি ওর প্রার্থনীয় হত, তা হলে ঠাঁই বদল করত। প্রথম প্রথম অমি ওকে আড়ে আড়ে দেখেছি, যেন দেখি নি এই ভান ক'রে। ইদানীং মাঝে মাঝে স্পষ্ট চোখোচোখি হয়েছে—যতদূর আমার বিশ্বাস, সেটাকে চার চোখের অপঘাত ব'লে ওর মনে হয় নি।

এর চেয়েও বিশেষ একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। এর আগে দিনের বেলায় মাটি-পাথরের কাজ সাঙ্গ করে দিনের শেষে ঐ পঞ্চবটীর পথ দিয়ে একবারমাত্র যেতেম বাসার দিকে। সম্প্রতি যাতায়াতের পুনরাবৃত্তি হতে আরম্ভ হয়েছে। এই ঘটনাটা যে জিয়লজি-সম্পর্কিত নয়, সে কথা বোঝবার মতো বয়স হয়েছে অচিরার। আমারও সাহস ক্রমশ বেড়ে চলল, যখন দেখলুম এই সুস্পষ্ট ভাবের আভাসেও তরুণীকে স্থানচ্যুত করতে পারল না। এক-একদিন হঠাৎ পিছন ফিরে দেখেছি অচিরা আমার তিরোগমনের দিকে চেয়ে আছে, আমি ফিরতেই তাড়াতাড়ি ডায়ারির দিকে চোখ নামিয়ে নিয়েছে। সন্দেহ হল ওর ডায়ারি লেখার ধারায় আগেকার মতো বেগ নেই। আমার বিজ্ঞানী বুদ্ধিতে মনোরহস্যের আলোচনা জেগে উঠল। বুঝেছি সে কোনো-এক পুরুষের জন্যে তপস্যার ব্রত নিয়েছে, তার নাম ভবতোষ, সে ছাপরায় অ্যাসিস্টেণ্ট্ ম্যাজেস্ট্রেট করছে বিলেত থেকে ফিরে এসেই। তার পূর্বে দেশে থাকতে এদের দুজনের প্রণয় ছিল গভীর, কাজ নেবার মুখেই একটা আকস্মিক বিপ্লব ঘটেছে। ব্যাপারটা কী খবর নিতে হবে। শক্ত হল না, কেননা পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আমার কেম্‌ব্রিজের সতীর্থ আছে বঙ্কিম।

ডাকে চিঠি লিখে পাঠালুম, 'বেহার সিভিল সার্ভিসে আছে ভবতোষ। কন্যাকর্তাদের মহলে জনশ্রুতি শোনা যায় লোকটি সৎপাত্র। আমার কোনো বন্ধু আমাকে তাঁর মেয়ের জন্যে ঐ লোকটিকে প্রাজাপতিক ফাঁদে ফেলতে সাহায্য করতে অনুরোধ করেছেন। রাস্তা পরিষ্কার আছে কি না, আদ্যন্ত খবর নিয়ে তুমি যদি আমাকে জানাও কৃতজ্ঞ হব। লোকটির মতিগতি কী রকম তাও জানতে চাই।'

উত্তর এল, 'রাস্তা বন্ধ। আর, মতিগতি সম্বন্ধে এখনও যদি কৌতূহল বাকি থাকে তবে শোনো।--

'কলেজে পড়বার সময় আমি ছাত্র ছিলুম ডাক্তার অনিলকুমার সরকারের— অ্যাল্‌ফাবেটের অনেকগুলি অক্ষর-জোড়া তাঁর নাম। যেমন তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, তেমনি ছেলেমানুষের মতো তাঁর সরলতা। একমাত্র সংসারের আলো তাঁর নাতনিটিকে যদি দেখো, তা হলে মনে হবে সাধনায় খুশি হয়ে সরস্বতী কেবল যে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর বুদ্ধিলোকে তা নয়, রূপ নিয়ে এসেছেন তাঁর কোলে। ঐ শয়তান ভবতোষ ঢুকল ওঁর স্বর্গলোকে। বুদ্ধি তার তীক্ষ্ণ, বচন তার অনর্গল। প্রথমে ভুললেন অধ্যাপক, তার পরে ভুলল তাঁর নাতনি। ওদের অসহ্য অন্তরঙ্গতা দেখে আমাদের হাত নিস্‌পিস্ করত। কিছু বলবার পথ ছিল না, বিবাহসম্বন্ধ পাকাপাকি

স্থির হয়ে গিয়েছিল, কেবল অপেক্ষা ছিল বিলেত গিয়ে সিভিল সার্ভিসে উত্তীর্ণ হয়ে আসার। তার পাথেয় আর খরচ জুগিয়েছেন অধ্যাপক। লোকটার সর্দির ধাত ছিল। বধির ভগবানের কাছে আমরা দুবেলা প্রার্থনা করেছি, বিবাহের পূর্বে লোকটা যেন নিউমোনিয়া হয়ে মরে। কিন্তু মরে নি। পাস করেছে। করেই ইন্‌ডিয়া গবর্মেণ্টের উচ্চপদস্থ একজন মুরুব্বির মেয়েকে বিয়ে করেছে। লজ্জায় ক্ষোভে নিজের কাজ ছেড়ে দিয়ে মর্মাহত মেয়েটিকে নিয়ে অধ্যাপক কোথায় যে অন্তর্ধান করেছেন, তার খবর রেখে যান নি।'

চিঠিখানা পড়লুম। দৃঢ় সংকল্প করলুম, এই মেয়েটিকে তার লজ্জা থেকে, অবসাদ থেকে উদ্ধার করব।

ইতিমধ্যে অচিরার সঙ্গে কোনো রকম করে একটা কথা আরম্ভ করবার জন্যে মন ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। যদি বিজ্ঞানী না হয়ে হতুম সাহিত্যরসিক, কিম্বা বাঙাল না হয়ে যদি হতুম পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক, তা হলে নিশ্চয় মুখে কথা বাধত না। কিন্তু বাঙালি মেয়েকে ভয় করি, চিনি নে ব'লে বোধ হয়। একটা ধারণা ছিল, হিন্দুনারী অজানা পরপুরুষমাত্রের কাছে একান্তই অনধিগম্য। খামকা কথা কইতে যাই যদি, তা হলে ওর রক্তে লাগবে অশুচিতা। সংস্কার জিনিসটা এমনি অন্ধ। এখানে কাজে যোগ দেবার পূর্বে কিছুদিন তো কলকাতায় কাটিয়ে এসেছি— আত্মীয়বন্ধুমহলে দেখে এলুম সিনেমামণ্ডপথবর্তিনী রঙমাখানো বাঙালি মেয়ে, যারা জাতবান্ধবী, তাদের—থাক্‌ তাদের কথা। কিন্তু অচিরার কোনো পরিচয় না পেয়েই মনে হল ও আর-এক জাতের—এ কালের বাইরে আছে দাঁড়িয়ে নির্মল আত্ম-মর্যাদায়, স্পর্শভীরু মেয়ে। মনে-মনে কেবলই ভাবছি প্রথম একটি কথা শুরু করব কী করে।

এই সময়ে কাছাকাছি দুই-একটা ডাকাতি হয়ে গিয়েছিল। মনে হল এই উপলক্ষে অচিরাকে বলি, 'রাজাকে বলে আপনার জন্যে পাহারার বন্দোবস্ত করে দিই।' ইংরেজ মেয়ে হলে হয়তো এই গায়েপড়া আনুকূল্যকে স্পর্ধা মনে করত, মাথা ঝাঁকিয়ে বলত 'সে ভাবনা আমার'। কিন্তু এই বাঙালির মেয়ে যে কী ভাবে কথাটা নেবে, আমার সে অভিজ্ঞতা নেই। দীর্ঘকাল বাংলার বাইরে থেকে আমার মনের অভ্যাস অনেকখানি জড়িয়ে গেছে বিলিতি সংস্কারে।

দিনের আলো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এইবার অচিরার ঘরে ফেরবার সময়, কিম্বা ওর দাদামশায় এসে ওকে বেড়াতে নিয়ে যাবেন। এমন সময়ে একজন হিন্দুস্থানী গোঁয়ার এসে অচিরার হাত থেকে হঠাৎ তার ব্যাগ আর ডায়ারিটা ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। আমি সেই মুহূর্তেই বনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বললুম, "কোনো ভয় নেই আপনার।"

এই বলে ছুটে সেই লোকটার ঘাড়ের উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেই সে ব্যাগ আর খাতা ফেলে দৌড় মারলে। আমি লুঠের ধন নিয়ে এসে অচিরাকে দিলুম।

অচিরা বললে, "ভাগ্যিস আপনি—"

আমি বললুম, "আমার কথা বলবেন না, ভাগ্যিস ও লোকটা এসেছিল।"

"তার মানে?"

"তার মানে, ওরই সাহায্যে আপনার সঙ্গে প্রথম কথাটা হয়ে গেল। এতদিন কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলুম না কী যে বলি।"

"কিন্তু ও যে ডাকাত।"

"না, ও ডাকাত নয়, ও আমার বরকন্দাজ।"

অচিরা মুখে তার খয়েরি রঙের আঁচল তুলে ধরে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল। কী মিষ্টি তার ধ্বনি, যেন ঝরনার স্রোতে নুড়ির সুরওয়ালা শব্দ।

হাসি থামতেই বললে, "কিন্তু সত্যি হলে খুব মজা হত।"

"মজা হত কার পক্ষে।"

"যাকে নিয়ে ডাকাতি তার পক্ষে। এই রকম যে একটা গল্প পড়েছি।"

"তার পরে উদ্ধারকর্তার কী হত।"

"তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে চা খাইয়ে দিতুম।"

"আর এই ফাঁকি উদ্ধারকর্তার কী হবে।"

"তার তো আর-কিছুতে দরকার নেই। সে তো আলাপ করবার প্রথম কথাটা চেয়েছিল—পেয়েছে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম কথা।"

"গণিতের সংখ্যাগুলো হঠাৎ ফুরোবে না তো?"

"কেন ফুরোবে।"

"আচ্ছা, আপনি হলে আমাকে প্রথম কথা কী বলতেন।"

"আমি হলে বলতুম, রাস্তায় ঘাটে কতকগুলো নুড়ি কুড়িয়ে কুড়িয়ে কী ছেলেমানুষি করছেন। আপনার কি বয়স হয় নি।"

"কেন বলেন নি।"

"ভয় করেছিল।"

"ভয়? আমাকে ভয়!"

"আপনি যে বড়ো লোক। দাদুর কাছে শুনেছি। তিনি যে আপনার লেখা প্রবন্ধ বিলিতি কাগজে পড়েছিলেন। তিনি যা পড়েন আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন।"

"এটাও করেছিলেন?"

"হাঁ, করেছিলেন। কিন্তু লাটিন নামের পাহারার ঘটা দেখে জোড়হাত করে বলেছিলুম, দাদু, এটা থাক্‌, বরঞ্চ তোমার কোয়ান্টম থিওরির বইখানা নিয়ে আসি।"

"সেটা বুঝি আপনি বুঝতে পারেন?"

"কিছুমাত্র না। কিন্তু দাদুর একটা বদ্ধ সংস্কার আছে—সবাই সবকিছুই বুঝতে পারে। তাঁর সে বিশ্বাস ভাঙতে আমার ভালো লাগে না। তাঁর আর-একটা আশ্চর্য ধারণা আছে—মেয়েদের সহজবুদ্ধি পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ন। তাই ভয়ে ভয়ে আছি এইবার নিশ্চয়ই 'টাইম-স্পেস'এর জোড়-মেলানো সম্বন্ধের ব্যাখ্যা আমাকে শুনতে হবে। আসল কথা, মেয়েদের উপর তাঁর করুণার অন্ত নেই। দিদিমা যখন বেঁচে ছিলেন, বড়ো বড়ো কথা পাড়লেই তিনি মুখ বন্ধ করে দিতেন। তাই মেয়েদের তীক্ষ্ন বুদ্ধি যে কতদূর যেতে পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিদিমার কাছ থেকে পান নি। আমি ওঁকে হতাশ করতে পারব না। অনেক শুনেছি, বুঝি নি, আরও অনেক শুনব আর বুঝব না।"

অচিরার দুই চোখ কৌতুকে স্নেহে জ্বল্‌জ্বল্‌ ছল্‌ছল্‌ করে উঠল। ইচ্ছে

করছিল স্নিগ্ধ কণ্ঠের এই আলাপ শীঘ্র যেন শেষ হয়ে না যায়। দিনের আলো ম্লান হয়ে এল। সন্ধ্যার প্রথম তারা জ্বলে উঠেছে শালবনের মাথার উপরে। সাঁওতাল মেয়েরা জ্বালানি-কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে ঘরে, দূর থেকে শোনা যাচ্ছে তাদের গান।

এমন সময় বাইরে থেকে ডাক এল, "দিদি, কোথায় তুমি। অন্ধকার হয়ে এল যে। আজকাল সময় ভালো-নয়।"

"ভালো তো নয়ই দাদু, তাই একজন রক্ষাকর্তা নিযুক্ত করেছি।"

অধ্যাপক আসতেই তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলুম। তিনি শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পরিচয় দিলুম, "আমার নাম নবীনমাধব সেনগুপ্ত।"

বৃদ্ধের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, "বলেন কী, আপনিই ডাক্তার সেনগুপ্ত? আপনি তো ছেলেমানুষ।"

আমি বললুম, "নিতান্ত ছেলেমানুষ। আমার বয়স ছত্রিশের বেশি নয়।"

আবার অচিরার সেই কলমধুর কণ্ঠের হাসি, আমার মনে যেন দুনো লয়ের ঝংকারে সেতার বাজিয়ে দিলে। বললে, "দাদুর কাছে পৃথিবীর সবাই ছেলেমানুষ, আর দাদু হচ্ছেন সকল ছেলেমানুষের আগরওয়ালা।"

অধ্যাপক বললেন, "আগরওয়ালা? একটা নতুন শব্দ বাংলায় আমদানি করলে! কোথা থেকে জোটালে?"

"সেই যে তোমার ভালোবাসার মাড়োয়ারি ছাত্র, কুন্দনলাল আগরওয়ালা; আমাকে এনে দিত বোতলে করে আমের চাটনি; আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম আগরওয়ালা কথাটার মানে কী। সে বলেছিল পায়োনিয়র।"

অধ্যাপক বললেন, "ডাক্তার সেনগুপ্ত, আপনার সঙ্গে আলাপ হল যদি, আমাদের ওখানে যেতে হবে তো।"

"কিছু বলতে হবে না দাদু। যাবার জন্যে লাফালাফি করছেন। আমার কাছে শুনেছেন, দেশকালের একজোট তত্ত্ব নিয়ে তুমি ব্যাখ্যা করবে আইনস্টাইনের কাঁধে চড়ে।"

মনে মনে বললুম, 'সর্বনাশ! কী দুষ্টুমি!'

অধ্যাপক অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বললেন, "আপনার বুঝি 'টাইম্-স্পেস'-এর—"

আমি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলুম, "কিছু বুঝি নে 'টাইম-স্পেস'এর। আমাকে বোঝাতে গেলে আপনার সময় নষ্ট হবে মাত্র।"

বৃদ্ধ ব্যগ্র হয়ে বলে উঠলেন, "সময়! এখানে সময়ের অভাব কোথায়! আচ্ছা, এক কাজ করুন-না, আজকে নাহয় আমাদের ওখানে আহার করবেন—কী বলেন।"

আমি লাফ দিয়ে বলতে যাচ্ছিলুম 'এখ্খনি'।

অচিরা বলে উঠল, "দাদু, সাধে তোমাকে বলি ছেলেমানুষ। যখন-তখন নেমন্তন্ন করে তুমি আমাকে মুশকিলে ফেল। এই দণ্ডকারণ্যে ফিরপির দোকান পাব কোথায়। ওঁরা বিলেতের ডিনার-খাইয়ে জাতের সর্বগ্রাসী মানুষ—কেন তোমার নাতনির বদনাম করবে। অন্তত ভেটকিমাছ আর ভেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে তো।"

"আচ্ছা আচ্ছা, তা হলে কবে আপনার সুবিধে হবে বলুন।"

"সুবিধে আমার কালই হতে পারবে। কিন্তু অচিরা দেবীকে বিপন্ন করতে

চাই নে। ঘোর জঙ্গলে পাহাড়ে গুহাগহ্বরে আমাকে ভ্রমণে যেতে হয়। সঙ্গে রাখি থলে ভরে চিঁড়ে, ছড়াকয়েক কলা, বিলিতি বেগুন, কাঁচা ছোলার শাক, চিনেবাদামও কখনও থাকে। আমি সঙ্গে নিয়ে আসব ফলারের আয়োজন, অচিরা দেবী দই দিয়ে স্বহস্তে মেখে আমাকে খাওয়াবেন, এতে যদি রাজি থাকেন তা হলে কোনো কথা থাকবে না।"

"দাদু, বিশ্বাস কোরো না এ-সব লোককে। তুমি বাংলা মাসিকে লিখেছিলে বাঙালির খাদ্যে ভিটেমিনের প্রভাব, সে উনি পড়েছেন, তাই কেবল তোমাকে খুশি করবার জন্যে চিঁড়েকলার ফর্দ তোমাকে শোনালেন।"

আমি ভাবলুম মুশকিলে ফেললে। বাংলা কাগজে ডাক্তারের লেখা ভিটামিনের তত্ত্ব পড়া কোনোকালে আমার দ্বারা সম্ভব নয়; কিন্তু কবুল করি কী করে!— বিশেষত উনি যখন উৎফুল্ল হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সেটা পড়েছেন নাকি।"

আমি বললুম, "পড়ি বা না-পড়ি তাতে কিছু আসে যায় না, আসল কথা—"

"আসল কথা, উনি নিশ্চয় জানেন কাল যদি ওঁকে খাওয়াই, তা হলে ওঁর পাতে পশুপক্ষী স্থাবরজঙ্গম কিছুই বাদ পড়বে না। সেই জন্যে অত নিশ্চিন্ত মনে বিলিতি বেগুনের নামকীর্তন করলেন। ওঁর শরীরটার দিকে দেখো-না চেয়ে, শুধু শাকান্নে গড়া বলে কেউ সন্দেহ করতে পারে? দাদু, তুমি সবাইকেই অত্যন্ত বেশি বিশ্বাস কর, এমন-কি আমাকেও। সেইজন্যে ঠাট্টা করে তোমাকে কিছু বলতে সাহস করি নে।"

বলতে বলতে ধীরে ধীরে আমরা ওঁদের বাড়ির দিকে চলেছি, এমন সময়ে হঠাৎ অচিরা বলে উঠল, "এইবার আপনি ফিরে যান বাসায়।"

"কেন, আমি ভেবেছিলুম আপনাদের বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব।"

"ঘর এলোমেলো হয়ে আছে। আপনি বলবেন, বাঙালি মেয়েরা সব অগোছালো। কাল এমন করে সাজিয়ে রাখব যে মেমসাহেবের কথা মনে পড়বে।"

অধ্যাপক বললেন, "আপনি কিছু মনে করবেন না ডক্টর সেনগুপ্ত, অচি বেশি কথা কচ্ছে, কিন্তু ওর স্বভাব নয় সেটা। এখানে বড়ো নির্জন ব'লে ও জুড়ে রাখে আমার মনকে অনর্গল কথা কয়ে। সেটাই ওর অভ্যেস হয়ে গেছে। ও যখন চুপ করে থাকে তখনই আমার ঘরটা যেন ছম্‌ছম্‌ করতে থাকে, আমার মনটাও। ও জানে সে কথা। আমার ভয় করে পাছে ওকে কেউ ভুল বোঝে।"

বুড়োর গলা জড়িয়ে ধরে অচিরা বললে, "বুঝুক-না দাদু, অত্যন্ত অনিন্দনীয়া হতে চাই নে, সেটা অত্যন্ত আন্‌ইন্টারেস্টিঙ।"

অধ্যাপক সগর্বে বলে উঠলেন, "জানেন সেনগুপ্ত, আমার দিদি কিন্তু কথা কইতে জানে, অমন আমি কাউকে দেখি নি।"

"তুমি আমার মতো কাউকে দেখো নি দাদু, আমিও কাউকে দেখি নি তোমার মতো।"

আমি বললুম, "আচার্যদেব, যাবার আগে আমাকে কিন্তু একটা কথা দিতে হবে।"

"আচ্ছা বেশ।"

"আপনি যতবার আমাকে আপনি বলেন, আমি মনে-মনে ততবার জিভ কাটতে থাকি। আমাকে তুমি যদি বলেন, তা হলে সেটাতেই যথার্থ আপনার স্নেহের সম্মান পাব। এ বাড়িতে আমাকে তুমি-শ্রেণীতে তুলে দিতে আপনার নাতনিও সাহায্য করবেন।"

"সর্বনাশ! আমি সামান্য নাতনি, হঠাৎ অত উঁচুতে নাগাল পাব না, আপনি বড়োলোক। আমি বলি আর-কিছুদিন যাক, যদি ভুলতে পারি আপনার ডিগ্রিধারী রূপ, তা হলে সবই সম্ভব হবে। কিন্তু দাদুর কথা স্বতন্ত্র। এখনই শুরু করো। দাদু, বলো তো, 'তুমি কাল খেতে এসো, দিদি যদি মাছের ঝোলে নুন বেশি দিয়ে ফেলে, তা হলে ভালোমানুষের মতো সহ্য কোরো, বোলো, বাঃ কী চমৎকার, পাতে আরও একটু দিতে হবে।'"

অধ্যাপক সস্নেহে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "ভাই, আর কিছুকাল আগে যদি আমার দিদিকে দেখতে, তা হলে বুঝতে পারতে আসলে ও লাজুক। সেইজন্যে ও যখন আলাপ করা কর্তব্য মনে করে, তখন জোর করতে গিয়ে কথা বেশি হয়ে পড়ে।"

"দেখেছেন ডক্টর সেনগুপ্ত, দাদু আমাকে কী রকম মধুর করে শাসন করেন। যেন ইক্ষুদণ্ড দিয়ে। অনায়াসে বলতে পারতেন, তুমি বড়ো মুখরা, তোমার প্রগল্‌ভতা অত্যন্ত অসহ্য। আপনি কিন্তু আমাকে ডিফেন্‌ড্‌ করবেন। কী বলবেন, বলুন-না।"

"আপনার মুখের সামনে বলব না।"

"বেশি কঠোর হবে?"

"আপনি জানেন আমার মনের কথা।"

"তা হলে থাক্‌। এখন বাড়ি যান।"

"একটা কথা বাকি আছে। কাল আপনাদের ওখানে যে নেমন্তন্ন সে আমার নতুন নামকরণের। কাল থেকে নবীনমাধব নাম থেকে লোপ পাবে ডাক্তার সেনগুপ্ত। সূর্যের কাছে আনাগোনা করতে গিয়ে ধূমকেতুর যেমন লেজটা যায় উড়ে, মুণ্ডটা থাকে বাকি।"

"তা হলে নামকর্তন বলুন, নামকরণ বলছেন কেন।"

"আচ্ছা, তাই সই।"

এইখানে শেষ হল আমার প্রথম বড়োদিন।

বার্ধক্যের কী প্রশান্ত সৌন্দর্য, কী সৌম্য মূর্তি। চোখদুটি যেন আশীর্বাদ করছে। হাতে একটি পালিশ-করা লাঠি, গলায় শুভ্র পাট-করা চাদর, ধুতি যত্নে কোঁচানো, গায়ে তসরের জামা, মাথায় শুভ্র চুল বিরল হয়ে এসেছে, কিন্তু পরিপাটি করে আঁচড়ানো। স্পষ্ট বোঝা যায় এঁর সাজসজ্জায় এঁর দিনযাত্রায় নাতনির হাতের শিল্পকার্য। ইনি যে অতিলালনের অত্যাচার সহ্য করেন, সে কেবল এই মেয়েটিকে খুশি রাখবার জন্যে।

আমার বৈজ্ঞানিক খবরকে ছাড়িয়ে উঠল, এঁদের খবর নেওয়া। অধ্যাপকের নাম ব্যবহার করব, অনিলকুমার সরকার। গত জেনেরেশনের কেম্‌ব্রিজ য়ুনিভার্‌সিটির পি. এইচ. ডি. দলের একজন। মাস কয়েক আগে একটি ঔপনাগরিক কলেজের

অধ্যক্ষতা ত্যাগ করে এখানকার স্টেটের একটা পরিত্যক্ত ডাকবাংলো ভাড়া নিয়ে নিজের খরচে সেটা বাসযোগ্য করেছেন। এইটে হল ইতিহাসের খসড়া, বাকিটুকু বঙ্কিমের চিঠি থেকে মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

আমার গল্পের আদিপর্ব শেষ হয়ে গেল। ছোটোগল্পের আদি ও অন্তে বেশি ব্যবধান থাকে না। জিনিসটাকে ফলিয়ে বলবার লোভ করব না, ওর স্বভাব নষ্ট করতে চাই নে।

অচিরার সঙ্গে স্পষ্ট কথা বলার যুগ এল সংক্ষেপেই। সেদিন চড়িভাতি হয়েছিল তনিকা নদীর তীরে।

অধ্যাপক ছেলেমানুষের মতন হঠাৎ আমাকে জিগ্‌গেসা করে বসলেন, "নবীন, তোমার কী বিবাহ হয়েছে।"

প্রশ্নটা এতই সুস্পষ্টভাবব্যঞ্জক যে আর কেউ হলে ওটা চেপে যেত। আমি উত্তর করলুম, "না, এখনও তো হয় নি।"

অচিরার কাছে কোনো কথাই এড়ায় না। সে বললে, "দাদু, ঐ এখনও শব্দটা সংশয়গ্রস্ত কন্যাকর্তাদের মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে। ওর কোনো যথার্থ মানে নেই।"

"একেবারে মানে যে নেই, এ কথা নিশ্চিত স্থির করলেন কী করে।"

"এটা গণিতের প্রব্লেম; তাও হাইয়ার ম্যাথ্‌ম্যাটিক্‌স্‌ বললে যা বোঝায়, তা নয়। পূর্বেই শোনা গেছে, আপনি ছত্রিশ বছরের ছেলেমানুষ। হিসেব করে দেখলুম এর মধ্যে আপনার মা অন্তত পাঁচসাতবার আপনাকে বলেছেন, 'বাবা, ঘরে বউ আনতে চাই।' আপনি বলেছেন, 'তার আগে চাই লোহার সিন্দুকে টাকা আনতে।' মা চোখের জল মুছে চুপ করে রইলেন। তার পরে ইতিমধ্যে আপনার আর-সব হয়েছে, কেবল ফাঁসি ছিল বাকি। শেষকালে এখানকার রাজসরকারে যখন মোটা মাইনের পদ জুটল, মা আবার বললেন, 'বাবা, এবার বিয়ে করতে হবে, আমার আর কদিন-বা সময় আছে।' আপনি বললেন, 'আমার জীবন আর আমার সায়ান্স্‌ এক, সে আমি দেশকে উৎসর্গ করব। আমি কোনোদিন বিয়ে করব না।' হতাশ হয়ে আবার তিনি চোখের জল মুছে বসে আছেন। আপনার ছত্রিশ বছর বয়সের গণিতফল গণনা করতে আমার গণনায় ভুল হয়েছে কি না বলুন, সত্যি করে বলুন।"

এ মেয়ের সঙ্গে অনবধানে কথা কওয়া বিপদ্‌জনক। কিছুদিন আগেই একটা ব্যাপার ঘটেছিল। প্রসঙ্গক্রমে অচিরা আমাকে বলেছিল, "আমাদের দেশে মেয়েদের আপনারা পান সংসারের সঙ্গিনীরূপে। সংসারে যাদের দরকার নেই, এ দেশের মেয়েরাও তাদের কাছে অনাবশ্যক। কিন্তু বিলেতে যারা বিজ্ঞানের তপস্বী, তাদের তো উপযুক্ত তপস্বিনী জোটে, যেমন ছিল অধ্যাপক কুরির সধর্মিণী মাডাম কুরি। সে রকম কোনো মেয়ে আপনি সে দেশে থাকতে পান নি?"

মনে পড়ে গেল ক্যাথারিনের কথা। এক সঙ্গে কাজ করেছি লণ্ডনে থাকতে। এমন-কি, আমার একটা রিসার্চের বইয়ে আমার নামের সঙ্গে তাঁর নামও জড়িত ছিল। মানতে হল কথাটা। অচিরা বললে, "তাঁকে আপনি বিয়ে করলেন না কেন। তিনি কি রাজি ছিলেন না।"

আবার মানতে হল, "হাঁ, প্রস্তাব তাঁর দিক থেকেই উঠেছিল।"

"তবে?"

"আমার কাজ যে ভারতবর্ষের। শুধু সে তো বিজ্ঞানের নয়।"

"অর্থাৎ ভালোবাসার সফলতা আপনার মতো সাধকের কামনার জিনিস নয়। মেয়েদের জীবনের চরম লক্ষ্য ব্যক্তিগত, আপনাদের নৈর্ব্যক্তিক।"

এ জবাবটা হঠাৎ মুখে এল না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে অচিরা বললে, "বাংলা সাহিত্য আপনি বোধ হয় পড়েন না। কচ ও দেবযানী বলে একটা কবিতা আছে। তাতে ঐ কথাই আছে, মেয়েদের ব্রত হচ্ছে পুরুষকে বাঁধা, আর পুরুষদের ব্রত সে বাঁধন কাটিয়ে অমরলোকের রাস্তা বানানো। কচ বেরিয়ে পড়েছিল দেবযানীর অনুরোধ এড়িয়ে, আপনি কাটিয়ে এসেছেন মায়ের অনুনয়। একই কথা। মেয়েপুরুষের এই চিরকালের দ্বন্দ্বে আপনি জয়ী হয়েছেন। জয় হোক আপনার পৌরুষের। কাঁদুক মেয়েরা, সে কান্না আপনারা নিন পুজার নৈবেদ্য। দেবতার উদ্দেশে আসে নৈবেদ্য, কিন্তু দেবতা থাকেন নিরাসক্ত।"

অধ্যাপক এই আলোচনার মূল লক্ষ্য কিছুই বুঝলেন না। সগর্বে বললেন, "দিদির মুখে গভীর সত্য কেমন বিনা চেষ্টায় প্রকাশ পায়, বাইরের লোকে শুনলে মনে করবে—"

তাঁর কেবলই ভয়, বাইরের লোক তাঁর নাতনিকে ঠিক বুঝতে পারবে না।

অচিরা বললে, "বাইরের লোকে মেয়েদের জ্যাঠামি সইতে পারে না, তাদের কথা তুমি ভেবো না। তুমি আমাকে ঠিক বুঝলেই হল।"

অচিরা খুব বড়ো কথাও বলে থাকে হাসির ছলে, কিন্তু আজ সে কী গম্ভীর। আমার একটা কথা আন্দাজে মনে হল, ভবতোষ ওকে বুঝিয়েছিল যে, সে যে ভারত-সরকারের উচ্চ গগনের জ্যোতির্লোক থেকে বধূ এনেছে, তারও লক্ষ্য খুব উচ্চ এবং নিঃস্বার্থ। ব্রিটিশ রাষ্ট্রশাসনের ভাণ্ডার হতেই সে শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে দেশের কাজে লাগাতে। এত সহজ নয় অচিরাকে ছলনা করা। সে যে ভোলে নি, তার প্রমাণ রয়ে গেছে সেই দ্বিখণ্ডিত চিঠির খামটা থেকেই।

অচিরা আবার বললে, "দেবযানী কচকে কী অভিসম্পাত দিয়েছিল জানেন নবীনবাবু?"

"না।"

"বলেছিল, 'তোমার জ্ঞানসাধনার ধন তুমি নিজে ব্যবহার করতে পারবে না, অন্যকে দান করতে পারবে।' আমার কাছে কথাটা আশ্চর্য বোধ হয়। যদি এই অভিসম্পাত আজ দিত কেউ য়ুরোপকে, তা হলে সে বেঁচে যেত। বিশ্বের জিনিসকে নিজের জিনিসের মতো ব্যবহার করেই ওরা লোভের তাড়ায় মরছে। সত্যি কি না বলো দাদু।"

"খুব সত্যি। কিন্তু আশ্চর্য এই, এত কথা তুমি কী করে ভাবলে।"

"নিজগুণে একটুও নয়। ঠিক এই রকম কথা তোমার কাছে অনেকবার শুনেছি। তোমার একটা মহদ্‌গুণ আছে, ভোলানাথ তুমি, কখন্ কী বল সমস্ত ভুলে যাও। চোরাই মালের উপর নিজের ছাপ লাগিয়ে দিতে ভয় থাকে না।"

আমি বললুম, "চুরিবিদ্যা বড়ো বিদ্যা। বিদ্যায় বলো, রাষ্ট্রেই বলো, বড়ো বড়ো

সম্রাট বড়ো বড়ো চোর। আসল কথা, তারাই ছিঁচকে চোর, ছাপ মারবার পূর্বেই যারা ধরা পড়ে।"

অচিরা বললে, "ওঁর কত ছাত্র ওঁর মুখের কথা খাতায় টুকে নিয়ে বই লিখে নাম করেছে। উনি তাদের লেখা পড়ে আশ্চর্য হয়ে প্রশংসা করেন। জানতেই পারেন না নিজের প্রশংসা নিজেই করছেন। আমার ভাগ্যে এ প্রশংসা প্রায়ই জোটে—*নবীনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেই উনি কবুল করবেন আমার ওরিজিন্যালিটির কথা* খাতায় লিখতে শুরু করেছেন, যে খাতায় তাম্রপ্রস্তরযুগের নোট রাখেন। মনে আছে, দাদু, অনেক দিনের কথা যখন কলেজে ছিলে, আমাকে কচ ও দেবযানীর কবিতা শুনিয়েছিলে? সেইদিন থেকে আমি পুরুষের উচ্চ গৌরব মনে মনে মেনেছি, কক্‌খনো মুখে স্বীকার করি নে।"

"কিন্তু দিদি, আমার কোনো কথায় আমি মেয়েদের গৌরবের লাঘব করি নি।"

"তুমি করবে? তুমি যে মেয়েদের অন্ধ ভক্ত, তোমার মুখের স্তবগান শুনে মনে মনে হাসি। মেয়েরা নির্লজ্জ হয়ে সব মেনে নেয়। সস্তায় প্রশংসা আত্মসাৎ করা ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে।"

সেদিন এই-যে কথাবার্তা হয়ে গেল, এ নেহাত হাস্যালাপ নয়। এর মধ্যে ছিল যুদ্ধের সূচনা। অচিরার স্বভাবের দুটো দিক ছিল, আর তার ছিল দুটো আশ্রয়—এক ছিল তাদের নিজেদের বাড়ি, আর ছিল সেই পঞ্চবটী। ওর সঙ্গে যখন আমার বেশ সহজ সম্বন্ধ হয়ে এসেছে তখন স্থির করেছিলুম, ঐ পঞ্চবটীর নিভৃতে হাসি-কৌতুকের ছলে আমার জীবনের সদ্যসংকটের কথা কোনো রকম করে তুলব এবং নিষ্পত্তির দিকে নিয়ে যাব। কিন্তু ওখানে পথ বন্ধ। আমাদের পরিচয়ের প্রথম দিনে প্রথম কথা যেমন মুখে আসছিল না, তেমনি এখানে যে অচিরা আছে তার কাছে প্রথম কথা নেই। মোকাবিলায় ওর চরম মনের কথায় পৌঁছবার কোনো উপায় খুঁজে পাই নে। ওর দাদুর কাছে ওর সহাস্যমুখরতা রোধ করে দেয় আমার তরফের এক-পা অগ্রগতি আর ওর নিভৃত বনচ্ছায়ায় আমার সমস্ত চাঞ্চল্য ঠেকিয়ে রেখেছে নির্বাক্‌ নিঃশব্দতায়। কোনো-কোনোদিন ওদের ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণসভায় একটা কোনো সীমানায় মন খোলবার সুযোগ পাওয়া যায়, অচিরা বুঝতে পারে আমি বিপদ্‌-মণ্ডলীর কাছাকাছি আসছি, সেই দিনই ওর বাক্যবাণবর্ষণের অবিরলতা অস্বাভাবিক বেড়ে ওঠে। একটুও ফাঁক পাই নে, আর আবহাওয়াও হয়ে ওঠে প্রতিকূল। আমার মন হয়েছে অত্যন্ত অশান্ত; কাজের বাধা এমনি ঘটছে যে, আমি লজ্জা পাচ্ছি মনে মনে। সদরে বাজেটের মিটিঙে আমার রিসর্চ্‌বিভাগে আরও কিছু টাকা মঞ্জুর করে নেবার প্রস্তাব আছে, তারই সমর্থক রিপোর্ট্‌ অর্ধেকের বেশি লেখা হয় নি। ইতিমধ্যে ক্রোচের এস্‌থেটিক্‌স্‌ সম্বন্ধে আলোচনা রোজ কিছুদিন ধরে শুনে আসছি। বিষয়টা সম্পূর্ণ আমার উপলব্ধির এবং উপভোগের বাইরে—সে কথা অচিরা নিশ্চিত জানে। দাদুকে উৎসাহিত করে আর মনে মনে হাসে। সম্প্রতি চলছে Behaviourism সম্বন্ধে যত বিরুদ্ধ যুক্তি আছে তার ব্যাখ্যা। এই তত্ত্বালোচনার শোচনীয়তা হচ্ছে এই যে, অচিরা এই সময়টাতে ছুটি নিয়ে বাগানের কাজে চলে যায়, বলে, 'এ-সব তর্ক পূর্বেই শুনেছি।' আমি বোকার মতো বসে থাকি মাঝে মাঝে দরজার দিকে তাকাই। একটা সুবিধে এই যে, অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করেন না—

তর্কের কোনো একটা দুরূহ গ্রন্থি বুঝতে পারছি কি না। তাঁর মনে হয় সমস্তই জলের মতো বোঝা যায়।

কিন্তু আর তো চলবে না, কোনো ছিদ্রে আসল কথাটা পাড়তেই হবে। পিক্‌নিকের এক অবকাশে অধ্যাপক যখন পোড়ো মন্দিরের সিঁড়িটাতে বসে নব্য কেমিস্ট্রির নতুন আমদানির বই পড়ছিলেন, বেঁটে আবলুস গাছের ঝোপের মধ্যে বসে অচিরা হঠাৎ আমাকে বললে, "এই চিরকালের বনের মধ্যে যে একটা অন্ধ প্রাণের শক্তি আছে, ক্রমেই তাকে আমার ভয় করছে।"

আমি বললুম, "আশ্চর্য, ঠিক এই রকমের কথা সেদিন আমি আমার ডায়ারিতে লিখেছি।"

অচিরা বলে চলল, "পুরনো ইমারতের কোনো-একটা ফাটলে লুকিয়ে লুকিয়ে অশথের একটা অংকুর ওঠে, তার পরে শিকড়ে শিকড়ে জড়িয়ে ধ'রে তার সর্বনাশ করে, এও তেমনি। দাদুর সঙ্গে এই কথাটাই হচ্ছিল। দাদু বলছিলেন, 'লোকালয় থেকে বহুদিন একান্ত দূরে থাকলে মানবচিত্ত প্রকৃতির প্রভাবে দুর্বল হতে থাকে, প্রবল হয়ে ওঠে আদিম প্রাণপ্রকৃতির প্রভাব।' আমি বললুম, 'এ রকম অবস্থায় কী করা যায়?' তিনি বললেন, 'মানুষের চিত্তকে আমরা তো সঙ্গে করে আনতে পারি— ভিড়ের চেয়ে নির্জনে তাকে বরঞ্চ বেশি করে পাই, এই দেখো-না আমার বইগুলি।' দাদুর পক্ষে বলা সহজ, কিন্তু সবাইকে এক ওষুধ খাটে না। আপনি কী বলেন।"

আমি বললুম, "আচ্ছা, বলব। আমার কথাটা ঠিকমত বুঝে দেখবেন। আমার মত এই যে, এই রকম জায়গায় এমন একজন মানুষের সঙ্গ সমস্ত অন্তর বাহিরে পাওয়া চাই, যার প্রভাব মানবপ্রকৃতিকে সম্পূর্ণ করে রাখতে পারে। যতক্ষণ না পাই ততক্ষণ অন্ধশক্তির কাছে কেবলই হার ঘটতে থাকবে। আপনি যদি সাধারণ মেয়েদের মতো হতেন, তা হলে আপনার কাছে সত্য কথা শেষপর্যন্ত স্পষ্ট করে বলতে মুখে বাধত।"

অচিরা বললে, "বলুন আপনি, দ্বিধা করবেন না।"

বললুম, "আমি সায়ান্টিস্ট্, যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা ইম্পার্সোনাল ভাবে বলব।— আপনি একদিন ভবতোষকে অত্যন্ত ভালোবেসেছিলেন। আজও কি আপনি তাঁকে তেমনি ভালোবাসেন।"

"আচ্ছা, মনে করুন, বাসি নে।"

"আমিই আপনার মনকে সরিয়ে এনেছি।"

"তা হতে পারে, কিন্তু একলা আপনি নন, বনের ভিতরকার এই ভীষণ অন্ধশক্তি। সেইজন্যে আমি এই সরে আসাকে শ্রদ্ধা করি নে, লজ্জা পাই।"

"কেন করেন না।"

"দীর্ঘকালের প্রয়াসে মানুষ চিত্তশক্তিতে নিজের আদর্শকে গড়ে তোলে, প্রাণ-শক্তির অন্ধতা তাকে ভাঙে! আপনার দিকে আমার যে ভালোবাসা সে সেই অন্ধশক্তির আক্রমণে।"

"ভালোবাসাকে আপনি এমন করে গঞ্জনা দিচ্ছেন নারী হয়ে?"

"নারী বলেই দিচ্ছি। ভালোবাসার আদর্শ আমাদের পুজোর জিনিস। তাকেই বলে সতীত্ব। সতীত্ব একটা আদর্শ। এ জিনিসটা বনের প্রকৃতির নয়, মানবীর। এ

নির্জনে এতদিন সেই আদর্শকে আমি পূজা করছিলুম সকল আঘাত সকল বঞ্চনা সত্ত্বেও। তাকে রক্ষা করতে না পারলে আমার শুচিতা থাকে না।"

"আপনি শ্রদ্ধা করতে পারেন ভবতোষকে?"

"না।"

"তার কাছে যেতে পারেন?"

"না। কিন্তু সে আর আমার সেই জীবনের প্রথম ভালোবাসা, এক নয়। এখন আমার কাছে সেই ভালোবাসা ইম্পার্সোনাল। কোনো আধারের দরকার নেই।"

"ভালো বুঝতে পারছি নে।"

"আপনি বুঝতে পারবেন না। আপনাদের সম্পদ জ্ঞানের—উচ্চতম শিখরে সে জ্ঞান ইম্পার্সোনাল। মেয়েদের সম্পদ হৃদয়ের, যদি তার সব হারায়—যা-কিছু বাহ্যিক, যা দেখা যায়, ছোঁওয়া যায়, ভোগ করা যায়—তবু বাকি থাকে তার সেই ভালোবাসার আদর্শ যা অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ। অর্থাৎ ইম্পার্সোনাল।"

আমি বললুম, "দেখুন, তর্ক করবার সময় আর নেই। এখানকার কাগজে বোধ হয় দেখে থাকবেন, আমার এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে। অ্যাসিস্টেণ্ট্ জিয়লজিস্ট্ লিখেছেন, এখান থেকে আরও কিছু দূরে সন্ধানের কাজ আরম্ভ করতে হবে। কিন্তু—"

"কেন গেলেন না।"

"আপনার কাছ থেকে—"

"আমার কাছ থেকে শেষ কথাটা শুনতে চান, প্রথম কথাটা পূর্বেই আদায় করা হয়েছে!"

"হাঁ, ঠিক তাই।"

"তা হলে কথাটা পরিষ্কার করে বলি। আমার ঐ পঞ্চবটীর মধ্যে বসে আপনার অগোচরে কিছুকাল আপনাকে দেখেছি। সমস্ত দিন পরিশ্রম করেছেন, মানেন নি প্রখর রৌদ্রের তাপ। কোনো দরকার হয় নি কারও সঙ্গের। এক-একদিন মনে হয়েছে হতাশ হয়ে গেছেন, যেটা পাবেন নিশ্চিত করেছিলেন সেটা পান নি। কিন্তু তার পরদিন থেকেই আবার অক্লান্ত মনে খোঁড়াখুঁড়ি চলেছে। বলিষ্ঠ দেহকে বাহন করে বলিষ্ঠ মনের যেন জয়যাত্রা চলছে। এমনতরো বিজ্ঞানের তপস্বী আমি আর কখনও দেখি নি। দূরে থেকে ভক্তি করেছি।"

"এখন বুঝি—"

"না, বলি শুনুন। আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় যতই এগিয়ে চলল, ততই দুর্বল হল সেই সাধনা। নানা তুচ্ছ উপলক্ষে কাজে বাধা পড়তে লাগল। তখন ভয় হল নিজেকে, এই নারীকে। ছি ছি, কী পরাজয়ের বিষ এনেছি আমার মধ্যে! এই তো আপনার দিকের কথা, এখন আমার কথাটা বলি। আমারও একটা সাধনা ছিল, সেও তপস্যা। তাতে আমার জীবনকে পবিত্র করবে, উজ্জ্বল করবে, এ আমি নিশ্চয় জানতুম। দেখলুম ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছি—যে চাঞ্চল্য আমাকে পেয়ে বসেছিল তার প্রেরণা এই ছায়াচ্ছন্ন বনের নিশ্বাসের ভিতর থেকে, সে আদিম প্রাণের শক্তির। মাঝে-মাঝে এখানকার রাক্ষসী রাত্রির দ্বারা আবিষ্ট হয়ে মনে হয়েছে, একদিন আমার দাদুর কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে বুঝি এমন প্রবৃত্তিরাক্ষস আছে।

তার বিশ হাত দিনে দিনে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তখনই *বিছানা ফেলে ছুটে গিয়ে ঝরনার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি স্নান করেছি।"*

এই কথা বলতে বলতে অচিরা ডাক দিলে, "দাদু!"

অধ্যাপক তাঁর পড়া ফেলে রেখে কাছে এসে মধুর স্নেহে বললেন, "কী দিদি?"

"তুমি সেদিন বলছিলে না, মানুষের সত্য তার তপস্যার ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে?—তার অভিব্যক্তি বায়োলজির নয়।"

"হাঁ, তাই তো আমি বলি। পৃথিবীতে বর্বর মানুষ জন্তুর পর্যায়ে। কেবলমাত্র তপস্যার ভিতর দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মানুষ। আরও তপস্যা সামনে আছে, আরও স্থূলত্ব বর্জন করতে হবে, তবে সে হবে দেবতা। পুরাণে দেবতার কল্পনা আছে, কিন্তু অতীতে দেবতা ছিলেন না, দেবতা আছেন ভবিষ্যতে, মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।"

"দাদু, এইবার তোমার আমার কথাটা চুকিয়ে দিই। কদিন থেকে মনের মধ্যে তোলপাড় করছে।"

আমি উঠে পড়ে বললুম, "তা হলে আমি যাই।"

"না, আপনি বসুন। দাদু, তোমার সেই কলেজের যে অধ্যক্ষপদ তোমার ছিল, সেটা আবার খালি হয়েছে। সেক্রেটারি খুব অনুনয় করে তোমাকে লিখেছেন সেই পদ ফিরে নিতে। তুমি আমাকে সব চিঠি দেখাও, কেবল এই চিঠিটাই দেখাও নি। তাতেই তোমার দুরভিসন্ধি সন্দেহ করে ঐ চিঠিটা চুরি করে দেখেছি।"

"আমারই অন্যায় হয়েছিল।"

"কিছু অন্যায় হয় নি। আমি তোমাকে টেনে এনেছি তোমার আসন থেকে। আমরা কেবল নামিয়ে আনতেই আছি।"

"কী বলছ দিদি!"

"সত্যি কথাই বলছি। বিশ্বজগৎ না থাকলে বিধাতার হাত খালি হয়, ছাত্র না থাকলে তোমার তেমনি। সত্যি কথা বলো।"

"বরাবর ইস্কুলমাস্টারি করেছি কিনা তাই—"

"তুমি আবার ইস্কুলমাস্টার! তুমি born teacher, তুমি আচার্য। তোমার জ্ঞানের সাধনা নিজের জন্যে নয়, অন্যকে দানের জন্যে। দেখেন নি নবীনবাবু?—মাথায় একটা আইডিয়া এলে আমাকে নিয়ে পড়েন, দয়ামায়া থাকে না; বারো-আনা বুঝতে পারি নে। নইলে আপনাকে নিয়ে বসেন, সে আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। আপনার মন যে কোন্ দিকে, বুঝতেই পারেন না, ভাবেন বিশুদ্ধ জ্ঞানের দিকে। দাদু, ছাত্র তোমার নিতান্তই চাই, কিন্তু বাছাই করে নিতে ভুলো না।"

অধ্যাপক বললেন, "ছাত্রই তো শিক্ষককে বাছাই করে, গরজ তো তারই।"

"আচ্ছা, সে কথা পরে হবে। সম্প্রতি আমার চৈতন্য হয়েছে, যিনি শিক্ষক তাঁকে গ্রন্থকীট করে তুলছি। এমনি করে তপস্যা ভাঙি নিজের অন্ধ গরজে। সে কাজ তোমাকে নিতে হবে, এখনই যেতে হবে সেখানে ফিরে।"

অধ্যাপক হতবুদ্ধির মতো অচিরার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। অচিরা বললে, "ও, বুঝেছি, তুমি ভাবছ আমার কী গতি হবে। আমার গতি তুমি। ভোলানাথ, আমাকে যদি তোমার পছন্দ না হয়, তা হলে দিদিমা দি সেকেণ্ডের আমদানি করতে

হবে, তোমার লাইব্রেরি বেচে তাঁর গয়না বানিয়ে দেবে, আমি দেব লম্বা দৌড়। অত্যন্ত অহংকার না বাড়লে এ কথা তোমাকে মানতেই হবে, আমাকে না হলে এক-দিনও তো:ার চলে না। আমার অনুপস্থিতিতে পনেরোই আশ্বিনকে পনেরোই অক্টোবর বলে তোমার ধারণা হয়, যেদিন বাড়িতে তোমার সহযোগী অধ্যাপকের নিমন্ত্রণ সেইদিনই লাইব্রেরিঘরে দরজা বন্ধ করে নিদারুণ একটা ইকোয়েশন কষতে লেগে যাও। গাড়িতে চড়ে ড্রাইভরকে যে ঠিকানা দাও সে ঠিকানায় আজও বাড়ি তৈরি হয় নি। নবীনবাবু মনে করছেন আমি অত্যুক্তি করছি।"

আমি বললুম, "একেবারেই না। কিছুদিন তো ওঁকে দেখছি, তার থেকেই অসন্দিগ্ধ বুঝেছি, আপনি যা বলছেন তা খাঁটি সত্য।"

"আজ এত অলক্ষণে কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে কেন। জান নবীন?— এই রকম যা-তা বলবার উপসর্গ ওর সম্প্রতি দেখা দিয়েছে।"

"সব লক্ষণ শান্ত হয়ে যাবে, তুমি চলো দেখি তোমার কাজে। নাড়ি আবার ফিরে আসবে। থামবে প্রলাপ-বকুনি।"

অধ্যাপক আমার দিকে চেয়ে বললেন, "তোমার কী পরামর্শ নবীন।"

উনি পণ্ডিত মানুষ বলেই জিয়লজিস্টের বুদ্ধির 'পরে ওঁর এত শ্রদ্ধা। আমি একটুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললুম, "অচিরাদেবীর চেয়ে সত্য পরামর্শ আপনাকে কেউ দিতে পারবে না।"

অচিরা উঠে দাঁড়িয়ে পা ছুঁয়ে আমাকে প্রণাম করলে। আমি সংকুচিত হয়ে পিছু হটে গেলুম। অচিরা বললে, "সংকোচ করবেন না, আপনার তুলনায় আমি কেউ নই। সে কথাটা একদিন স্পষ্ট হবে। এইখানেই শেষ বিদায় নিলুম। যাবার আগে আর কিন্তু দেখা হবে না।"

অধ্যাপক আশ্চর্য হয়ে বললেন, "সেকি কথা দিদি!"

"দাদু, তুমি অনেক কিছু জান, কিন্তু অনেক কিছু সম্বন্ধে তোমার চেয়ে আমার বুদ্ধি অনেক বেশি সবিনয়ে এ কথাটা স্বীকার করে নিয়ো।"

আমি পদধূলি নিয়ে প্রণাম করলুম অধ্যাপককে। তিনি আমাকে বুকে আলিঙ্গন করে ধরে বললেন, "আমি জানি সামনে তোমার কীর্তির পথ প্রশস্ত।"

এইখানে আমার ছোটো গল্প ফুরল। তার পরেকার কথা জিয়লজিস্টের। বাড়ি ফিরে গিয়ে কাজের নোট এবং রেকর্ড্‌গুলো আবার খুললুম। মনে হঠাৎ খুব একটা আনন্দ জাগল— বুঝলুম একেই বলে মুক্তি। সন্ধ্যাবেলায় দিনের কাজ শেষ করে বারান্দায় এসে বোধ হল— খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে এক টুকরো শিকল। নড়তে চড়তে সেটা বাজে।

৪.১০.৩৯

ফাল্গুন ১৩৪৬

ল্যাবরেটরি

নন্দকিশোর ছিলেন লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি থেকে পাস করা এঞ্জিনিয়ার। যাকে সাধু-ভাষায় বলা যেতে পারে দেদীপ্যমান ছাত্র, অর্থাৎ ব্রিলিয়ান্ট্‌, তিনি ছিলেন তাই। স্কুল থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার তোরণে তোরণে ছিলেন পয়লা শ্রেণীর সওয়ারি।

ওঁর বুদ্ধি ছিল ফলাও, ওঁর প্রয়োজন ছিল দরাজ, কিন্তু ওঁর অর্থসম্বল ছিল আঁট মাপের।

রেলওয়ে কোম্পানির দুটো বড়ো ব্রিজ তৈরি করার কাজের মধ্যে উনি ঢুকে পড়তে পেরেছিলেন। ও কাজের আয়ব্যয়ের বাড়তি-পড়তি বিস্তর, কিন্তু দৃষ্টান্তটা সাধু নয়। এই ব্যাপারে যখন তিনি ডানহাত বাঁহাত দুই হাতই জোরের সঙ্গে চালনা করেছিলেন তখন তাঁর মন খুঁতখুঁত করে নি। এ-সব কাজের দেনাপাওনা নাকি কোম্পানি-নামক একটা অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট্‌ সত্তার সঙ্গে জড়িত, সেই জন্যে কোনো ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের তহবিলে এর পীড়া পৌঁছয় না।

ওঁর নিজের কাজে কর্তারা ওঁকে জীনিয়স বলত, নিখুঁত হিসাবের মাথা ছিল তাঁর। বাঙালি বলেই তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক তাঁর জোটে নি। নীচের দরের বিলিতি কর্মচারী প্যান্টের দুই ভরা পকেটে হাত গুঁজে যখন পা ফাঁক করে 'হ্যালো মিস্টার মল্লিক' বলে ওঁর পিঠ-থাবড়া দিয়ে কর্তাম্বি করত তখন ওঁর ভালো লাগত না। বিশেষত যখন কাজের বেলা ছিলেন উনি, আর দামের বেলা আর নামের বেলা ওরা। এর ফল হয়েছিল এই যে, নিজের ন্যায্য প্রাপ্য টাকার একটা প্রাইভেট হিসেব ওঁর মনের মধ্যে ছিল, সেটা পুষিয়ে নেবার ফন্দি জানতেন ভালো করেই।

পাওনা এবং অপাওনার টাকা নিয়ে নন্দকিশোর কোনোদিন বাবুগিরি করেন নি। থাকতেন শিকদারপাড়া গলির একটা দেড়তলা বাড়িতে। কারখানা-ঘরের দাগ-দেওয়া কাপড় বদলাবার ওঁর সময় ছিল না। কেউ ঠাট্টা করলে বলতেন, 'মজুর মহারাজের তকমা-পরা আমার এই সাজ।'

কিন্তু বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ ও পরীক্ষার জন্যে বিশেষ করে তিনি বাড়ি বানিয়ে-ছিলেন খুব মস্ত। এমন মশগুল ছিলেন নিজের শখ নিয়ে যে, কানে উঠত না লোকেরা বলাবলি করছে—এত বড়ো ইমারতটা যে আকাশ ফুঁড়ে উঠল, আলাদিনের প্রদীপটা ছিল কোথায়।

এক রকমের শখ মানুষকে পেয়ে বসে সেটা মাতলামির মতো, হুঁশ থাকে না যে লোকে সন্দেহ করছে। লোকটা ছিল সৃষ্টিছাড়া, ওঁর ছিল বিজ্ঞানের পাগলামি। ক্যাটালগের তালিকা ওলটাতে ওলটাতে ওঁর সমস্ত মন প্রাণ চৌকির দুই হাতা আঁকড়ে ধরে উঠত ঝেঁকে ঝেঁকে। জর্মানি থেকে, আমেরিকা থেকে, এমন-সব দামী দামী যন্ত্র আনাতেন যা ভারতবর্ষের বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে মেলে না। এই বিদ্যালোভীর মনে সেই তো ছিল বেদনা। এই পোড়াদেশে জ্ঞানের ভোজের উচ্ছিষ্ট নিয়ে সস্তা দরের পাত পাড়া হয়। ওদের দেশে বড়ো বড়ো যন্ত্র ব্যবহারের যে সুযোগ আছে আমাদের দেশে না থাকাতেই ছেলেরা টেক্‌স্‌ট্‌বুকের শুকনো পাতা থেকে

কেবল এ'টোকাটা হাতড়িয়ে বেড়ায়। উনি হে'কে উঠে বলতেন, ক্ষমতা আছে আমাদের মগজে, অক্ষমতা আমাদের পকেটে। ছেলেদের জন্যে বিজ্ঞানের বড়ো রাস্তাটা খুলে দিতে হবে বেশ চওড়া করে, এই হল ওঁর পণ।

দুর্মূল্য যন্ত্র যত সংগ্রহ হতে লাগল, ওঁর সহকর্মীদের ধর্মবোধ ততই অসহ্য হয়ে উঠল। এই সময়ে ওঁকে বিপদের মুখ থেকে বাঁচালেন বড়োসাহেব। নন্দকিশোরের দক্ষতার উপর তাঁর প্রচুর শ্রদ্ধা ছিল। তা ছাড়া রেলওয়ে কাজে মোটা মোটা মুঠোর অপসারণদক্ষতার দৃষ্টান্ত তাঁর জানা ছিল।

চাকরি ছাড়তে হল। সাহেবের আনুকূল্যে রেল-কোম্পানির পুরোনো লোহা-লক্কড় সস্তা দামে কিনে নিয়ে কারখানা ফে'দে বসলেন। তখন য়ুরোপের প্রথম যুদ্ধের বাজার সরগরম। লোকটা অসামান্য কৌশলী, সেই বাজারে নতুন নতুন খালে নালায় তাঁর মুনফার টাকায় বান ডেকে এল।

এমন সময় আর-একটা শখ পেয়ে বসল ওঁকে।

এক সময়ে নন্দকিশোর পাঞ্জাবে ছিলেন তাঁর ব্যবসার তাগিদে। সেখানে জুটে গেল তাঁর এক সাঙ্গিনী। সকালে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন, বিশ বছরের মেয়েটি ঘাগরা দুলিয়ে অসংকোচে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত—জ্বল্‌জ্বলে তার চোখ—ঠোঁটে একটি হাসি আছে, যেন শান-দেওয়া ছুরির মতো। সে ওঁর পায়ের কাছে ঘেঁষে এসে বললে, "বাবুজি, আমি কয়দিন ধরে এখানে এসে দু-বেলা তোমাকে দেখছি। আমার তাজ্জব লেগে গেছে।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "কেন, এখানে তোমাদের চিড়িয়াখানা নেই নাকি?"

সে বললে, "চিড়িয়াখানার কোনো দরকার নেই। যাদের ভিতরে রাখবার, তারা বাইরে সব ছাড়া আছে। আমি তাই মানুষ খুঁজছি।"

"খুঁজে পেলে?"

নন্দকিশোরকে দেখিয়ে বললে, "এই তো পেয়েছি।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "কী গুণ দেখলে বলো দেখি।"

ও বললে, "এখানকার বড়ো বড়ো সব শেঠজি, গলায় মোটা সোনার চেন, হাতে হীরার আংটি, তোমাকে ঘিরে এসেছিল—ভেবেছিল বিদেশী বাঙালী, কারবার বোঝে না। শিকার জুটেছে ভালো। কিন্তু দেখলুম তাদের একজনেরও ফন্দি খাটল না। উলটে ওরা তোমারই ফাঁসকলে পড়েছে। কিন্তু তা ওরা এখনও বোঝে নি, আমি বুঝে নিয়েছি।"

নন্দকিশোর চমকে গেল কথা শুনে। বুঝলে একটি চিজ বটে—সহজ নয়।

মেয়েটি বললে, "আমার কথা তোমাকে বলি, তুমি শুনে রাখো। আমাদের পাড়ায় একজন ডাকসাইটে জ্যোতিষী আছে। সে আমার কুষ্ঠি গণনা করে বলেছিল, একদিন দুনিয়ায় আমার নাম জাহির হবে। বলেছিল আমার জন্মস্থানে শয়তানের দৃষ্টি আছে।"

নন্দকিশোর বললে, "বল কী! শয়তানের?"

মেয়েটি বললে, "জানো তো বাবুজি, জগতে সব চেয়ে বড়ো নাম হচ্ছে ঐ শয়তানের। তাকে যে নিন্দে করে করুক, কিন্তু সে খুব খাঁটি। আমাদের বাবা

বোম্‌ভোলানাথ ভোঁ হয়ে থাকেন। তাঁর কর্ম নয় সংসার চালানো। দেখো-না, সরকার বাহাদুর শয়তানির জোরে দুনিয়া জিতে নিয়েছে, খৃস্টানির জোরে নয়। কিন্তু ওরা খাঁটি, তাই রাজ্য রক্ষা করতে পেরেছে। যেদিন কথার খেলাপ করবে, সেদিন ঐ শয়তানেরই কাছে কানমলা খেয়ে মরবে।"

নন্দকিশোর আশ্চর্য হয়ে গেল।

মেয়েটি বললে, "বাবু, রাগ কোরো না। তোমার মধ্যে ঐ শয়তানের মন্তর আছে। তাই তোমারই হবে জিত। অনেক পুরুষকেই আমি ভুলিয়েছি, কিন্তু আমার উপরেও টেক্কা দিতে পারে এমন পুরুষ আজ দেখলুম। আমাকে তুমি ছেড়ো না বাবু, তা হলে তুমি ঠকবে।"

নন্দকিশোর হেসে বললে, "কী করতে হবে।"

"দেনার দায়ে আমার আইমার বাড়িঘর বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, তোমাকে সেই দেনা শোধ করে দিতে হবে।"

"কত টাকা দেনা তোমার।"

"সাত হাজার টাকা।"

নন্দকিশোরের চমক লাগল, ওর দাবির সাহস দেখে। বললে, "আচ্ছা, আমি দিয়ে দেব, কিন্তু তার পরে?"

"তার পরে আমি তোমার সঙ্গ কখনও ছাড়ব না।"

"কী করবে তুমি।"

"দেখব, যেন কেউ তোমায় ঠকাতে না পারে আমি ছাড়া।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "আচ্ছা বেশ, রইল কথা, এই পরো আমার আংটি।"

কষ্টিপাথর আছে ওঁর মনে, তার উপরে দাগ পড়ল, একটা দামি ধাতুর। দেখতে পেলেন মেয়েটির ভিতর থেকে ঝক্ ঝক্ করছে ক্যারেক্‌টরের তেজ— বোঝা গেল ও নিজের দাম নিজে জানে, তাতে একটুমাত্র সংশয় নেই।

নন্দকিশোর অনায়াসে বললে 'দেব টাকা'— দিলে সাত হাজার বুড়ি আইমাকে।

মেয়েটিকে ডাকত সবাই সোহিনী বলে। পশ্চিমী ছাঁদের সুকঠোর এবং সুন্দর তার চেহারা। কিন্তু চেহারায় মন টলাবে, নন্দকিশোর সে জাতের লোক ছিলেন না। যৌবনের হাটে মন নিয়ে জুয়ো খেলবার সময়ই ছিল না তাঁর।

নন্দকিশোর ওকে যে দশা থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেটা খুব নির্মল নয়, এবং নিভৃত নয়। কিন্তু ঐ একরোখা একগুঁয়ে মানুষ সাংসারিক প্রয়োজন বা প্রথাগত বিচারকে গ্রাহ্য করতেন না। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করত 'বিয়ে করেছ কি।' উত্তরে শুনত, বিয়েটা খুব বেশি মাত্রায় নয়, সহ্যমত। লোকে হাসত যখন দেখত, উনি স্ত্রীকে নিজের বিদ্যের ছাঁচে গড়ে তুলতে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করত, "ও কি প্রোফেসারি করতে যাবে নাকি!"

নন্দ বলতেন, "না, ওকে নন্দকিশোরি করতে হবে, সেটা যে-সে মেয়ের কাজ নয়।"

বলত, "আমি অসবর্ণবিবাহ পছন্দ করি নে।"

"সে কী হে!"

"স্বামী হবে এঞ্জিনিয়ার আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনী, এটা মানবধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ঘরে ঘরে দেখতে পাই দুই আলাদা আলাদা জাতে গাঁটছড়াবাঁধা, আমি জাত মিলিয়ে নিচ্ছি। পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও।"

২

নন্দকিশোর মারা গেলেন প্রৌঢ় বয়সে কোন্-এক দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অপঘাতে।

সোহিনী সমস্ত কারবার বন্ধ করে দিলে। বিধবা মেয়েদের ঠকিয়ে খাবার ব্যাবসাদার এসে পড়ল চার দিক থেকে। মামলার ফাঁদ ফাঁদলে আত্মীয়তার ছিটে-ফোঁটা আছে যাদের। সোহিনী স্বয়ং সমস্ত আইনের প্যাঁচ নিতে লাগল বুঝে। তার উপরে নারীর মোহজাল বিস্তার করে দিলে স্থান বুঝে উকিলপাড়ায়। সেটাতে তার অসংকোচ নৈপুণ্য ছিল, সংস্কার মানার কোনো বালাই ছিল না। মামলায় জিতে নিলে একে একে, দূর সম্পর্কের দেওর গেল জেলে দলিল জাল করার অপরাধে।

ওদের একটি মেয়ে আছে, তার নামকরণ হয়েছিল নীলিমা। মেয়ে স্বয়ং সেটিকে বদল করে নিয়েছে—নীলা। কেউ না মনে করে, বাপ-মা মেয়ের কালো রঙ দেখে একটা মোলায়েম নামের তলায় সেই নিন্দেটি চাপা দিয়েছে। মেয়েটি একেবারে ফুট্‌ফুটে গৌরবর্ণ। মা বলত, ওদের পূর্বপুরুষ কাশ্মীর থেকে এসেছিল—মেয়ের দেহে ফুটেছে কাশ্মীরী শ্বেতপদ্মের আভা, চোখেতে নীলপদ্মের আভাস, আর চুলে চমক দেয় যাকে বলে পিঙ্গলবর্ণ।

মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গে কুলশীল জাতগুষ্টির কথা বিচার করবার রাস্তা ছিল না। একমাত্র ছিল মন ভোলাবার পথ, শাস্ত্রকে ডিঙিয়ে গেল তার ভেলকি। অল্প বয়সের মাড়োয়ারি ছেলে, তার টাকা পৈতৃক, শিক্ষা এ কালের। অকস্মাৎ সে পড়ল এসে অনঙ্গের অলক্ষ্য ফাঁদে। নীলা একদিন গাড়ির অপেক্ষায় ইস্কুলের দরজার কাছে ছিল দাঁড়িয়ে। সেই সময় ছেলেটি দৈবাৎ তাকে দেখেছিল। তার পর থেকে আরও কিছুদিন ঐ রাস্তায় সে বায়ুসেবন করেছে। স্বাভাবিক স্ত্রীবুদ্ধির প্রেরণায় মেয়েটি গাড়ি আসবার বেশ কিছুক্ষণ পূর্বেই গেটের কাছে দাঁড়াত। কেবল সেই মাড়োয়ারি ছেলে নয়, আরও দুচার সম্প্রদায়ের যুবক ঐখানটায় অকারণ পদচারণার চর্চা করত। তার মধ্যে ঐ ছেলেটিই চোখ বুজে দিল ঝাঁপ ওর জালের মধ্যে। আর ফিরল না। সিভিল মতে বিয়ে করলে সমাজের ওপারে। বেশি দিনের মেয়াদে নয়। তার ভাগ্যে বধূটি এল প্রথমে, তার পরে দাম্পত্যের মাঝখানটাতে দাঁড়ি টানলে টাইফয়েড, তার পরে মুক্তি।

সৃষ্টিতে অনাসৃষ্টিতে মিশিয়ে উপদ্রব চলতে লাগল। মা দেখতে পায় তার মেয়ের ছট্‌ফটানি। মনে পড়ে নিজের প্রথম বয়সের জ্বালামুখীর অগ্নিচাঞ্চল্য। মন উদ্‌বিগ্ন হয়। খুব নিবিড় করে পড়াশোনার বেড়া ফাঁদতে থাকে। পুরুষ শিক্ষক রাখল না। একজন বিদুষীকে লাগিয়ে দিল ওর শিক্ষকতায়। নীলার যৌবনের আঁচ লাগত তারও মনে, তুলত তাকে তাতিয়ে অনির্দেশ্য কামনার তপ্ত-বাষ্পে। মুগ্ধের দল ভিড় করে আসতে লাগল এ দিকে, ও দিকে। কিন্তু দরওয়াজা

বন্ধ। বন্ধুত্বপ্রয়াসিনীরা নিমন্ত্রণ করে চায়ে টেনিসে সিনেমায়, নিমন্ত্রণ পেঁৗছয় না কোনো ঠিকানায়। অনেক লোভী ফিরতে লাগল মধুগন্ধভরা আকাশে, কিন্তু কোনো অভাগ্য কাঙাল সোহিনীর ছাড়পত্র পায় না। এ দিকে দেখা যায় উৎকণ্ঠিত মেয়ে সুযোগ পেলে উঁকিঝুঁকি দিতে চায় অজায়গায়। বই পড়ে যে বই টেক্স্‌ট্‌বুক কমিটির অনুমোদিত নয়, ছবি গোপনে আনিয়ে নেয় যা আর্ট্‌-শিক্ষার আনুকূল্যে করে বলে বিড়ম্বিত। ওর বিদুষী শিক্ষয়িত্রীকে পর্যন্ত অন্যমনস্ক করে দিলে। ডায়োসিশন থেকে বাড়ি ফেরবার পথে আলুথালু-চুল-ওয়ালা গোঁফের-রেখামাত্র-দেওয়া সুন্দর-হানো এক ছেলে ওর গাড়িতে চিঠি ফেলে দিয়েছিল। ওর রক্ত উঠেছিল ছম্‌ ছম্‌ করে। চিঠিখানা লুকিয়ে রেখেছিল জামার মধ্যে। ধরা পড়ল মায়ের কাছে। সমস্ত দিন ঘরে বন্ধ থেকে কাটল অনাহারে।

সোহিনীর স্বামী যাদের বৃত্তি দিয়েছিলেন, সেই-সব ভালো ভালো ছাত্রমহলে সোহিনী পাত্র সন্ধান করেছে। সবাই প্রায় আড়ে আড়ে ওর টাকার থলির দিকে তাকায়! একজন তো তার থিসিস ওর নামে উৎসর্গ করে বসল। ও বললে, 'হায় রে কপাল, লজ্জায় ফেললে আমাকে। তোমার পোস্ট্‌ গ্রাজুয়েট মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে শুনলুম, অথচ মালাচন্দন দিলে অজায়গায়— হিসাব করে ভক্তি না করলে উন্নতি হবে না যে।'

কিছুদিন থেকে একটি ছেলের দিকে সোহিনী দৃষ্টিপাত করছিল। ছেলেটি পছন্দসই বটে। তার নাম রেবতী ভট্টাচার্য। এরই মধ্যে সায়ান্সের ডাক্তার পদবীতে চড়ে বসেছে। ওর দুটো-একটা লেখার যাচাই হয়ে গেছে বিদেশে।

৩

লোকের সঙ্গে মেলামেশা করবার কলাকৌশল সোহিনীর ভালো করেই জানা আছে। মন্মথ চৌধুরী রেবতীর প্রথম দিককার অধ্যাপক। তাঁকে নিলে বশ করে। কিছুদিন চায়ের সঙ্গে রুটিটোস্ট্‌, অমলেট, কখনও বা ইলিশমাছের ডিমের বড়া খাইয়ে কথাটা পাড়লে। বললে, "আপনি হয়তো ভাবছেন আমি আপনাকে বারে বারে চা খেতে ডাকি কেন।"

"মিসেস মল্লিক, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলতে পারি—সেটা আমার দুর্ভাবনার বিষয় নয়।"

সোহিনী বললে, "লোকে ভাবে আমরা বন্ধুত্ব করে থাকি স্বার্থের গরজে।"

"দেখো মিসেস মল্লিক, আমার মত হচ্ছে এই—গরজটা যারই হোক, বন্ধুত্বটাই তো লাভ। আর এই বা কম কথা কী, আমার মতো অধ্যাপককে দিয়েও কারও স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে। এ জাতটার বুদ্ধি কেতাবের বাইরে হাওয়া খেতে পায় না বলে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আমার কথা শুনে তোমার হাসি পাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। দেখো, যদিও আমি মাস্টারি করি তবু ঠাট্টা করতেও পারি। দ্বিতীয়বার চা খেতে ডাকবার পূর্বে এটা জেনে রাখা ভালো।"

"জেনে রাখলুম, বাঁচলুম। অনেক অধ্যাপক দেখেছি, তাঁদের মুখ থেকে হাসি বের করতে ডাক্তার ডাকতে হয়।"

"বাহবা, আমারই দলের লোক দেখছি তুমি। তা হলে এবার আসল কথাটা পাড়া হোক।"

"জানেন বোধ হয়, জীবনে আমার স্বামীর ল্যাবরেটরিই ছিল একমাত্র আনন্দ। আমার ছেলে নেই, ঐ ল্যাবরেটরিতে বসিয়ে দেব বলে ছেলে খুঁজছি। কানে এসেছে রেবতী ভট্টাচার্যের কথা।"

অধ্যাপক বললেন, "যোগ্য ছেলেই বটে। তার যে লাইনের বিদ্যে সেটাকে শেষ পর্যন্ত চালান করতে মালমসলা কম লাগবে না।"

সোহিনী বললে, "আমার রাশকরা টাকায় ছাতা পড়ে যাচ্ছে। আমার বয়সের বিধবা মেয়েরা ঠাকুর-দেবতার দালালদের দালালি দিয়ে পরকালের দরজা ফাঁক করে নিতে চায়। আপনি শুনে হয়তো রাগ করবেন, আমি ও-সব কিছুই বিশ্বাস করি নে।"

চৌধুরী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, "তুমি তবে কী মান?"

"মানুষের মতো মানুষ যদি পাই, তবে তার সব পাওনা শোধ করে দিতে চাই যতদূর আমার সাধ্য আছে। এই আমার ধর্মকর্ম।"

চৌধুরী বললেন, "হুর্‌রে। শিলা ভাসে জলে! মেয়েদের মধ্যেও দৈবাৎ কোথাও কোথাও বুদ্ধির প্রমাণ মেলে দেখছি। আমার একটি বি. এস্‌সি. বোকা আছে, সেদিন হঠাৎ দেখি গুরুর পা ছুঁয়ে সে উলটো ডিগবাজি খেলতে লেগেছে, মগজ থেকে বুদ্ধি যাচ্ছে উড়ে ফাটা শিমুলের তুলোর মতো।—তা, তোমার বাড়িতেই ওকে ল্যাবরেটরিতে বসিয়ে দিতে চাও? তফাতে আর কোথাও হলে হয় না?"

"চৌধুরীমশায়, আপনি ভুল করবেন না, আমি মেয়েমানুষ। এইখানেই এই ল্যাবরেটরিতেই হয়েছে আমার স্বামীর সাধনা। তাঁর ঐ বেদির তলায় কোনো-একজন যোগ্য লোককে বাতি জ্বালিয়ে রাখবার জন্যে যদি বসিয়ে দিতে পারি, তা হলে যেখানে থাকুন তাঁর মন খুশি হবে।"

চৌধুরী বললেন, "বাই জোভ, এতক্ষণে মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। শুনতে খারাপ লাগল না। একটা কথা জেনে রেখো, রেবতীকে যদি শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি সাহায্য করতে চাও তা হলে লাখ টাকারও লাইন পেরিয়ে যাবে।"

"গেলেও আমার খুদকুঁড়ো কিছু বাকি থাকবে।"

"কিন্তু পরলোকে যাঁকে খুশি করতে চাও তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে না তো? শুনেছি তাঁরা ইচ্ছা করলে ঘাড়ে চড়ে লাফালাফি করতে পারেন।"

"আপনি খবরের কাগজ পড়েন তো। মানুষ মারা গেলেই তার গুণাবলী প্যারাগ্রাফে প্যারাগ্রাফে ছাপিয়ে পড়তে থাকে। সেই মৃত মানুষের বদান্যতার 'পরে ভরসা করলে তো দোষ নেই। টাকা যে মানুষ জমিয়েছে অনেক পাপ জমিয়েছে সে তার সঙ্গে, আমরা কী করতে আছি যদি থলি ঝেড়ে স্বামীর পাপ হালকা করতে না পারি। যাক গে টাকা, আমার টাকায় দরকার নেই।"

অধ্যাপক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, "কী আর বলব তোমাকে। খনি থেকে সোনা ওঠে, সে খাঁটি সোনা, যদিও তাতে মিশাল থাকে অনেক-কিছু। তুমি সেই ছদ্মবেশী সোনার ঢেলা। চিনেছি তোমাকে। এখন কী করতে হবে বলো।"

"ঐ ছেলেটিকে রাজি করিয়ে দিন।"

"চেষ্টা করব, কিন্তু কাজটা খুব সহজ নয়। আর কেউ হলে তোমার দান লাফিয়ে নিত।"

"কোথায় বাধছে বলুন।"

"শিশুকাল থেকে একটি মেয়ে-গ্রহ ওর কুষ্টি দখল করে বসেছে। রাস্তা আগলে রয়েছে অটল অবুদ্ধি।"

"বলেন কী! পুরুষমানুষ—"

"দেখো মিসেস মল্লিক, রাগ করবে কাকে নিয়ে। জান মেট্রিয়ার্কাল সমাজ কাকে বলে? যে সমাজে মেয়েরাই হচ্ছে পুরুষের সেরা। এক সময়ে সেই দ্রাবিড় সমাজের ঢেউ বাংলাদেশে খেলত।"

সোহিনী বললে, "সে সুদিন তো গেছে। তলায় তলায় ঢেউ খেলে হয়তো, ঘুলিয়ে দেয় বুদ্ধিসুদ্ধি, কিন্তু হাল যে একলা পুরুষের হাতে। কানে মন্ত্র দেন তাঁরাই, আর জোরে দেন কানমলা। কান ছিঁড়ে যাবার জো হয়।"

"আহাহা, কথা কইতে জান তুমি। তোমার মতো মেয়েদের যুগ যদি আসে তা হলে মেট্রিয়ার্কাল সমাজে ধোবার বাড়ির ফর্দ রাখি মেয়েদের শাড়ির, আর আমাদের কলেজের প্রিন্সিপল্‌কে পাঠিয়ে দিই ঢেঁকি কুটতে। মনোবিজ্ঞান বলে, বাংলাদেশে মেট্রিয়ার্কি বাইরে নেই, আছে নাড়িতে। মা মা শব্দে হাম্বাধ্বনি আর কোনো দেশের পুরুষমহলে শুনেছ কি। তোমাকে খবর দিচ্ছি, রেবতীর বুদ্ধির ডগার উপরে চড়ে বসে আছে একটি রীতিমত মেয়ে।"

"কাউকে ভালোবাসে নাকি।"

"আহা, সেটা হলে তো বুঝতুম ওর শিরায় প্রাণ করছে ধুক্‌ধুক্‌। যুবতীর হাতে বুদ্ধি খোওয়াবার বায়না নিয়েই তো এসেছে, এই তো সেই বয়েস। তা না হয়ে এই কাঁচা বয়সে ও যে এক মালাজপকারিণীর হাতে মালার গুটি বনে গেছে। ওকে বাঁচাবে কিসে—না যৌবন, না বুদ্ধি, না বিজ্ঞান।"

"আচ্ছা, একদিন ওঁকে এখানে চা খেতে ডাকতে পারি কি। আমাদের মতো অশুচির ঘরে খাবেন তো?"

"অশুচি! না খায় তো ওকে আছড়ে আছড়ে এমনি শুচি করে নেব যে বামনাইয়ের দাগ থাকবে না ওর মজ্জায়। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার নাকি একটি সুন্দরী মেয়ে আছে।"

"আছে। পোড়াকপালী সুন্দরীও বটে। তা কী করব বলুন।"

"না না, আমাকে ভুল কোরো না। আমার কথা যদি বল—সুন্দরী মেয়ে আমি পছন্দই করি। ওটা আমার একটা রোগ বললেই হয়। কিন্তু ওর আত্মীয়েরা বেরসিক, ভয় পেয়ে যাবে।"

"ভয় নেই, আমি নিজের জাতেই মেয়ের বিয়ে দেব ঠিক করেছি।"

এটা একেবারে বানানো কথা।

"তুমি নিজে তো বেজাতে বিয়ে করেছ।"

"নাকাল হয়েছি কম নয়। বিষয়ের দখল নিয়ে মামলা করতে হয়েছে বিস্তর। যে করে জিতেছি সেটা বলবার কথা নয়।"

"শুনেছি কিছু কিছু। বিপক্ষ পক্ষের আর্টিকেল্‌ড্‌ ক্লার্ক্‌কে নিয়ে তোমার

নামে গুজব রটেছিল। মকদ্দমায় জিতে তুমি তো সরে পড়লে, সে লোকটা গলায় দড়ি দিয়ে মরতে যায় আর-কি।"

"এত যুগ ধরে মেয়েমানুষ টি'কে আছে কী করে। ছল করার কম কৌশল লাগে না, লড়াইয়ের তাগবাগের সমানই সে, তবে কিনা তাতে মধুও কিছু খরচ করতে হয়। এ হল নারীর স্বভাবদত্ত লড়াইয়ের রীতি।"

"ঐ দেখো, আবার তুমি আমাকে ভুল করছ। আমরা বিজ্ঞানী, আমরা বিচারক নই, স্বভাবের খেলা আমরা নিষ্কাম ভাবে দেখে যাই। সে খেলায় যা ফল হবার তা ফলতে থাকে। তোমার বেলায় ফলটা বেশ হিসেবমতই ফলেছিল, বলেছিলুম ধন্য মেয়ে তুমি। এ কথাটাও ভেবেছি, আমি যে তখন প্রোফেসর ছিলুম, আর্টিকেল্‌ড্‌ ক্লার্ক ছিলুম না, সেটা আমার বাঁচোয়া। মার্কারি সূর্যের কাছ থেকে যতটুকু দূরে আছে ততটুকু দূরে থেকেই বেঁচে গেল। ওটা গণিতের হিসাবের কথা, ওতে ভালো নেই মন্দ নেই। এ-সব কথা বোধ হয় তুমি বুঝতে শিখেছ।"

"তা শিখেছি। গ্রহগুলো টান মেনে চলে আবার টান এড়িয়ে চলে—এটা একটা শিখে নেবার তত্ত্ব বই-কি।"

"আর-একটা কথা কবুল করছি। এইমাত্র তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে একটা হিসেব মনে মনে কষছিলুম, সেও অঙ্কের হিসেব। ভেবে দেখো, বয়সটা যদি অন্তত দশটা বছর কম হত তা হলে খামকা আজ একটা বিপদ ঘটত। কোলিশন ঐটুকু পাশ কাটিয়ে গেল। আর-কি! তবু বাষ্পের জোয়ার উঠছে বুকের মধ্যে। ভেবে দেখো, সৃষ্টিটা আগাগোড়াই কেবল অঙ্ক কষার খেলা।"

এই বলে চৌধুরী দুই হাঁটু চাপড়িয়ে হাহা করে হেসে উঠলেন। একটা কথা তাঁর হুঁশ ছিল না যে, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার আগে সোহিনী দুঘণ্টা ধরে রঙে-চঙে এমন করে বয়স বদল করেছে যে সৃষ্টিকর্তাকে আগাগোড়াই দিয়েছে ঠকিয়ে।

৪

পরের দিন অধ্যাপক এসে দেখলেন সোহিনী রোঁয়া-ওঠা হাড়-বের-করা একটা কুকুরকে স্নান করিয়ে তোয়ালে দিয়ে তার গা মুছিয়ে দিচ্ছে।

চৌধুরী জিগ্‌গেসা করলেন, "এই অপয়মন্তটাকে এত সম্মান কেন।"

"ওকে বাঁচিয়েছি ব'লে। পা ভেঙেছিল মোটরের তলায় পড়ে, আমি সারিয়ে তুলেছি ব্যাণ্ডেজ বেঁধে। এখন ওর প্রাণটার মধ্যে আমারও শেয়ার আছে।"

"রোজ রোজ ঐ অলুক্ষুনের চেহারা দেখে মন খারাপ হয়ে যাবে না?"

"চেহারা দেখবার জন্যে ওকে তো রাখি নি। মরতে মরতে এই-যে ও সেরে উঠছে, এটা দেখতে আমার ভালো লাগে। ঐ প্রাণীর বেঁচে থাকবার দরকারটা যখন দিনে দিনে মিটিয়ে দিই, তখন ধর্মকর্ম করতে ছাগলছানার গলায় দড়ি বেঁধে আমাকে কালীতলায় দৌড়তে হয় না। তোমাদের বায়োলজির ল্যাবরেটরির কানাখোঁড়া কুকুর-খরগোশ-গুলোর জন্যে আমি একটা হাসপাতাল বানাব স্থির করেছি।"

"মিসেস মল্লিক, তোমাকে যতই দেখছি তাক লাগছে।"

"আরও বেশি দেখলে ওটার উপশম হবে। রেবতীবাবুর খবর দেবেন বলে-

ছিলেন, সেটা আরম্ভ করে দিন।"

"আমার সঙ্গে দূর সম্পর্কে ওদের যোগ আছে। তাই ওদের ঘরের খবর জানি। রেবতীকে জন্ম দিয়েই ওর মা যান মারা। বরাবর ও পিসির হাতে মানুষ। ওর পিসির আচারনিষ্ঠা একেবারে নিরেট। এতটুকু খুঁত নিয়ে ওঁর খুঁতখুঁতুনি সংসারকে অতিষ্ঠ করে তুলত। তাঁকে ভয় না করত এমন লোক ছিল না পরিবারে। ওঁর হাতে রেবতীর পৌরুষ গেল ছাতু হয়ে। ইস্কুল থেকে ফিরতে পাঁচ মিনিট দেরি হলে পঁচিশ মিনিট লাগত তার জবাবদিহি করতে।"

সোহিনী বললে, "আমি তো জানি পুরুষরা করবে শাসন, মেয়েরা দেবে আদর, তবেই ওজন ঠিক থাকে।"

অধ্যাপক বললেন, "ওজন ঠিক রেখে চলা মরালগামিনীদের ধাতে নেই। ওরা এ দিকে ঝুঁকবে, ও দিকে ঝুঁকবে। কিছু মনে কোরো না মিসেস মল্লিক, ওদের মধ্যেও দৈবাৎ মেলে যারা খাড়া রাখে মাথা, চলে সোজা চালে। যেমন—"

"আর বলতে হবে না। কিন্তু আমার মধ্যেও শিকড়ের দিকে মেয়েমানুষ যথেষ্ট আছে। কী ঝোঁকে পেয়েছে দেখছেন না! ছেলে-ধরা ঝোঁক। নইলে আপনাকে বিরক্ত করতেম কি।"

"দেখো, বার বার ঐ কথাটা বোলো না। জেনে রেখো আজ ক্লাসের জন্যে তৈরি না হয়েই চলে এসেছি। কর্তব্যের গাফেলি এতই ভালো লাগছে।"

"বোধ হয় মেয়েজাতটার 'পরেই আপনার বিশেষ একটু কৃপা আছে।"

"একটুও অসম্ভব নয়। কিন্তু তার মধ্যেও তো ইতরবিশেষ আছে। যা হোক, সে কথাটা পরে হবে।"

সোহিনী হেসে বললে, "পরে না হলেও চলবে। আপাতত যে কথাটা উঠেছে শেষ করে দিন। রেবতীবাবুর এত উন্নতি হল কী করে।"

"যা হতে পারত তার তুলনায় কিছুই হয় নি। একটা রিসার্চের কাজে ওর বিশেষ দরকার হয়েছিল উঁচু পাহাড়ে যাবার। ঠিক করেছিল যাবে বদরিকাশ্রমে। আরে সর্বনাশ! পিসিরও ছিল এক পিসি, সে বুড়ি মরবে তো মরুক ঐ বদরিকারই রাস্তায়। পিসি বললে, 'আমি যতদিন বেঁচে আছি, পাহাড়পর্বত চলবে না।' কাজেই তখন থেকে একমনে যা কামনা করছি সে মুখ ফুটে বলবার নয়। থাক্ সে কথা।"

"কিন্তু শুধু পিসিমাদের দোষ দিলে চলবে কেন। মায়ের দুলাল ভাইপোদের হাড় বুঝি কোনো কালে পাকবে না?"

সে তো পূর্বেই বলেছি। মেট্রিয়ার্কি রক্তের মধ্যে হাম্বাধ্বনি জাগিয়ে তোলে, হতবুদ্ধি হয়ে যায় বৎসরা। আফসোসের কথা কী আর বলব! এ তো হল নম্বর ওয়ান। তার পরে রেবতী যখন সরকারের বৃত্তি নিয়ে কেম্‌ব্রিজে যাবে স্থির হল, আবার এসে পড়ল সেই পিসিমা হাউ-হাউ শব্দে। তার বিশ্বাস, ও চলেছে মেমসাহেব বিয়ে করতে। আমি বললুম, নাহয় করল বিয়ে। সর্বনাশ! কথাটা আন্দাজে ছিল, এবার যেন পাকা দেখা হয়ে গেল। পিসি বললে, 'ছেলে যদি বিলেতে যায় তা হলে গলায় দড়ি দিয়ে মরব।' কোন্ দেবতার দোহাই পাড়লে পাকানো হবে দড়িটা নাস্তিক আমি জানি নে, তাই দড়িটা বাজারে মিলল না। রেবতীকে খুব খানিকটা গাল দিলুম, বললুম স্টুপিড, বললুম ডান্স্, বললুম ইম্‌বেসীল। ব্যস্, ঐখানেই

খতম। রেবু এখন ভারতীয় ঘানিতে ফোঁটা ফোঁটা তেল বের করছেন।"

সোহিনী অস্থির হয়ে বলে উঠল, "দেয়ালে মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে করছে। একটা মেয়ে রেবতীকে তলিয়ে দিয়েছে, আর-একটা মেয়ে তাকে টেনে তুলবে ডাঙায় এই আমার পণ রইল।"

"পষ্ট কথা বলি ম্যাডাম। জানোয়ারগুলোকে শিঙে ধরে তলিয়ে দেবার হাত তোমার পাকা—লেজে ধরে তাদের উপরে তোলবার হাত তেমন দুরস্ত হয় নি। তা, এখন থেকে অভ্যাসটা শুরু হোক। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—সায়ান্সে এত উৎসাহ তোমার এল কোথা থেকে।"

"সকল রকম সায়ান্সেই সারা জীবন আমার স্বামীর মন ছিল মেতে। তাঁর নেশা ছিল বর্মা চুরুট আর ল্যাবরেটরি। আমাকে চুরুট ধরিয়ে প্রায় বর্মিজ মেয়ে বানিয়ে তুলেছিলেন। ছেড়ে দিলুম, দেখলুম পুরুষদের চোখে খটকা লাগে। তাঁর আর-এক নেশা আমার উপর দিয়ে জমিয়েছিলেন। পুরুষরা মেয়েদের মজায় বোকা বানিয়ে, উনি আমাকে মজিয়েছিলেন বিদ্যে দিয়ে দিনরাত। দেখুন চৌধুরীমশায়, স্বামীর দুর্বলতা স্ত্রীর কাছে ঢাকা থাকে না, কিন্তু আমি ওঁর মধ্যে কোনোখানে খাদ দেখতে পাই নি। কাছে থেকে যখন দেখতুম, দেখেছি উনি বড়ো ; আজ দূরে থেকে দেখছি, দেখি উনি আরও বড়ো।"

চৌধুরী জিগ্‌গেসা করলেন, "কোন্‌খানে সব চেয়ে তাঁকে বড়ো ঠেকছে।"

"বলব? উনি বিদ্বান ব'লে নয়। বিদ্যার 'পরে ওঁর নিষ্কাম ভক্তি ছিল ব'লে। উনি একটা পুজোর আলো পুজোর হাওয়ার মধ্যে ছিলেন। আমরা মেয়েরা দেখবার-ছোঁবার মতো জিনিস না পেলে পুজো করবার থই পাই নে। তাঁর এই ল্যাবরেটরি আমার পুজোর দেবতা হয়েছে। ইচ্ছে করে এখানে মাঝে মাঝে ধুপধুনো জ্বালিয়ে শাঁখঘণ্টা বাজাই। ভয় করি আমার স্বামীর ঘৃণাকে। তাঁর দৈনিক পুজো ছিল যখন, এই-সব যন্ত্রতন্ত্র ঘিরে জমত কলেজের ছাত্রেরা, শিক্ষা নিত তাঁর কাছ থেকে, আর আমিও বসে যেতুম।"

"ছেলেগুলো সায়ান্সে মন দিতে পারত কি।"

"যারা পারত তাদেরই বাছাই হয়ে যেত। এমন-সব ছেলে দেখেছি যারা সত্যকার বৈরাগী। আবার দেখেছি কেউ কেউ নোট নেবার ছলে একেবারে পাশের ঠিকানায় চিঠি লিখে সাহিত্যচর্চা করত।"

"কেমন লাগত।"

"সত্যি কথা বলব? খারাপ লাগত না। স্বামী চলে যেতেন কাজে, ভাবুকদের মন আশেপাশে ঘুর্‌ ঘুর্‌ করত।"

"কিছু মনে কোরো না, আমি সাইকলজি স্টাডি করে থাকি। জিগ্‌গেসা করি, ওরা কিছু ফল পেত কি।"

"বলতে ইচ্ছে করে না, নোংরা আমি। দুচারজনের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে যাদের কথা মনে পড়লে আজও মনের মধ্যে মুচড়িয়ে ধরে।"

"দুচারজন?"

"মন যে লোভী—মাংসমজ্জায় নীচে লোভের চাপা আগুন সে লুকিয়ে রেখে দেয়, খোঁচা পেলে জ্বলে ওঠে। আমি তো গোড়াতেই নাম ডুবিয়েছি, সত্যি কথা

বলতে আমার বাধে না। আজন্ম তপস্বিনী নই আমরা। ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের। দ্রৌপদীকুন্তীদের সেজে বসতে হয় সীতাসাবিত্রী। একটা কথা বলি আপনাকে চৌধুরীমশায়, মনে রাখবেন, ছেলেবেলা থেকে ভালোমন্দ-বোধ আমার স্পষ্ট ছিল না। কোনো গুরু আমায় তা শিক্ষা দেন নি। তাই মন্দের মাঝে আমি ঝাঁপ দিয়েছি সহজে, পারও হয়ে গেছি সহজে। গায়ে আমার দাগ লেগেছে কিন্তু মনে ছাপ লাগে নি। কিছু আমাকে আঁকড়ে ধরতে পারে নি। যাই হোক, তিনি যাবার পথে তাঁর চিতার আগুনে আমার আসক্তিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন, জমা পাপ একে একে জ্বলে যাচ্ছে। এই ল্যাবরেটরিতেই জ্বলছে সেই হোমের আগুন।"

"ব্র্যাভো, সত্যি কথা বলতে কী সাহস তোমার।"

"সত্যি কথা বলিয়ে নেবার লোক থাকলে বলা সহজ হয়। আপনি যে খুব সহজ, খুব সত্যি।"

"দেখো, ঐ যে চিঠি-লিখিয়ে ছেলেগুলো তোমার প্রসাদ পেয়েছিল, তারা কি এখনও আনাগোনা করে।"

"সেই করেই তো তারা মুছে দিয়েছে আমার মনের ময়লা। দেখলুম জুটছে তারা আমার চেকবইয়ের দিকে লক্ষ করে। ভেবেছিল মেয়েমানুষের মোহ মরতে চায় না, ভালোবাসার সিঁধের গর্ত দিয়ে পৌঁছবে তাদের হাত আমার টাকার সিন্দুকে। এত রস আমার নেই তারা তা জানত না। আমার শুকনো পাঞ্জাবি মন। আমি সমাজের আইনকানুন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে প'ড়ে, কিন্তু প্রাণ গেলেও বেইমানি করতে পারব না। আমার ল্যাবরেটরির এক পয়সাও তারা খসাতে পারে নি। আমার প্রাণ শক্ত পাথর হয়ে চেপে আছে আমার দেবতার ভাণ্ডারের দ্বার। ওদের সাধ্য নেই যে পাথর গলাবে। আমাকে যিনি বেছে এনেছিলেন তিনি ভুল করেন নি।"

"তাঁকে আমি প্রণাম করি, আর পাই যদি সেই ছেলেগুলোর কান মলে দিই।"

বিদায় নেবার আগে অধ্যাপক একবার ল্যাবরেটরিটা ঘুরে এলেন সোহিনীকে সঙ্গে নিয়ে। বললেন, "এইখানেই মেয়েলিবুদ্ধির চোলাই হয়ে গেছে, অপদেবতার গাদ গেছে নেমে, বেরিয়ে এসেছে খাঁটি স্পিরিট।"

সোহিনী বললে, "যা বলুন, মন থেকে ভয় যায় না। মেয়েলিবুদ্ধি বিধাতার আদিসৃষ্টি। যখন বয়স অল্প থাকে মনের জোর থাকে, তখন সে লুকিয়ে থাকে ঝোপেঝাপে, যেই রক্ত আসে ঠাণ্ডা হয়ে বেরিয়ে আসেন সনাতনী পিসিমা। তার আগেই আমার মরবার ইচ্ছে রইল।"

অধ্যাপক বললেন, "ভয় নেই তোমার, আমি বলছি তুমি সজ্ঞানে মরবে।"

৫

সাদা শাড়ি প'রে, মাথায় কাঁচাপাকা চুলে পাউডার মেখে, সোহিনী মুখের উপর একটা শুচি সাত্ত্বিক আভা মেজে তুললে। মেয়েকে নিয়ে মোটরলঞ্চে করে উপস্থিত হল বোটানিকালে। তাকে পরিয়েছে নীলচে সবুজ বেনারসী শাড়ি, ভিতর থেকে

দেখা যায় বসন্তী রঙের কাঁচুলি। কপালে তার কুঙ্কুমের ফোঁটা, সূক্ষ্ম একটু কাজলের রেখা চোখে, কাঁধের কাছে ঝুলেপড়া গুচ্ছকরা খোঁপা, পায়ে কালো চামড়ার 'পরে লাল মখমলের কাজ-করা স্যাণ্ডেল।

যে আকাশনিম-বীথিকার তলায় রেবতী রবিবার কাটায়, আগে থাকতে সংবাদ নিয়ে সোহিনী সেইখানে এসে তাকে ধরলে। প্রণাম করলে একেবারে তার পায়ে মাথা রেখে। বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠল রেবতী।

সোহিনী বললে, "কিছু মনে কোরো না বাবা, তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমি ছত্রির মেয়ে। চৌধুরীমশায়ের কাছে আমার কথা শুনে থাকবে।"

"শুনেছি। কিন্তু এখানে আপনাকে বসাব কোথায়!"

"এই-যে রয়েছে সবুজ তাজা ঘাস, এমন আসন কোথায় পাওয়া যায়! ভাবছ বোধ হয়, এখানে আমি কী করতে এসেছি। এসেছি আমার ব্রত উদ্‌যাপন করতে। তোমার মতো ব্রাহ্মণ তো খুঁজে পাব না।"

রেবতী আশ্চর্য হয়ে বললে, "আমার মতো ব্রাহ্মণ!"

"তা না তো কী। আমার গুরু বলেছেন, এখনকার কালের সব-সেরা যে বিদ্যা তাতেই যাঁর দখল তিনিই সেরা ব্রাহ্মণ।"

রেবতী অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "আমার বাবা করতেন যজন যাজন, আমি মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানি নে।"

"বল কী, তুমি যে মন্ত্র শিখেছ সেই মন্ত্রে সমস্ত জগৎ হয়েছে মানুষের বশ। তুমি ভাবছ মেয়েমানুষের মুখে এ-সব কথা এল কোথা থেকে। পেয়েছি পুরুষের মতো পুরুষের মুখ থেকে। তিনি আমার স্বামী। যেখানে তাঁর সাধনার পীঠস্থান ছিল, কথা দাও বাবা, সেখানে তোমাকে যেতে হবে।"

"কাল সকালে আমার ছুটি আছে, যাব।"

"তোমার দেখছি গাছপালার শখ। বড়ো আনন্দ হল। গাছপালার খোঁজে আমার স্বামী গিয়েছিলেন বর্মায়, আমি তাঁর সঙ্গ ছাড়ি নি।"

সঙ্গ ছাড়ে নি কিন্তু সায়েন্সের চর্চায় নয়। নিজের ভিতর থেকে যে গাদ উঠত ফুটে, স্বামীর চরিত্রের মধ্যেও সেটা অনুমান না করে থাকতে পারত না। সন্দেহের সংস্কার ছিল ওর আঁতে আঁতে। এক সময়ে নন্দকিশোরের যখন গুরুতর পীড়া হয়েছিল তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন, "মরবার একমাত্র আরাম এই যে, সেখান থেকে তুমি আমাকে খুঁজে বের করে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।"

সোহিনী বললে, "সঙ্গে যেতে পারি তো।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "সর্বনাশ!"

সোহিনী রেবতীকে বললে, "বর্মা থেকে আসবার সময় এনেছিলুম এক গাছের চারা। বর্মিজ্‌রা তাকে বলে কোযাইটানিয়েঙ্গ্‌। চমৎকার ফুলের শোভা—কিন্তু কিছুতেই বাঁচাতে পারলুম না।"

আজই সকালে স্বামীর লাইব্রেরি ঘেঁটে এ নাম সোহিনী প্রথম বের করেছে। গাছটা চোখেও দেখে নি। বিদ্যার জাল ফেলে বিদ্বানকে টানতে চায়।

অবাক হল রেবতী। জিগ্‌গেসা করলে, "এর লাটিন নামটা কী জানেন?"

সোহিনী অনায়াসে বলে দিলে, "তাকে বলে মিলেটিয়া।"

বললে, "আমার স্বামী সহজে কিছু মানতেন না, তবু তাঁর একটা অন্ধবিশ্বাস ছিল ফলে ফুলে প্রকৃতির মধ্যে যা-কিছু আছে সুন্দর, মেয়েরা বিশেষ অবস্থায় তার দিকে একান্ত করে যদি মন রাখে তা হলে সন্তানরা সুন্দর হয়ে জন্মাবেই। এ কথা তুমি বিশ্বাস কর কি।"

বলা বাহুল্য, এটা নন্দকিশোরের মত নয়।

রেবতী মাথা চুলকিয়ে বললে, "যথোচিত প্রমাণ তো এখনও জড়ো হয় নি।"

সোহিনী বললে, "অন্তত একটা প্রমাণ পেয়েছি আমার আপন ঘরেই। আমার মেয়ে অমন আশ্চর্য রূপ পেল কোথা থেকে? বসন্তের নানা ফুলের যেন—থাক্, নিজের চোখে দেখলেই বুঝতে পারবে।"

দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল রেবতী। নাট্যের কোনো সরঞ্জাম বাকি ছিল না।

সোহিনী তার রাঁধুনী বামুনকে সাজিয়ে এনেছে পূজারী বামুনের বেশে। পরনে চেলি, কপালে ফোঁটাতিলক, টিকিতে ফুল বাঁধা, বেলের আঠায় মাজা মোটা পইতে গলায়। তাকে ডেকে বললে, "ঠাকুর, সময় তো হল, নীলুকে এবার ডেকে নিয়ে এসো।"

নীলাকে তার মা বসিয়ে রেখেছিল স্টীমলঞ্চে। ঠিক ছিল ডালি হাতে সে উঠে আসবে, বেশ খানিকক্ষণ তাকে দেখা যাবে সকালবেলার ছায়ায় আলোয়।

ইতিমধ্যে রেবতীকে সোহিনী তন্ন তন্ন করে দেখে নিতে লাগল। রঙ মসৃণ শ্যামবর্ণ, একটু হলদের আভা আছে। কপাল চওড়া, চুলগুলো আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে উপরে তোলা। চোখ বড়ো নয় কিন্তু তাতে দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছ আলো জ্বল্ জ্বল্ করছে, মুখের মধ্যে সেইটেই সকলের চেয়ে চোখে পড়ে। নীচে মুখের বেড়টা মেয়েলি ধাঁচের মোলায়েম। রেবতীর সম্বন্ধে ও যত খবর জোগাড় করেছে তার মধ্যে ও বিশেষ লক্ষ্য করেছে একটা কথা। ছেলেবেলাকার বন্ধুদের ওর উপরে ছিল কান্নাকাটি-জড়ানো সেণ্টিমেণ্টাল ভালোবাসা। ওর মুখে যে একটা দুর্বল মাধুর্য ছিল, তাতে পুরুষ বালকদের মনে মোহ আনতে পারত।

সোহিনীর মনে খটকা লাগল। ওর বিশ্বাস, মেয়েদের মনকে নোঙরের মতো শক্ত করে আঁকড়ে ধরার জন্যে পুরুষের ভালো দেখতে হওয়ার দরকারই করে না। বুদ্ধি-বিদ্যেটাও গৌণ। আসল দরকার পৌরুষের ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্। সেটা তার স্নায়ুর পেশীর ভিতরকার বেতার-বার্তার মতো। প্রকাশ পেতে থাকে কামনার অকথিত স্পর্ধারূপে।

মনে পড়ল, নিজের প্রথম বয়সের রসোন্মত্ততার ইতিহাস। ও যাকে টেনেছিল কিম্বা যে টেনেছিল ওকে, তার না ছিল রূপ, না ছিল বিদ্যা, না ছিল বংশগৌরব। কিন্তু কী একটা অদৃশ্য তাপের বিকিরণ ছিল যার অলক্ষ্য সংস্পর্শে সমস্ত দেহ মন দিয়ে ও তাকে অত্যন্ত করে অনুভব করেছিল পুরুষমানুষ ব'লে। নীলার জীবনে কখন্ এক সময়ে সেই অনিবার্য আলোড়নের আরম্ভ হবে এই ভাবনা তাকে স্থির থাকতে দিত না। যৌবনের শেষ দশাই সকলের চেয়ে বিপদের দশা, সেই সময়টাতে সোহিনীকে অনেকখানি ভুলিয়ে রেখেছিল নিরবকাশ জ্ঞানের চর্চায়। কিন্তু দৈবাৎ সোহিনীর মনের জমি ছিল স্বভাবত উর্বরা। কিন্তু যে জ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক, সব মেয়ের তার প্রতি টান থাকে না। নীলার মনে আলো পৌঁছয় না।

নদীর ঘাট থেকে আস্তে আস্তে দেখা দিল নীলা। রোদ্দুর পড়েছে তার কপালে, তার চুলে। বেনারসি শাড়ির উপরে জরির রশ্মি ঝল্‌মল্‌ করে উঠছে। রেবতীর দৃষ্টি এক মুহূর্তের মধ্যে ওকে ব্যাপ্ত করে দেখে নিলে। চোখ নামিয়ে নিল পরক্ষণেই। ছেলেবেলা থেকে তার এই শিক্ষা। যে সুন্দরী মেয়ে মহামায়ার মনোহারিণী লীলা, তাকে আড়াল করে রেখেছে পিসির তর্জনী। তাই যখন সুযোগ ঘটে তখন দৃষ্টির অমৃত ওকে তাড়াতাড়ি এক চুমুকে গিলতে হয়।

মনে মনে রেবতীকে ধিক্কার দিয়ে সোহিনী বললে, "দেখো দেখো, একবার চেয়ে দেখো।"

রেবতী চমকে উঠে চোখ তুলে চাইলে।

সোহিনী বললে, "দেখো তো ডক্টর অব সায়ান্স্‌, ওর শাড়ির রঙের সঙ্গে পাতার রঙের কী চমৎকার মিল হয়েছে!"

রেবতী সসংকোচে বললে, "চমৎকার!"

সোহিনী মনে মনে বললে, 'নাঃ, আর পারা গেল না।' আবার বললে, "ভিতরে বসন্তী রঙ উঁকি মারছে, উপরে সবজে নীল।—কোন্‌ ফুলের সঙ্গে মেলে বলো দেখি।"

উৎসাহ পেয়ে রেবতী ভালো করেই দেখলে। বললে, "একটা ফুল মনে পড়ছে, কিন্তু উপরের আবরণটা ঠিক নীল নয়, ব্রাউন।"

"কোন্‌ ফুল বলো তো।"

রেবতী বললে, "মেলিনা।"

"ও, বুঝেছি। তার পাঁচটি পাপড়ি, একটি উজ্জ্বল হলদে, বাকি চারটে শ্যাম-বর্ণ।"

রেবতী আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে, "এত করে ফুলের পরিচয় জানলেন কী করে?"

সোহিনী হেসে বললে, "জানা উচিত হয় নি বাবা! পুজোর সাজির বাইরের ফুল আমাদের কাছে পরপুরুষ বললেই হয়।"

ডালি হাতে এল ধীরে ধীরে নীলা। মা বললে, "জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? পা ছুঁয়ে প্রণাম কর্‌।"

"থাক্‌ থাক্‌" ব'লে রেবতী অস্থির হয়ে উঠল। রেবতী আসন করে বসেছিল, পা খুঁজে বের করতে নীলাকে একটু হাতড়াতে হল। শিউরে উঠল রেবতীর সমস্ত শরীর। ডালিতে ছিল দুর্লভ-জাতীয় অর্কিডের মঞ্জরি, রুপোর থালায় ছিল বাদামের তক্তি, পেস্তার বরফি, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, মালাইয়ের বরফি, চৌকো করে কাটা কাটা ভাপা দই।

বললে, "এ সমস্তই তৈরি নীলার নিজের হাতে।"

সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। এ-সব কাজে নীলার না ছিল হাত, না ছিল মন।

সোহিনী বললে, "একটু মুখে দিতে হয় বাবা, ঘরে তৈরি তোমারই উদ্দেশে।"

ফরমাশে তৈরি বড়োবাজারের এক চেনা দোকানে।

রেবতী হাত জোড় করে বললে, "এ সময়ে খাওয়া আমার অভ্যাস নয়। বরং অনুমতি করেন যদি, বাসায় নিয়ে যাই।"

সোহিনী বললে, "সেই ভালো। অনুরোধ করে খাওয়ানো আমার স্বামীর আইনে বারণ। তিনি বলতেন, মানুষ তো অজগরের জাত নয়।"

একটা বড়ো টিফিন-ক্যারিয়রে থাকে থাকে সোহিনী খাবার সাজিয়ে দিলে। নীলাকে বললে, "দে তো মা, সাজিতে ফুলগুলি ভালো করে সাজিয়ে। এক জাতের সঙ্গে আর-এক জাত মিশিয়ে দিস নে যেন। আর তোর খোঁপা ঘিরে ঐ যে সিল্কের রুমাল জড়িয়েছিস, ওটা পেতে দিস ফুলগুলির উপরে।"

বিজ্ঞানীর চোখে আর্টপিপাসুর দৃষ্টি উঠল উৎসুক হয়ে। এ যে প্রাকৃত জগতের মাপ-ওজনের বাইরেকার জিনিস। নানা রঙের ফুলগুলির মধ্যে নীলার সুঠাম আঙুল সাজাবার লয় রেখে নানা ভঙ্গিতে চলছিল—রেবতীর চোখ ফেরানো দায় হল। মাঝে মাঝে নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে নিচ্ছিল। এক দিকে সেই মুখের সীমানা দিয়েছে চুনি-মুক্তো-পান্নার-মিশোল-করা একহারা হার-জড়ানো চুলের ইন্দ্রধনু, আর-এক দিকে বসন্তীরঙা কাঁচুলির উচ্ছ্রিত রাঙা পাড়টি। সোহিনী মিষ্টান্ন সাজাচ্ছিল, কিন্তু ওর একটা তৃতীয় নেত্র আছে যেন। সামনে যে একটা জাদু চলছিল সে ওর লক্ষ্য এড়ায় নি।

নিজের স্বামীর অভিজ্ঞতা অনুসারে সোহিনীর ধারণা ছিল বিদ্যাসাধনার বেড়া-দেওয়া খেত যে-সে গোরুর চরবার খেত নয়। আজ আভাস পেল বেড়া সকলের পক্ষে সমান ঘন নয়। সেটা ভালো লাগল না।

৬

পরের দিন সোহিনী অধ্যাপককে ডেকে পাঠালে। বললে, "নিজের গরজে আপনাকে ডেকে এনে মিছিমিছি কষ্ট দিই। হয়তো কাজের ক্ষতিও করি।"

"দোহাই তোমার, আরও-একটু ঘন ঘন ডেকো। দরকার থাকে তো ভালো, না থাকে তো আরও ভালো।"

"আপনি জানেন, দামী যন্ত্র -সংগ্রহের নেশায় আমার স্বামীর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকত না। মনিবদের ফাঁকি দিতেন এই নিষ্কাম লোভে। সমস্ত এসিয়ার মধ্যে এমন ল্যাবরেটরি কোথাও পাওয়া যাবে না, এই জেদ তাঁর মতো আমাকেও পেয়ে বসেছিল। এই জেদেই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, নইলে আমার মোদো রক্ত গাঁজিয়ে উঠে উপচিয়ে পড়ত চার দিকে। দেখুন চৌধুরীমশায়, নিজের স্বভাবের মধ্যে মন্দটা যা লেপটিয়ে থাকে সেটা যাঁর কাছে অসংকোচে বলতে পারি আপনি আমার সেই বন্ধু। নিজের কলঙ্কের দিকটা দেখাবার খোলসা দরজা পেলে মন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।"

চৌধুরী বললেন, "যারা সম্পূর্ণটা দেখতে পায় তাদের কাছে সত্যকে চাপা দেবার দরকার করে না। আধা সত্যই লজ্জার জিনিস। পুরোপুরি দেখার ধাত আমাদের, আমরা বিজ্ঞানী।"

তিনি বলতেন, মানুষ প্রাণপণে প্রাণ বাঁচাতে চায় কিন্তু প্রাণ তো বাঁচে না। সেই জন্যে বঁচবার শখ মেটাবার জন্যে এমন কিছুকে সে খুঁজে বেড়ায় যা প্রাণের চেয়ে অনেক বেশি। সেই দুর্লভ জিনিসকে তিনি পেয়েছেন তাঁর এই ল্যাবরেটরিতে। একে যদি আমি বাঁচিয়ে রাখতে না পারি তা হলেই তাঁকে চরম করে মারব স্বামী-

ঘাতিনী হয়ে। আমি এর রক্ষক চাই, তাই খুঁজেছিলুম রেবতীকে।"

"চেষ্টা করে দেখলে?"

"দেখেছি, হাতে হাতে ফল পাবার আশা আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিঁকবে না।"

"কেন।"

"ওঁর পিসিমা যেমনি শুনবেন রেবতীকে টেনেছি কাছে, অমনি তাঁকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবার জন্যে ছুটে আসবেন। ভাববেন, আমার মেয়ের সঙ্গে ওঁর বিয়ে দেবার ফাঁদ পেতেছি।"

"দোষ কী, হলে তো ভালোই হত। কিন্তু তুমি যে বলেছিলে, বেজাতে মেয়ের বিয়ে দেবে না।"

"তখনও আপনার মন জানতুম না, তাই মিথ্যে কথা বলেছিলুম। খুবই চেয়েছিলুম। কিন্তু ছেড়েছি সেই মতলব।"

"কেন।"

"বুঝতে পেরেছি, ও ভাঙন-ধরানো মেয়ে। ওর হাতে যা পড়বে তা আস্ত থাকবে না।"

"কিন্তু ও তো তোমারই মেয়ে।"

"আমারই মেয়ে তো বটে, তাই তো ওকে আঁতের ভিতর থেকেই চিনি।"

অধ্যাপক বললেন, "কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে কেন, যে, মেয়েরা পুরুষের ইন্‌স্পিরেশন জাগাতে পারে।"

"আমার সবই জানা আছে। পুরুষের খোরাকে আমিষ পর্যন্ত ভালোই চলে, কিন্তু মদ ধরালেই সর্বনাশ। আমার মেয়েটি মদের পাত্র, কানায় কানায় ভরা।"

"তা হলে কী করতে চাও বলো।"

"আমার ল্যাবরেটরি দান করতে চাই· পাব্লিককে।"

"তোমার একমাত্র মেয়েকে এড়িয়ে দিয়ে?"

"মেয়েকে? ওকে দান করলে সে দান পৌঁছবে কোন্‌ রসাতলে কী করে জানব? আমার ট্রাস্ট্‌ সম্পত্তির প্রেসিডেন্ট্‌ করে দেব রেবতীকে। তাতে তো পিসির আপত্তি হতে পারবে না?"

"মেয়েদের আপত্তির যুক্তি যদি ধরতেই পারব তা হলে পুরুষ হয়ে জন্মাতে গেলুম কেন? কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি নে, ওকে যদি জামাই না করবে তা হলে প্রেসিডেন্ট্‌ করতে চাও কেন।"

"শুধু যন্ত্রগুলো নিয়ে কী হবে? মানুষ চাই ওদের প্রাণ দিতে। আর-একটা কথা এই—আমার স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে একটাও নতুন যন্ত্র আনা হয় নি। টাকার অভাবে নয়। কিনতে হলে একটা লক্ষ্য ধরে কিনতে হয়। খবর জেনেছি, রেবতী ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌ নিয়ে কাজ করছেন। সেই পথে সংগ্রহ এগিয়ে চলুক, যত দাম লাগে লাগুক-না।"

"কী আর বলব, পুরুষমানুষ যদি হতে তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে নেচে বেড়াতুম। তোমার স্বামী রেল-কোম্পানির টাকা চুরি করেছিলেন, তুমি চুরি করে নিয়েছ তাঁর পুরুষের মনখানা। এমন অদ্ভুত কলমের-জোড়-লাগানো বুদ্ধি আমি কখনও দেখি নি। আমারও পরামর্শ নেওয়া তুমি ,যে দরকার বোধ কর, এই

আশ্চর্য।"

"তার কারণ আপনি যে খুব খাঁটি, ঠিক কথা বলতে জানেন।"

"হাসালে তুমি। তোমাকে বেঠিক কথা বলে ধরা পড়ব এত বড়ো নিরেট বোকা আমি নই। তা হলে লাগা যাক এবার— জিনিসপত্র ফর্দ করা, দর যাচাই করা, ভালো উকিল ডেকে তোমার স্বত্ব বিচার করা, আইনকানুন বেঁধে দেওয়া ইত্যাদি অনেক হাঙ্গামা আছে।"

"এ-সব দায় কিন্তু আপনারই।"

"সেটা হবে নামমাত্র। বেশ ভালো করেই জান, যা তুমি বলাবে তাই বলব, যা করাবে তাই করব। আমার লাভটা এই যে, দু বেলা দেখা হবে তোমার সঙ্গে। তোমাকে যে কী চক্ষে দেখেছি তুমি তো জান না।"

সোহিনী চৌকি থেকে উঠে এসে ধাঁ করে এক হাতে চৌধুরীর গলা জড়িয়ে ধরে গালে চুমো খেয়ে চট্ করে সরে গেল, ভালোমানুষের মতো বসল গিয়ে চৌকিতে।

"ঐ রে, সর্বনাশের শুরু হল দেখছি।"

"সে ভয় যদি একটুও থাকত তা হলে কাছেও এগতুম না। এ বরাদ্দ আপনার জুটবে মাঝে মাঝে।"

"ঠিক বলছ?"

"ঠিকই বলছি। আমার এতে খরচ নেই, আপনারও যে বেশি কিছু পাওনা আছে, মুখের ভাব দেখে তা বোধ হচ্ছে না।"

"অর্থাৎ বলতে চাও, এ হচ্ছে মরা কাঠে কাঠঠোকরার ঠোকর দেওয়া।— চললুম উকিলবাড়িতে।"

"কাল একবার আসবেন এ পাড়াতে।"

"কেন, কী করতে?"

"রেবতীর মনে দম দিতে।"

"আর নিজের মনটা খুইয়ে বসতে।"

"মন কি আপনার একলারই আছে?"

"তোমার মনের কিছু বাকি আছে নাকি?"

"উচ্ছিষ্ট অনেক পড়ে আছে।"

"তাতে এখনও অনেক বাঁদর নাচানো চলবে।"

৭

তার পরদিনে রেবতী ল্যাবরেটরিতে নির্দিষ্ট সময়ের অন্তত বিশ মিনিট আগে এসেই উপস্থিত। সোহিনী প্রস্তুত ছিল না, আটপৌরে কাপড়েই তাড়াতাড়ি চলে এল ঘরে। রেবতী বুঝতে পারলে গলদ হয়েছে। বললে, "আমার ঘড়িটা ঠিক চলছে না দেখছি।"

সোহিনী সংক্ষেপে বললে, "নিশ্চয়।"

এক সময়ে একটু কী শব্দ শুনে রেবতী মনে মনে চমকে উঠে দরজার দিকে

তাকালে। সুখন বেহারাটা গ্লাসকেসের চাবি নিয়ে এল ঘরে।

সোহিনী জিগ্‌গেসা করলে, "এক পেয়ালা চা আনিয়ে দেব কি।"

রেবতী ভাবলে বলা উচিত, হাঁ। বললে, "দোষ কী।"

ও বেচারার চা অভ্যাস নেই, সর্দির আভাস দিলে বেলপাতাসিদ্ধ গরম জল খেয়ে থাকে। মনে মনে বিশ্বাস ছিল স্বয়ং নীলা আসবে পেয়ালা হাতে।

সোহিনী জিগ্‌গেসা করলে, "তুমি কি কড়া চা খাও।"

ও ফস্‌ করে বলে বসল, "হাঁ।"

ভাবলে এ ক্ষেত্রে হাঁ বলাটাই পাকা দস্তুর। এল চা, সেটা কড়া সন্দেহ নেই। কালীর মতো রঙ, নিমের মতো তিতো। চা আনলে মুসলমান খানসামা। এটাও ওকে পরীক্ষা করবার জন্যে। আপত্তি করতে ওর মুখে কথা সরল না। এই সংকোচ ভালো লাগল না সোহিনীর। খানসামাকে বললে, "চা'টা ঢেলে দাও-না মোবারক, ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।"

খানসামার হাতের পরিবেশন-প্রত্যাশায় রেবতী বিশ মিনিট আগে এখানে আসে নি।

কী দুঃখে যে মুখে চামচ উঠছিল অন্তর্যামীই জানছিলেন, আর জানছিল সোহিনী। হাজার হোক মেয়েমানুষ, দুর্গতি দেখে বললে, "ও পেয়ালাটা থাক্‌। দুধ ঢেলে দিচ্ছি, তার সঙ্গে কিছু ফল খেয়ে নাও। সকাল সকাল এসেছ, বোধ হয় কিছু খেয়ে আসা হয় নি।"

কথাটা সত্য। রেবতী ভেবেছিল আজও সেই বোটানিকালের পুনরাবৃত্তি হবে। কাছ দিয়েও গেল না, মুখে রয়ে গেল কড়া চায়ের তিতো স্বাদ আর মনে রয়েছে আশাভঙ্গের তিতো অভিজ্ঞতা।

এমন সময় প্রবেশ করলেন অধ্যাপক; ঘরে ঢুকেই রেবতীর পিঠ চাপড়িয়ে বললেন, "কী রে, হল কী, সব যে একেবারে ঠাণ্ডা হিম! খুকুর মতো বসে বসে দুধ খাচ্ছিস ঢকে ঢক। চার দিকে যা দেখছিস একি খোকাবাবুর খেলনার দোকান। যাদের চোখ আছে তারা দেখেছে, মহাকালের চেলারা এইখানে আসে তাণ্ডবনৃত্য করতে।"

"আহা, কেন বকছেন! না খেয়েই ও বেরিয়েছিল আজ সকালে। এল যখন, দেখলুম মুখ যেন শুকনো।"

"ঐ রে, পিসিমা দি সেকেণ্ড! এক পিসিমা দেবে এক গালে চাপড়, আর-এক পিসিমা দেবে অন্য গালে চুমো। মাঝখানে পড়ে ছেলেটা যাবে ভিজে কাদা হয়ে। আসল কথা কী জান, লক্ষ্মী যখন আপনি সেধে আসেন চোখে পড়েন না; যারা সাত মুল্লুক ঘুরে তাঁকে খুঁজে বের করে, ধরা দেন তিনি তাদেরই কাছে। না-চেয়ে পাওয়ার মতো না-পাওয়ার আর রাস্তা নেই। আচ্ছা, বলো দেখি মিসেস—দূর হোক গে ছাই মিসেস, আমি ডাকবই তোমাকে সোহিনী বলে, এতে তুমি রাগই কর আর যাই কর।"

"মরণ আমার, রাগ করতে যাব কেন! ডাকুন আমাকে সোহিনী বলে, সুহি বললে আমার কান জুড়িয়ে যাবে।"

"গোপন কথাটা প্রকাশ করেই বলি। তোমার ঐ সোহিনী নামটির সঙ্গে আর-

একটি শব্দের মিল আছে, বড়ো খাঁটি তার অর্থ। সকালে ঘুম থেকে উঠেই হিনি হিনি কিনি কিনি রবে ঐ দুটি শব্দ মিলিয়ে মনে মনে খঞ্জনি বাজাতে থাকি।"

"কেমিস্ট্রির রিসর্চে মিল করা আপনার অভ্যাস আছে, ওটা তারই একটা ফেঁকড়া।"

"মিল করতে গিয়ে মরেও অনেক লোক। বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে নেই—ঘোরতর দাহ্য পদার্থ।"

এই বলে হাঃ হাঃ শব্দে উচ্চহাস্য করে উঠলেন।

"নাঃ, ঐ ছোকরাটার সামনে এ-সব কথার আলোচনা করতে নেই। বাবুদের কারখানায় আজ পর্যন্ত ও অ্যাপ্রেণ্টিস শুরু করে নি। পিসিমার আঁচল ওকে আগলে আছে, সে আঁচল নন্‌কম্‌বাস্‌টিব্‌ল্‌।"

রেবতীর মেয়েলী মুখ লাল হয়ে উঠছিল।

"সোহিনী, আমি তোমাকে জিগ্‌গেসা করতে যাচ্ছিলুম, আজ সকালে তুমি কি ওকে আফিম খাইয়ে দিয়েছিলে। অমন ঝিমিয়ে পড়ছে কেন।"

"খাইয়ে যদি থাকি সেটা না জেনে।"

"রেবু, ওঠ্‌ বলছি ওঠ্‌। মেয়েদের কাছে অমন মুখচোরা হয়ে থাকতে নেই। ওতে ওদের আস্পর্ধা বেড়ে যায়। ওরা তো ব্যামোর মতো পুরুষের দুর্বলতা খুঁজে বেড়ায়, ছিদ্র পেলেই টেম্পরেচর চড়িয়ে দেয় হু হু ক'রে। সাবজেক্ট্‌টা জানা আছে, ছেলেগুলোকে সাবধান করতে হয়। আমার মতো যারা ঘা খেয়েছে, মরে নি, তাদের কাছ থেকেই পাঠ নিতে হয়। রেবু, কিছু মনে করিস নে বাবা! যারা কথা কয় না, চুপ করে থাকে, তারাই সব চেয়ে ভয়ংকর। চল্‌ দেখি, তোকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। ঐ দেখ্‌ দুটো গ্যাল্‌ভানোমিটর, একেবারে হাল কায়দার। এই দেখ্‌ হাই ভ্যাকুয়ম পম্প্‌, আর এটা মাইক্রোফোটোমিটর, এ ছেলে-পাস-করাবার কলার ভেলা নয়। একবার এখানে আসন গেড়ে বোস্‌ দেখি। সেই তোমার টাক-পড়া মাথার প্রোফেসর—নাম করতে চাই নে—দেখি কেমন তার মুখ চুন হয়ে না যায়। আমার ছাত্র হয়ে যখন তুই বিদ্যে শুরু করলি আমি তোকে বলি নি কি তোর নাকের সামনে ঝুলছে যাকে কথায় বলে 'ভবিষ্যৎ'? হেলাফেলা করে সেটাকে ফোঁপরা করে দিস নে যেন। তোর জীবনীর প্রথম চ্যাপ্‌টারের এক কোণে আমার নামটাও ছোটো অক্ষরে লেখা যদি থাকে, সেটা হবে আমার মস্ত গুরুদক্ষিণা।"

দেখতে দেখতে বিজ্ঞানী জেগে উঠল। জ্বলে উঠল তার দুই চোখ। চেহারাটা একেবারে ভিতর থেকে গেল বদলে। মুগ্ধ হয়ে সোহিনী বললে, "তোমাকে যে-কেউ জানে, তারা সকলেই তোমার এত বড়ো উন্নতির আশা করে যা প্রতিদিনের জিনিস নয়, যা চিরদিনের। কিন্তু আশা যতই বড়ো, ততই বড়ো তার বাধা ভিতরে বাইরে।"

অধ্যাপক রেবতীর পিঠে আর-একবার দিলে একটা মস্ত চাপড়। ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল তার শিরদাঁড়া। চৌধুরী তাঁর মস্ত ভারী গলায় বললেন, "দেখ্‌ রেবু, যে মহৎ ভবিষ্যতের বাহন হওয়া উচিত ছিল ঐরাবত, কৃপণ বর্তমান চাপিয়ে দেয় তাকে গোরুর গাড়িতে, কাদায় পড়ে থাকে সে অচল হয়ে। শুনছ সোহিনী, সুহি?—না না ভয় নেই, পিঠে চাপড় মারব না। বলো সত্যি করে, কথাটা আমি কেমন গুছিয়ে বলেছি।"

"চমৎকার।"

"ওটা লিখে রেখো তোমার ডায়ারিতে।"

"তা রাখব।"

"কথাটার মানেটা বুঝেছিস তো রেবি?"

"বোধ হয় বুঝেছি।"

"মনে রাখিস মস্ত প্রতিভার মস্ত দায়িত্ব। ও তো কারও নিজের জিনিস নয়। ওর জবাবদিহি অনন্তকালের কাছে। শুনছ সুহি, শুনছ? কথাটা কেমন বলেছি বলো তো ভাই!"

"খুব ভালো বলেছেন। আগেকার দিনের রাজা থাকলে গলা থেকে মালা খুলে—"

"তারা তো মরেছে সব, কিন্তু—"

"ঐ কিন্তুটুকু মরে নি, মনে থাকবে।"

রেবতী বললে, "ভয় নেই, কিছুতে আমাকে দুর্বল করবে না।"

সোহিনীকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেল। সোহিনী তাড়াতাড়ি আটকিয়ে দিলে।

চৌধুরী বললেন, "আরে, করলে কী! পুণ্যকর্ম না করার দোষ আছে, পুণ্যকর্মে বাধা দেওয়ার দোষ আরও বেশি।"

সোহিনী বললে, "প্রণাম যদি করতে হয় তো ঐখানে।"—

ব'লে বেদির উপরে বসানো নন্দকিশোরের একটি মূর্তি দেখিয়ে দিলে। ধূপ-ধুনো জ্বলছে, ফুলে ভরে আছে থালা।

বললে, "পাতকীকে উদ্ধার করার কথা পুরাণে পড়েছি। আমাকে উদ্ধার করেছেন ঐ মহাপুরুষ। অনেক নীচে নামতে হয়েছিল, শেষকালে তুলে বসাতে পেরেছেন— পাশে বললে মিথ্যে হবে, তাঁর পায়ের তলায়। বিদ্যার পথে মানুষকে উদ্ধার করবার দীক্ষা তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন। বলে গিয়েছেন যেন মেয়ে-জামাইয়ের গুমর বাড়াবার জন্যে তাঁর জীবনের খনিখোঁড়া রত্ন ছাইয়ের গাদায় হারিয়ে না ফেলি। বললেন, 'ঐখানে রেখে গেলেম আমার সম্পত্তি আর সম্পত্তি আমার দেশের।'"

অধ্যাপক বললেন, "শুনলি তো রেবু? এটা হবে ট্রাস্ট্ সম্পত্তি, তোকে দেওয়া হবে তার কর্তৃত্ব।"

রেবতী ব্যস্ত হয়ে বললে, "কর্তৃত্ব নেবার যোগ্য আমি নই। আমি পারব না।"

সোহিনী বললে, "পারবে না! ছি, এ কি পুরুষের মতো কথা।"

রেবতী বললে, "আমি চিরদিন পড়াশুনো করে এসেছি, এরকম কাজের ভার কখনও নিই নি।"

চৌধুরী বললেন, "ডিম ফোটবার আগে কখনও হাঁস সাঁতার দেয় নি। আজ তোমার ডিমের খোলা ভাঙবে।"

সোহিনী বললে, "ভয় নেই তোমার, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।"

রেবতী আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল।

সোহিনী অধ্যাপকের মুখের দিকে চেয়ে রইল। চৌধুরী বললেন, "জগতে বোকা অনেক রকম আছে, পুরুষ-বোকা সকল বোকার সেরা। কিন্তু মনে রেখো, দায়িত্ব হাতে না পেলে দায়িত্বের যোগ্যতা জন্মায় না। একজোড়া হাত পেয়েছে মানুষ তাই সে হয়েছে মানুষ, একজোড়া খুর পেলেই তার সঙ্গে সঙ্গে মলবার যোগ্য লেজ আপনি গজিয়ে উঠত। তুমি কি রেবতীর হাতের বদলে খুর দেখতে পেয়েছ নাকি।"

"না, আমার ভালো লাগছে না। মেয়ের হাতেই যারা মানুষ কোনো কালে তাদের দুধে-দাঁত ভাঙে না। কপাল আমার! আপনি থাকতে আমি আর-কারও কথা কেন ভাবতে গেলুম।"

"খুশি হলুম শুনে। একটুখানি বুঝিয়ে দাও কী গুণ আছে আমার।"

"লোভ নেই আপনার একটুও।"

"এত বড়ো নিন্দের কথা! লোভের মতো জিনিসকে লোভ করি নে?—খুবই করি—"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তাঁর গালে দুটো চুমো দিয়ে সোহিনী সরে গেল।

"কোন্ খাতায় জমা হল এটা সোহিনী।"

"আপনার কাছে যে ঋণ পেয়েছি সে তো শোধ করতে পারি নে, তারই সুদ দিচ্ছি।"

"প্রথম দিন পেয়েছি একটি, আজ পেলুম দুটি। কেবলই বেড়ে চলবে নাকি।"

"বাড়বে বই-কি, চক্রবৃদ্ধির নিয়মে।"

৮

চৌধুরী বললেন, "সোহিনী, তোমার স্বামীর শ্রাদ্ধে শেষকালে আমাকে পুরুত বানিয়ে দিলে? সর্বনাশ, এ কি কম দায়িত্ব! যার অস্তিত্ব হাতড়িয়ে পাওয়া যায় না তাকে খুশি করা! এ তো বাঁধাদস্তুরের দান-দক্ষিনে নয় যে—"

"আপনিও তো বাঁধাদস্তুরের গুরুঠাকুর নন. আপনি যা করবেন সেটাই হবে পদ্ধতি। দানের ব্যবস্থা তৈরি করে রেখেছেন তো?"

"কদিন ধরে ঐ কাজই করেছি, দোকানবাজার কম ঘুরি নি। দানসামগ্রী সাজানো হয়ে গেছে নীচের বড়ো ঘরটাতে। ইহলোকস্থিত আত্মা যারা এগুলো আত্মসাৎ করবে তারা পেট ভরে খুশি হবে, সন্দেহ নেই।"

চৌধুরীর সঙ্গে নীচে গিয়ে সোহিনী দেখলে, সায়ান্স্-পড়ুয়া ছেলেদের জন্যে নানা যন্ত্র, নানা মডেল, নানা দামী বই, নানা মাইক্রোস্কোপের স্লাইড্স্, নানা বায়োলজির নমুনা। প্রত্যেক সামগ্রীর সঙ্গে নাম ও ঠিকানা-লেখা কার্ড। আড়াইশো ছেলের জন্যে চেক লেখা হয়েছে এক বৎসরের বৃত্তির। খরচের জন্যে কিছুমাত্র সংকোচ করা হয় নি। বড়ো বড়ো ধনীদের শ্রাদ্ধে যে ব্রাহ্মণবিদায় হয় তার চেয়ে এর ব্যয়ের প্রসর অনেক বেশি, অথচ বিশেষ করে চোখে পড়ে না এর সমারোহ।

"পুরুতবিদায়ের কী দক্ষিণা দিতে হবে সেটা তো আপনি ধরে দেন নি।"

"আমার দক্ষিণা তোমার খুশি।"

"খুশির সঙ্গে সঙ্গে আপনার জন্যে রেখেছি এই ক্রনোমিটার। জর্মনি থেকে স্বামী এটা কিনেছিলেন, বরাবর তাঁর রিসর্চের কাজে লেগেছিল।"

চৌধুরী বললেন, "যা মনে আসছে তার ভাষা নেই। বাজে কথা বলতে চাই নে, আমার পুরুতের কাজ সার্থক হল।"

"আর-একটি লোক আছে, আজ তাকে ভুলতে পারি নে— সে আমাদের মানিকের বিধবা বউ।"

"মানিক বলতে কাকে বোঝায়।"

"সে ছিল ওঁর ল্যাবরেটরির হেড-মিস্ত্রি। আশ্চর্য তার হাত ছিল। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজে এক চুল তার নড়চড় হত না, কলকব্জার তত্ত্ব বুঝে নিতে তার বুদ্ধি ছিল অভ্রান্ত। তাকে উনি অতিনিকট বন্ধুর মতো দেখতেন। গাড়ি করে নিয়ে যেতেন বড়ো বড়ো কারখানার কাজ দেখাতে। এ দিকে সে ছিল মাতাল, ওঁর অ্যাসিস্টেন্টরা তাকে ছোটোলোক বলে অবজ্ঞা করত। উনি বলতেন, ও যে গুণী, তার সে গুণ বানিয়ে তোলা যায় না, সে গুণ খুঁজে মিলবে না। ওঁর কাছে তার সম্মান পুরোমাত্রায় ছিল। এর থেকে বুঝবেন কেন যে উনি আমাকে শেষ পর্যন্ত এত মান দিয়েছিলেন। আমার মধ্যে যে মূল্য তিনি দেখেছিলেন তার তুলনায় দোষের ওজন ওঁর কাছে ছিল খুব সামান্য। যে জায়গায় আমার মতো কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়েকে তিনি অসম্ভব রকম বিশ্বাস করেছিলেন, সে জায়গায় সে বিশ্বাস আমি কোনোদিন একটুমাত্র নষ্ট করি নি। আজও মনপ্রাণ দিয়ে রক্ষা করছি। এতটা তিনি আর-কারও কাছে পেতেন না। যেখানে আমি ছিলেম ছোটো সেখানে আমি তাঁর চোখে পড়ি নি, যেখানে আমি ছিলুম বড়ো সেখানে তিনি আমাকে পুরো সম্মান দিয়েছেন। আমার মূল্য যদি তাঁর চোখে না পড়ত তা হলে আমি কোথায় তলিয়ে যেতুম বলুন তো। আমি খুব খারাপ, কিন্তু আমি নিজেই বলছি আমি খুব ভালো, নইলে তিনি আমাকে কখনও সহ্য করতে পারতেন না।"

"দেখো সোহিনী, আমি অহংকার করে বলব যে আমি প্রথম থেকেই জেনেছি তুমি খুব ভালো। সস্তা দরের ভালো হলে কলঙ্ক লাগলে দাগ উঠত না।"

"যাক গে, আমাকে আর যে লোক যা মনে করুক-না, তিনি আমাকে যা মান দিয়েছেন সে আজ পর্যন্ত টিঁকে আছে, আমার শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে।"

"দেখো সোহিনী, তোমাকে যত দেখছি ততই জানছি তুমি সে জাতের সহজ মেয়েমানুষ নও যারা স্বামী নামটা শুনলেই গ'লে পড়ে।"

"না, তা নই ; আমি দেখেছি ওঁর মধ্যে শক্তি, প্রথম দিন থেকে জেনেছি উনি মানুষ, আমি শাস্ত্র মিলিয়ে পতিব্রতাগিরি করতে বসি নি। আমি জাঁক করেই বলছি, আমার মধ্যে যে রত্ন আছে সে একা ওঁরই কণ্ঠহারে দোলবার মতো, আর কারও নয়।"

এমন সময় নীলা ঘরে এসে ঢুকে পড়ল। বললে, "অধ্যাপকমশায়, কিছু মনে করবেন না, মায়ের সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

"কিছু না মা, আমি এখন যাচ্ছি ল্যাবরেটরিতে। রেবতী কী রকম কাজ করছে দেখে আসি গে।"

নীলা বললে, "কোনো ভয় নেই। কাজ ভালোই চলছে। আমি এক-একদিন

জানলার বাইরে থেকে দেখেছি উনি মাথা গুঁজে লিখছেন, নোট নিচ্ছেন, কলম কামড়ে ধরে ভাবছেন। আমার প্রবেশনিষেধ, পাছে সার আইজাকরে গ্রাভিটেশন যায় নড়ে। সেদিন মা কাকে বলছিলেন উনি ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌ নিয়ে কাজ করছেন, তাই পাশ দিয়ে কেউ গেলেই কাঁটা নড়ে যায়, বিশেষত মেয়েরা।"

চৌধুরী হো হো করে হেসে উঠলেন ; বললেন, "মা, ল্যাবরেটরির ভিতরেই আছে, ম্যাগনেটিজ্‌ম্‌ নিয়ে কাজ চলছেই, কাঁটা যাঁরা নাড়িয়ে দেন তাঁদের ভয় করতেই হয়। দিগ্‌ভ্রম ঘটায় যে। তবে চললুম।"

নীলা মাকে বললে, "আমাকে আর কতদিন তোমার আঁচলের গাঁঠ দিয়ে বেঁধে রাখবে। পেরে উঠবে না, কেবল দুঃখ পাবে।"

"তুই কী করতে চাস বল্‌।"

নীলা বললে, "তুমি তো জানই মেয়েদের জন্যে একটা হাইয়র স্টাডি মুভ্‌মেণ্ট্‌ খোলা হয়েছে, তুমি তাতে অনেক টাকা দিয়েছ। সেখানে আমাকে কেন কাজে লাগাও-না।"

"আমার ভয় আছে পাছে তুই ঠিকমত না চলিস।"

"সব চলাই বন্ধ করে দেওয়াই কি ঠিক চলার রাস্তা?"

"তা নয়, তা তো জানি, সেই তো আমার ভাবনা।"

"তুমি না ভেবে একবার আমাকে ভাবতে দাও-না। সে তো দিতেই হবে। আমি তো এখন খুকি নই। তুমি ভাবছ সেই-সব পাব্লিক জায়গায় নানা লোকের যাওয়া-আসা আছে, সে একটা বিপদ। জগৎসংসারে লোকচলাচল তো বন্ধ হবে না তোমার খাতিরে। আর তাদের সঙ্গে আমার জানাশুনো একেবারেই ঠেকিয়ে রাখবে যে, সে আইন তো তোমার হাতে নেই।"

"জানি সব জানি, ভয় করে ভয়ের কারণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। তা হলে তুই ওদের হাইয়র স্টাডি সার্কলে ভরতি হতে চাস?"

"হাঁ, চাই।"

"আচ্ছা, তাই হবে। সেখানকার পুরুষ অধ্যাপকদের একে একে দিবি জাহান্নমে সে জানি। কেবল একটি কথা দিতে হবে আমাকে। কোনোমতেই তুই রেবতীর কাছে ঘেঁষতে পাবি নে। আর, কোনো ছুতোতেই ঢুকবি নে তার ল্যাবরেটরিতে।"

"মা, তুমি আমাকে কী মনে কর ভেবে পাই নে। কাছে ঘেঁষতে যাব তোমার ঐ খুদে সার আইজাক নিউটনের, এমন রুচি আমার?—মরে গেলেও না।"

সংকোচ বোধ করলে রেবতী শরীরটাকে নিয়ে যে রকম আঁকুবাঁকু করে তারই নকল করে নীলা বললে, "ঐ স্টাইলের পুরুষকে নিয়ে আমার চলবে না। যে-সব মেয়েরা ভালোবাসে বুড়ো খোকাদের মানুষ করতে, ওকে জিইয়ে রেখে দেওয়া ভালো তাদেরই জন্যে। ও মারবার যোগ্য শিকারই নয়।"

"একটু বেশি বাড়িয়ে কথা বলছিস নীলা, তাই ভয় হচ্ছে ওটা ঠিক তোর মনের কথা নয়। তা হোক, ওর সম্বন্ধে তোর মনের ভাব যাই হোক, ওকে যদি মাটি করতে চাস তা হলে সে তোর পক্ষে ভালো হবে না।"

"কখন তোমার কী মর্জি কিছুই বুঝতে পারি নে মা! ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্যে তুমি আমাকে সাজিয়ে পুতুল গড়ে তুলেছিলে, সে কি আমি বুঝতে পারি

নি? সেইজন্যেই কি তুমি আমাকে ওর বেশি কাছে আনাগোনা করতে বারণ করছ, পাছে চেনাশোনার ঘেঁষ লেগে পালিশ নষ্ট হয়ে যায়?"

"দেখ্ নীলা, আমি তোকে বলে দিচ্ছি তোর সঙ্গে ওর বিয়ে কিছুতেই হতে পারবে না।"

"তা হলে আমি যদি মোতিগড়ের রাজকুমারকে বিয়ে করি?"

"ইচ্ছা হয় তো করিস।"

"সুবিধে আছে, তার তিনটে বিয়ে, আমার দায় অনেকটা হালকা হবে, আর সে মদ খেয়ে ঢলাঢলি করে নাইটক্লাবে—তখন আমি অনেকটা ছুটি পাব।"

"আচ্ছা বেশ, সেই ভালো। রেবতীর সঙ্গে তোর বিয়ে হতে দেব না।"

"কেন, তোমার সার আইজাক নিউটনের বুদ্ধি আমি ঘুলিয়ে দেব মনে কর?"

"সে তর্ক থাক্, যা বললুম তা মনে রাখিস।"

"উনি নিজেই যদি হ্যাংলাপনা করেন?"

"তা হলে এ পাড়া তাকে ছাড়তে হবে—তোর অন্নে তাকে মানুষ করিস, তোর বাপের তহবিল থেকে এক কড়িও সে পাবে না।"

"সর্বনাশ! তা হলে নমস্কার সার আইজাক নিউটন!"

সেদিনকার পালা সংক্ষেপে এই পর্যন্ত।

৯

"চৌধুরীমশায়, আর সবই চলছে ভালো, কেবল আমার মেয়ের ভাবনায় সুস্থির হতে পারছি নে। ও যে কোন্ দিকে তাক করতে শুরু করেছে বুঝতে পারছি নে।"

চৌধুরী বললেন, "আবার ওর দিকে তাক করছে কারা সেটাও একটা ভাববার কথা। হয়েছে কি, এরই মধ্যে রটে গেছে ল্যাবরেটরি রক্ষার জন্যে তোমার স্বামী অগাধ টাকা রেখে গেছে। মুখে মুখে তার অঙ্কটা বেড়েই চলেছে। এখন রাজস্ব আর রাজকন্যা নিয়ে বাজারে একটা জুয়োখেলার সৃষ্টি হয়েছে।"

"রাজকন্যাটি মাটির দরে বিকোবে তা জানি, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে রাজস্ব সস্তায় বিকোবে না।"

"কিন্তু লোকের আমদানি শুরু হয়েছে। সেদিন হঠাৎ দেখি, আমাদেরই অধ্যাপক মজুমদার ওরই হাত ধরে বেরিয়ে এল সিনেমা থেকে। আমাকে দেখেই ঘাড় বেঁকিয়ে নিল। ছেলেটা ভালো ভালো বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়, দেশের মঙ্গলের দিকে ওর বুলি খুব সহজে খেলে। কিন্তু সেদিন ওর বাঁকা ঘাড় দেখে স্বদেশের জন্যে ভাবনা হল।"

"চৌধুরীমশায়, আগল ভেঙেছে।"

"ভেঙেছে বই-কি। এখন এই গরিবকেই নিজের ঘটিবাটি সামলাতে হবে।"

"মজুমদার-পাড়ায় মড়ক লাগে লাগুক, আমার ভয় রেবতীকে নিয়ে।"

চৌধুরী বললেন, "আপাতত ভয় নেই। খুব ডুবে আছে। কাজ করছে খুব চমৎকার।"

"চৌধুরীমশায়, ওর বিপদ হচ্ছে সায়ান্সে ও যত বড়ো ওস্তাদই হোক, তুমি যাকে মেট্রিয়ার্কি বল সে রাজ্যের ও ঘোর আনাড়ি।"

"সে কথা ঠিক। ওর একবারও টিকে দেওয়া হয় নি। ছোঁয়াচ লাগলে বাঁচানো শক্ত হবে।"

"রোজ একবার কিন্তু ওকে আপনার দেখে যেতে হবে।"

"কোথা থেকে ও আবার ছোঁয়াচ না নিয়ে আসে। শেষকালে এ বয়সে আমি না মরি। ভয় কোরো না, মেয়েমানুষ যদিও, তবুও আশা করি ঠাট্টা বুঝতে পার। আমি পার হয়ে গেছি এপিডেমিকের পাড়াটা। এখন ছোঁওয়া লাগলেও ছোঁয়াচ লাগে না। কিন্তু একটা মুশকিল ঘটেছে। পরশু আমাকে যেতে হবে গুজরানওয়ালায়।"

"এটাও ঠাট্টা নাকি? মেয়েমানুষকে দয়া করবেন।"

"ঠাট্টা নয়, আমার সতীর্থ অমূল্য আঢ্য ছিলেন সেখানকার ডাক্তার। বিশপঁচিশ বছর প্র্যাক্‌টিস করেছেন। কিছু বিষয়সম্পত্তিও জমিয়েছেন। হঠাৎ বিধবা স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে রেখে মরেছেন হার্ট্‌ফেল করে। দেনাপাওনা চুকিয়ে জমিজমা বেচে তাদের উদ্ধার করে আনতে হবে আমাকে। কতদিন লাগবে ঠিক জানি নে।"

"এর উপরে আর কথা নেই।"

"এ সংসারে কথা কিছুরই উপরে নেই সোহিনী! নির্ভয়ে বলো, যা হবেই তা হোক। যারা অদৃষ্ট মানে তারা ভুল করে না। আমরা সায়ান্টিস্ট্‌রাও বলি অনিবার্যের এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। যতক্ষণ কিছু করবার থাকে করো, যখন কোনোমতেই পারবে না, বোলো 'বাস্‌'।"

"আচ্ছা, তাই ভালো।"

"যে মজুমদারটির কথা বললুম, দলের মধ্যে সে তত বেশি মারাত্মক নয়। তাকে ওরা দলে টেনে রাখে মান বাঁচাবার জন্যে। আর-যাদের কথা শুনেছি, চাণক্যের মতে তাদের কাছ থেকে শত হস্ত দূরে থাকলেও ভাবনার কারণ থেকে যায়। অ্যাটর্নি আছে বঙ্কুবিহারী, তাকে আশ্রয় করা আর অক্টোপস্‌কে জড়িয়ে ধরা একই কথা। ধনী বিধবার তপ্ত রক্ত এই-সব লোক পছন্দ করে। খবরটা শুনে রাখো, যদি কিছু করবার থাকে কোরো। সবশেষে আমার ফিলজফিটা মনে রেখো।"

"দেখুন চৌধুরীমশায়, রেখে দিন ফিলজফি। মান্‌ব না আপনার অদৃষ্ট, মান্‌ব না আপনার কার্যকারণের অমোঘ বিধান, যদি আমার ল্যাবরেটরির 'পরে কারও হাত পড়ে। আমি পাঞ্জাবের মেয়ে, আমার হাতে ছুরি খেলে সহজে। আমি খুন করতে পারি তা সে আমার নিজের মেয়ে হোক, আমার জামাই-পদের উমেদার হোক।"

ওর শাড়ির নীচে ছিল কোমরবন্ধ লুকোনো। তার থেকে ধাঁ করে এক ছুরি বের করে আলোয় ঝলক খেলিয়ে দিয়ে গেল। বললে, "তিনি আমাকে বেছে নিয়েছিলেন— আমি বাঙালির মেয়ে নই, ভালোবাসা নিয়ে কেবল চোখের জল ফেলে কান্নাকাটি করি নে। ভালোবাসার জন্যে প্রাণ দিতে পারি, প্রাণ নিতে পারি। আমার ল্যাবরেটরি আর আমার বুকের কলিজা, তার মাঝখানে রয়েছে এই ছুরি।"

চৌধুরী বললেন, "এক সময়ে কবিতা লিখতে পারতুম, আজ আবার মনে হচ্ছে হয়তো পারি লিখতে।"

"কবিতা লিখতে হয় লিখবেন, কিন্তু আপনার ফিলজফি ফিরিয়ে নিন। যা না

মান্‌বার তাকে আমি শেষ পর্যন্ত মান্‌ব না। একলা দাঁড়িয়ে লড়ব। আর বুক ফুলিয়ে বলব, জিতবই। জিতবই, জিতবই।"

"ব্র্যাভো, আমি ফিরিয়ে নিলুম আমার ফিলজফিটা। এখন থেকে লাগাব ঢাকে চাঁটি তোমার জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে। আপাতত কিছুদিনের জন্যে বিদায় নিচ্ছি, ফিরতে দেরি হবে না।"

আশ্চর্যের কথা এই—সোহিনীর চোখে জল ভরে এল। বললে, "কিছু মনে করবেন না।" জড়িয়ে ধরলে চৌধুরীর গলা। বললে, "সংসারে কোনো বন্ধনই টেঁকে না, এও মুহূর্তকালের জন্যে।"

ব'লেই গলা ছেড়ে দিয়ে পায়ের কাছে প'ড়ে সোহিনী অধ্যাপককে প্রণাম করলে।

১০

খবরের কাগজে যাকে বলে 'পরিস্থিতি' সেটা হঠাৎ এসে পড়ে, আর আসে দল বেঁধে। জীবনের কাহিনী সুখে দুঃখে বিলম্বিত হয়ে চলে। শেষ অধ্যায়ে কোলিশন লাগে অকস্মাৎ ভেঙেচুরে স্তব্ধ হয়ে যায়। বিধাতা তাঁর গল্প গড়েন ধীরে ধীরে, গল্প ভাঙেন এক ঘায়ে।

সোহিনীর আইমা থাকেন আম্বালায়। সোহিনী তার কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছে 'যদি দেখা করতে চাও শীঘ্র এসো'।

এই আইমা তার একমাত্র আত্মীয় যে বেঁচে আছে। এরই হাত থেকে নন্দকিশোর কিনে নিয়েছিলেন সোহিনীকে।

নীলাকে তার মা বললে, "তুমিও আমার সঙ্গে এসো।"

নীলা বললে, "সে তো কিছুতেই হতে পারে না।"

"কেন পারে না।"

"ওরা আমাকে অভিনন্দন দেবে তারই আয়োজন চলছে।"

"ওরা কারা?"

"জাগানী ক্লাবের মেম্বররা। ভয় পেয়ো না, খুব ভদ্র ক্লাব। মেম্বরদের নামের ফর্দ দেখলেই বুঝতে পারবে। খুবই বাছাই-করা।"

"তোমাদের উদ্দেশ্য কী।"

"স্পষ্ট বলা শক্ত। উদ্দেশ্যটা নামের মধ্যেই আছে। এই নামের তলায় আধ্যাত্মিক সাহিত্যিক আর্টিস্টিক সব মানেই খুব গভীরভাবে লুকোনো আছে। নবকুমারবাবু খুব চমৎকার ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন। ওরা ঠিক করেছে তোমার কাছ থেকে চাঁদা নিতে আসবে।"

"কিন্তু চাঁদা দেখছি ওরা নিয়ে শেষ করেছে। তুমি ষোলো-আনাই পড়েছ ওর হাতে। কিন্তু এই পর্যন্তই। আমার যেটা ত্যাজ্য সেটাই ওরা পেয়েছে। আমার কাছ থেকে আর কিছু পাবার নেই।"

"মা, এত রাগ করছ কেন। ওঁরা নিঃস্বার্থভাবে দেশের উপকার করতে চান।"

"আচ্ছা, সে আলোচনা থাক্‌। এতক্ষণে তুমি বোধ হয় তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে খবর পেয়েছ যে তুমি স্বাধীন।"

"হাঁ, পেয়েছি।"

"নিঃস্বার্থরা তোমাকে জানিয়েছেন যে তোমার স্বামীর দত্ত অংশে তোমার যে টাকা আছে সে তুমি যেমন খুশি ব্যবহার করতে পার?"

"হাঁ, জেনেছি।"

"আমার কানে এসেছে উইলের প্রোবেট নেবার জন্যে তোমরা প্রস্তুত হচ্ছ। কথাটা বোধ হয় সত্যি?"

"হাঁ, সত্যি। বঙ্কুবাবু আমার সোলিসিটর।"

"তিনি তোমাকে আরও কিছু আশা এবং মন্ত্রণা দিয়েছেন।"

নীলা চুপ করে রইল।

"তোমার বঙ্কুবাবুকে আমি সিধে করে দেব যদি আমার সীমানায় তিনি পা বাড়ান। আইনে না পারি বে-আইনে। ফেরবার সময় আমি পেশোয়ার হয়ে আসব। আমার ল্যাবরেটরি রইল দিনরাত্রি চারজন শিখ সিপাইয়ের পাহারায়। আর যাবার সময় এই তোমাকে দেখিয়ে যাচ্ছি— আমি পাঞ্জাবের মেয়ে।"

ব'লে নিজের কোমরবন্ধ থেকে ছুরি বের করে বললে, "এ ছুরি না চেনে আমার মেয়েকে, না চেনে আমার মেয়ের সোলিসিটরকে। এর স্মৃতি রইল তোমার জিম্মায়। ফিরে এসে যদি হিসেব নেবার সময় হয় তো হিসেব নেব।"

১১

ল্যাবরেটরির চার দিকে অনেকখানি জমি ফাঁকা আছে। কাঁপন বা শব্দ যাতে যথাসম্ভব কাজের মাঝখানে না পৌঁছয়। এই নিস্তব্ধতা কাজের অভিনিবেশে রেবতীকে সহায়তা করে। তাই ও প্রায়ই এখানে রাত্রে কাজ করতে আসে।

নীচের ঘড়িতে দুটো বাজল। মুহূর্তের জন্য রেবতী তার চিন্তার বিষয় ভাবছিল জানালার বাইরে আকাশের দিকে চোখ মেলে।

এমন সময়ে দেওয়ালে পড়ল ছায়া। চেয়ে দেখে ঘরের মধ্যে এসেছে নীলা। রাত-কাপড় পরা, পাতলা সিল্কের শেমিজ। ও চমকে চৌকি থেকে উঠে পড়তে যাচ্ছিল। নীলা এসে ওর কোলের উপর বসে গলা জড়িয়ে ধরল। রেবতীর সমস্ত শরীর থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল, বুক উঠতে পড়তে লাগল প্রবলবেগে। গদ্গদ কণ্ঠে বলতে লাগল, "তুমি যাও, এ ঘর থেকে তুমি যাও!"

ও বললে, "কেন।"

রেবতী বললে, "আমি সহ্য করতে পারছি নে। কেন এলে তুমি এ ঘরে।"

নীলা ওকে আরও দৃঢ়বলে চেপে ধরে বললে, "কেন, আমাকে কি তুমি ভালোবাসো না।"

রেবতী বললে, "বাসি, বাসি, বাসি! কিন্তু এ ঘর থেকে তুমি যাও।"

হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল পাঞ্জাবী প্রহরী। ভর্ৎসনার কণ্ঠে বললে, "মায়িজি, বহুত শরমকি বাৎ হ্যায়, আপ বাহার চলা যাইয়ে।"

রেবতী চেতনমনের অগোচরে ইলেকট্রিক ডাকঘড়িতে কখন্ চাপ দিয়েছিল।

পাঞ্জাবী রেবতীকে বললে, "বাবুজি, বেইমানি মৎ করো।"

রেবতী নীলাকে জোর করে ঠেলে দিয়ে চৌকি থেকে উঠে পড়ল। দরোয়ান ফের নীলাকে বললে, "আপ বাহার চলা যাইয়ে, নহি তো মনিবকো হুকুম তামিল করে গা।"

অর্থাৎ জোর করে অপমান করে বের করে দেব। বাইরে যেতে যেতে নীলা বললে, "শুনছেন সার আইজাক নিউটন?—কাল আমাদের বাড়িতে আপনার চায়ের নেমন্তন্ন, ঠিক চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময়। শুনতে পাচ্ছেন না? অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন?"

ব'লে একবার তার দিকে ফিরে দাঁড়ালে।

বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে উত্তর এল, "শুনেছি।"

রাত-কাপড়ের ভিতর থেকে নীলার নিখুঁত দেহের গঠন ভাস্করের মূর্তির মতো অপরূপ হয়ে ফুটে উঠল, রেবতী মুগ্ধ চোখে না দেখে থাকতে পারল না। নীলা চলে গেল। রেবতী টেবিলের উপর মুখ রেখে পড়ে রইল। এমন আশ্চর্য সৌন্দর্য সে কল্পনা করতে পারে না। একটা কোন্ বৈদ্যুত বর্ষণ প্রবেশ করেছে ওর শিরার মধ্যে, চকিত হয়ে বেড়াচ্ছে অগ্নিধারায়। হাতের মুঠো শক্ত করে রেবতী কেবলই নিজেকে বলাতে লাগল, কাল চায়ের নিমন্ত্রণে যাবে না। খুব শক্ত শপথ করবার চেষ্টা করতে চায়, মুখ দিয়ে বেরয় না। ব্লটিঙের উপর লিখল, 'যাব না, যাব না, যাব না।' হঠাৎ দেখলে তার টেবিলে একটা ঘন লাল রঙের রুমাল পড়ে আছে, কোণে নাম সেলাই করা 'নীলা'। মুখের উপর চেপে ধরল রুমাল, গন্ধে মগজ উঠল ভরে, একটা নেশা সির্ সির্ করে ছড়িয়ে গেল সর্বাঙ্গে।

নীলা আবার ঘরের মধ্যে এল। বললে, "একটা কাজ আছে ভুলে গিয়েছিলুম।"

দরোয়ান রুখতে গেল। নীলা বললে, "ভয় নেই তোমার, চুরি করতে আসি নি। একটা কেবল সই চাই।—জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট্ করব তোমাকে, তোমার নাম আছে দেশ জুড়ে।"

অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে রেবতী বললে, "ও ক্লাবের আমি তো কিছুই জানি নে।"

"কিছুই তো জানবার দরকার নেই। এইটুকু জানলেই হবে ব্রজেন্দ্রবাবু এই ক্লাবের পেট্রন।"

"আমি তো ব্রজেন্দ্রবাবুকে জানি নে।"

"এইটুকু জানলেই হবে মেট্রপলিটান ব্যাঙ্কের তিনি ডাইরেক্টর। লক্ষ্মী আমার, জাদু আমার, একটা সই বই তো নয়।"

ব'লে ডান হাত দিয়ে তার কাঁধ ঘিরে তার হাতটা ধরে বললে, "সই করো।"

সে স্বপ্নাবিষ্টের মতো সই করে দিলে।

কাগজটা নিয়ে নীলা যখন মুড়ছে দরোয়ান বললে, "এ কাগজ আমাকে দেখতে হবে।"

নীলা বললে, "এ তো তুমি বুঝতে পারবে না।"

দরোয়ান বললে, "দরকার নেই বোঝবার।"

ব'লে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে। বললে, "দালাল বানাতে হয় বাইরে গিয়ে বানিয়ো। এখানে নয়।"

রেবতী মনে মনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দরোয়ান নীলাকে বললে, "মাজি, এখন

চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি গে।"

বলে তাকে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আবার ঘরে ঢুকল পাঞ্জাবী। বললে, "চারি দিকে আমি দরজা বন্ধ করে রাখি, তুমি ওকে ভিতর থেকে খুলে দিয়েছ।"

এ কী সন্দেহ, কী অপমান!

বারবার করে বললে, "আমি খুলি নি।"

"তবে ও কী করে ঘরে এল।"

সেও তো বটে। বিজ্ঞানী তখন সন্ধান করে বেড়াতে লাগল ঘরে ঘরে। অবশেষে দেখলে রাস্তার ধারের একটা বড়ো জানলা ভিতর থেকে আগল দেওয়া ছিল, কে সেই আগলটা দিনের বেলায় এক সময়ে খুলে রেখে গেছে।

রেবতীর যে ধূর্ত বুদ্ধি আছে এতটা শ্রদ্ধা তার প্রতি দরোয়ানজির ছিল না। বোকা মানুষ, পড়াশুনো করে এই পর্যন্ত তার তাকত। অবশেষে কপাল চাপড়ে বলে, "আওরত! এ শয়তানি বিধিদত্ত।"

যে অল্প-একটু রাত বাকি ছিল রেবতী নিজেকে বারবার করে বলালে, চায়ের নিমন্ত্রণে যাবে না।

কাক ডেকে উঠল। রেবতী চলে গেল বাড়িতে।

১২

পরের দিন সময়ের একটু ব্যতিক্রম হল না। চায়ের সভায় চারটে প'য়তাল্লিশ মিনিটেই রেবতী গিয়ে হাজির। ভেবেছিল এ সভা নিভৃতে দুজনকে নিয়ে।

ফ্যাশনেবল সাজ ওর দখলে নেই। প'রে এসেছে জামা আর ধুতি, ধোবার বাড়ি থেকে নতুন কাচিয়ে আনা, আর কাঁধে ঝুলছে একটা পাট-করা চাদর। এসে দেখে সভা বসেছে বাগানে। অজানা শৌখিন লোকের ভিড়। দমে গেল ওর সমস্ত মনটা, কোথাও লুকোতে পারলে বাঁচে। একটা কোণ নিয়ে বসবার চেষ্টা করতেই সবাই উঠে পড়ল। বললে, "আসুন আসুন ডক্টর ভট্টাচার্য, আপনার আসন এইখানে।"

একটা পিঠ-উঁচু মখমলে-মোড়া চৌকি, মণ্ডলীর ঠিক মাঝখানেই। বুঝতে পারলে সমস্ত জনতার প্রধান লক্ষ্যই ও। নীলা এসে ওর গলায় মালা পরিয়ে দিলে, কপালে দিলে চন্দনের ফোঁটা। ব্রজেন্দ্রবাবু প্রস্তাব করলেন ওকে জাগানী সভার সভাপতি পদে বরণ করা হোক। সমর্থন করলেন বঙ্কুবাবু, চারি দিকে করতালির ধ্বনি উঠল। সাহিত্যিক হরিদাসবাবু ডক্টর ভট্টাচার্যের ইণ্টারন্যাশনাল খ্যাতির কথা ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, "রেবতীবাবুর নামের পালে হাওয়া লাগিয়ে আমাদের জাগানী ক্লাবের তরণী খেয়া দেবে পশ্চিম-মহাসমুদ্রের ঘাটে ঘাটে।"

সভার ব্যবস্থাপকেরা রিপোর্টারদের কানে কানে গিয়ে বললে, "উপমাগুলোর কোনোটা যেন রিপোর্ট্ থেকে বাদ না যায়।"

বক্তারা একে একে উঠে যখন বলতে লাগল 'এতদিন পরে ডক্টর ভট্টাচার্য সায়ান্সের জয়তিলক ভারতমাতার কপালে পরিয়ে দিলেন', রেবতীর বুকটা ফুলে উঠল— নিজেকে প্রকাশমান দেখলে সভ্যজগতের মধ্যগগনে। জাগানী সভা সম্বন্ধে যে-সমস্ত

দাগী রকমের জনশ্রুতি শুনেছিল মনে মনে তার প্রতিবাদ করলে। হরিদাসবাবু যখন বললে 'রেবতীবাবুর নামের কবচ রক্ষাকবচরূপে এ সভার গলায় আজ ঝোলানো হল, এর থেকে বোঝা যাবে এ সভার উদ্দেশ্য কত মহোচ্চ', তখন রেবতী নিজের নামের গৌরব ও দায়িত্ব খুব প্রবলরূপে অনুভব করলে। ওর মন থেকে সংকোচের খোলসটা খসে পড়ে গেল। মেয়েরা মুখের থেকে সিগারেট নামিয়ে ঝুঁকে পড়ল ওর চৌকির উপর, মধুর হাস্যে বললে, "বিরক্ত করছি আপনাকে, কিন্তু একটা অটোগ্রাফ দিতেই হবে।"

রেবতীর মনে হল—এতদিন সে যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিল, স্বপ্নের গুটি গেছে খুলে, প্রজাপতি বেরিয়ে পড়েছে।

একে একে লোক বিদায় হল। নীলা রেবতীর হাত চেপে ধরে বললে, "আপনি কিন্তু যাবেন না।"

জ্বালাময় মদ ঢেলে দিলে ওর শিরার মধ্যে।

দিনের আলো শেষ হয়ে আসছে, লতাবিতানের মধ্যে সবুজ প্রদোষের অন্ধকার।

বেঞ্চির উপরে দুজনে কাছাকাছি বসল। নিজের হাতের উপরে রেবতীর হাত তুলে নিয়ে নীলা বললে, "ডক্টর ভট্টাচার্য, আপনি পুরুষমানুষ হয়ে মেয়েদের অত ভয় করেন কেন।"

রেবতী স্পর্ধাভরে বললে, "ভয় করি? কখনও না।"

"আমার মাকে আপনি ভয় করেন না?"

"ভয় কেন করব, শ্রদ্ধা করি।"

"আমাকে?"

"নিশ্চয় ভয় করি।"

"সেটা ভালো খবর। মা বলেছেন, কিছুতে আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন না। তা হলে আমি আত্মহত্যা করব।"

"কোনো বাধা আমি মানব না, আমাদের বিয়ে হবেই হবে।"

কাঁধের উপর মাথা রেখে নীলা বললে, "তুমি হয়তো জান না তোমাকে কতখানি চাই।"

নীলার মাথাটা আরও বুকের কাছে টেনে নিয়ে রেবতী বললে, "তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই।"

"জাত?"

"ভাসিয়ে দেব জাত।"

"তা হলে রেজিস্ট্রারের কাছে কালই নোটিস দিতে হবে।"

"কালই দেব, নিশ্চয় দেব।"

রেবতী পুরুষের তেজ দেখাতে শুরু করেছে।

পরিণামটা দ্রুতবেগে ঘনিয়ে আসতে লাগল।

আইমার পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। মৃত্যুর আশঙ্কা আসন্ন। যে পর্যন্ত মৃত্যু না হয় সোহিনীকে তিনি কিছুতে ছাড়বেন না। এই সুযোগটাকে দুই হাত দিয়ে আঁকড়িয়ে ধরে নীলার উন্মত্ত যৌবন আলোড়িত হয়ে উঠেছে।

পাণ্ডিত্যের চাপে রেবতীর পৌরুষের স্বাদ ফিকে হয়ে গেছে—তাকে নীলার যথেষ্ট পছন্দ নয়। কিন্তু ওকে বিবাহ করা নিরাপদ, বিবাহোত্তর উচ্ছৃঙ্খলতায় বাধা দেবার জোর তার নেই। শুধু তাই নয়। ল্যাবরেটরির সঙ্গে যে লোভের বিষয় জড়ানো আছে তার পরিমাণ প্রভূত। ওর হিতৈষীরা বলে ল্যাবরেটরির ভার নেবার যোগ্যতর পাত্র কোথাও মিলবে না রেবতীর চেয়ে; সোহিনী কিছুতে ওকে হাতছাড়া করবে না, এই হচ্ছে বুদ্ধিমানদের অনুমান।

এ দিকে সহযোগীদের ধিক্কার শিরোধার্য করে রেবতী জাগানী ক্লাবের অধ্যক্ষতার সংবাদ ঘোষণা করতে দিলে সংবাদপত্রে। নীলা যখন বলত 'ভয় লাগছে বুঝি', ও বলত 'আমি কেয়ার করি নে'। ওর পৌরুষ সম্বন্ধে সংশয়মাত্র না থাকে এই জেদ ওকে পেয়ে বসল। বললে—'এডিংটনের সঙ্গে চিঠিপত্র আমার চলে, একদিন এই ক্লাবে আমি তাঁকে নিমন্ত্রিত করে আনব।' ক্লাবের মেম্বররা বললে 'ধন্য'।

রেবতীর আসল কাজ গেছে বন্ধ হয়ে। ছিন্ন হয়ে গেছে ওর সমস্ত চিন্তাসূত্র। মন কেবলই অপেক্ষা করছে নীলা কখন আসবে, হঠাৎ পিছন থেকে ধরবে ওর চোখ টিপে। চৌকির হাতার উপর বসে বাঁ হাতে ধরবে ওর গলা জড়িয়ে। নিজেকে এই বলে আশ্বাস দিচ্ছে, ওর কাজটা যে বাধা পেয়েছে সেটা ক্ষণিক, একটু সুস্থির হলেই ভাঙার মুখে আবার জোড়া লাগবে। সুস্থির হবার লক্ষণ আশু দেখা যাচ্ছে না। ওর কাজের ক্ষতিতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হচ্ছে নীলার মনের এক কোণেও সে শঙ্কা নেই, সমস্তটাকে সে প্রহসন মনে করে।

দিনের পর দিন জাল কেবলই জড়িয়ে যাচ্ছে। জাগানী সভা ওকে ছেঁকে ধরেছে, ওকে ঘোরতর পুরুষমানুষ বানিয়ে তুলছে। এখনও অকথ্য মুখ থেকে বেরয় না, কিন্তু অশ্রাব্য শুনলে জোর করে হাসতে থাকে। ডক্টর ভট্টাচার্য ওদের খুব একটা মজার জিনিস হয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে রেবতীকে ঈর্ষায় কামড়িয়ে ধরে। ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টরের মুখের চুরট থেকে নীলা চুরট ধরায়। এর নকল করা রেবতীর অসাধ্য। চুরটের ধোঁয়া গলায় গেলে ওর মাথা ঘুরে পড়ে, কিন্তু এই দৃশ্যটা ওর শরীর মনকে আরও অসুস্থ করে তোলে। তা ছাড়া নানা রকমের ঠেলাঠেলি টানাটানি যখন চলতে থাকে, ও আপত্তি না জানিয়ে থাকতে পারে না। নীলা বলে, 'এই দেহটার 'পরে আমাদের তো কোনো মোহ নেই, আমাদের কাছে এর দাম কিসের—আসল দামী জিনিস ভালোবাসা, সেটা কি বিলিয়ে ছড়িয়ে দিতে পারি!' ব'লে চেপে ধরে রেবতীর হাত। রেবতী তখন অন্যদের অভাজন বলেই মনে করে—ভাবে ওরা ছোবড়া নিয়েই খুশি, শাঁসটা পেল না।

ল্যাবরেটরির দ্বারের বাইরে দিনরাত পাহারা চলছে, ভিতরে ভাঙা কাজ পড়ে রয়েছে, কারও দেখা নেই।

১৩

ড্রয়িংরুমে সোফায় পা দুটো তুলে কুশনে হেলান দিয়ে নীলা। মেঝের উপরে নীলার পায়ের কাছে ঠেস দিয়ে বসে আছে রেবতী, হাতে রয়েছে লেখন-ভরা ফুল্‌স্ক্যাপ।

রেবতী মাথা নেড়ে বললে, "ভাষায় কেমন যেন বেশি রঙ ফলানো হয়েছে, এতটা

বাড়িয়ে-বলা লেখা পড়তে লজ্জা করবে আমার।"

"ভাষার তুমি মস্ত সমজদার কিনা। এ তো কেমিস্ট্রি ফর্‌মুলা নয়— খুঁত খুঁত কোরো না, মুখস্থ করে যাও। জান এটা লিখেছেন আমাদের সাহিত্যিক প্রমদা-রঞ্জনবাবু?"

"ঐ-সব মস্ত মস্ত সেণ্টেন্‌স্‌ আর বড়ো বড়ো শব্দগুলো মুখস্থ করা আমার পক্ষে ভারি শক্ত হবে।"

"ভারি তো শক্ত! তোমার কানের কাছে আউড়ে আউড়ে আমার তো সমস্তটা মুখস্থ হয়ে গেছে— 'আমার জীবনের সর্বোত্তম শুভ মুহূর্তে জাগানী সভা আমাকে যে অমরাবতীর মন্দারমাল্যে সমলংকৃত করিলেন'— গ্র্যান্‌ড্‌! তোমার ভয় নেই, আমি তো তোমার কাছেই থাকব, আস্তে আস্তে তোমাকে বলে দেব।"

"আমি বাংলাসাহিত্য ভালো জানি নে, কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছে সমস্ত লেখাটা যেন আমাকে ঠাট্টা করছে। ইংরেজিতে যদি বলতে দাও কত সহজ হয়: Dear friends, allow me to offer you my heartiest thanks for the honour you have conferred upon me on behalf of the Jagani Club— the Great Awakener ইত্যাদি। এমন দুটো সেণ্টেন্‌স্‌ বললেই বাস্‌—"

"সে হচ্ছে না, তোমার মুখে বাংলা যে খুব মজার শোনাবে— ঐ যেখানটাতে আছে— 'হে বাংলাদেশের তরুণসম্প্রদায়, হে স্বাতন্ত্র্যসঞ্চালনরথের সারথি, হে ছিন্ন-শৃংখলপরিকীর্ণ পথের অগ্রণীবৃন্দ'— যাই বল, ইংরেজিতে এ কি হবার জো আছে? তোমার মতো বিজ্ঞানবিশারদের মুখে শুনলে তরুণ বাংলা সাপের মতো ফণা দুলিয়ে নাচবে। এখনও সময় আছে, আমি পড়িয়ে নিচ্ছি।"

গুরুভার দীর্ঘ দেহকে সিঁড়ির উপর দিয়ে সশব্দে বহন ক'রে সাহেবি পোশাকে ব্যাংকের ম্যানেজার ব্রজেন্দ্র হালদার মচ্‌মচ্‌ শব্দে এসে উপস্থিত। বললে, "নাঃ, এ অসহ্য, যখনই আসি নীলাকে দখল করে বসে আছ। কাজ নেই, কর্ম নেই, নীলিকে তফাত করে রেখেছ আমাদের কাছ থেকে কাঁটাগাছের বেড়ার মতো।"

রেবতী সংকুচিত হয়ে বললে, "আজ আমার একটু বিশেষ কাজ আছে তাই—"

"কাজ তো আছে, সেই ভরসাতেই তো এসেছিলুম; আজ তুমি মেম্বরদের নেমন্তন্ন করেছ, ব্যস্ত থাকবে মনে করে আপিসে যাবার আগে আধ ঘণ্টাটাক সময় করে নিয়ে তাড়াতাড়ি এসেছি। এসেই শুনছি এখানেই উনি পড়েছেন কাজে বাঁধা। আশ্চর্য! কাজ না থাকলে এইখানেই ওঁর ছুটি, আবার কাজ থাকলে এইখানেই ওঁর কাজ। এমন নাছোড়বান্দার সঙ্গে আমরা কেজো লোকেরা পাল্লা দিই কী ক'রে। নীলি, is it fair?"

নীলা বললে, "ডক্টর ভটচাজের দোষ হচ্ছে, উনি আসল কথাটা জোর করে বলতে পারেন না। উনি কাজ আছে বলে এসেছেন এটা বাজে কথা, না এসে থাকতে পারেন না বলেই এসেছেন এটাই একটা শোনবার মতো কথা এবং সত্যি কথা। আমার সমস্ত সময় উনি দখল করেছেন ওঁর জেদের জোরে। এই তো ওঁর পৌরুষ। তোমাদের সবাইকে ঐ বাঙালের কাছে হার মানতে হল।"

"আচ্ছা ভালো, তা হলে আমাদেরও পৌরুষ চালাতে হবে। এখন থেকে জাগানী-ক্লাব-মেম্বররা নারীহরণের চর্চা শুরু করবে। জেগে উঠবে পৌরাণিক যুগ।"

নীলা বললে, "বেশ মজা লাগছে শুনতে। নারীহরণ, পাণিগ্রহণের চেয়ে ভালো। কিন্তু পদ্ধতিটা কী রকম?"

হালদার বললে, "দেখিয়ে দিতে পারি।"

"এখনই?"

"হাঁ, এখনই।"

ব'লেই সোফা থেকে নীলাকে আড়কোলা করে তুলে নিলে।

নীলা চীৎকার করে হেসে ওর গলা জড়িয়ে ধরলে।

রেবতীর মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। ওর মুশকিল এই যে, অনুকরণ করবার কিম্বা বাধা দেবার মতো গায়ের জোর নেই। ওর বেশি করে রাগ হতে লাগল নীলার 'পরে, এই-সব অসভ্য গোঁয়ারদের প্রশ্রয় দেয় কেন!

হালদার বললে, "গাড়ি তৈরি আছে। তোমাকে নিয়ে চললুম ডায়মন্‌ড্‌হারবারে। আজ সন্ধের ভোজে ফিরিয়ে এনে দেব। ব্যাঙ্কে কাজ ছিল, সেটা যাক গে চুলোয়। একটা সৎকার্য করা হবে। ডাক্তার ভটচাজকে নির্জনে কাজ করবার সুবিধে করে দিচ্ছি। তোমার মতো অতবড়ো ব্যাঘাতকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভালো, এজন্যে উনি আমাকে ধন্যবাদ দেবেন।"

রেবতী দেখলে, নীলার ছট্‌ফট্‌ করবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, নিজেকে সে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টামাত্র করলে না, বেশ যেন আরামে ওর বক্ষ আশ্রয় করে রইল। ওর গলা জড়িয়ে রইল বিশেষ একটা আসক্তভাবে। যেতে যেতে বললে, "ভয় নেই বিজ্ঞানী সাহেব, এটা নারীহরণের রিহর্সলমাত্র—লঙ্কাপারে যাচ্ছি নে, ফিরে আসব তোমার নেমন্তন্নে।"

রেবতী ছিঁড়ে ফেললে সেই লেখাটা।

হালদারের বাহুর জোর এবং অসংকুচিত অধিকারবিস্তারের তুলনায় নিজের বিদ্যাভিমান ওর কাছে আজ বৃথা হয়ে গেল।

আজ সান্ধ্যভোজ একটা নামজাদা রেস্টোরাঁতে। নিমন্ত্রণকর্তা স্বয়ং রেবতী ভট্টাচার্য, তাঁর সম্মানিতা পার্শ্ববর্তিনী নীলা। সিনেমার বিখ্যাত নটী এসেছে গান গাইতে। টোস্ট্‌ প্রোপোজ করতে উঠেছে বঙ্কুবিহারী, গুণগান হচ্ছে রেবতীর আর তার নামের সঙ্গে জড়িয়ে নীলার। মেয়েরা খুব জোরের সঙ্গে সিগারেট টানছে প্রমাণ করতে যে তারা সম্পূর্ণ মেয়ে নয়। প্রৌঢ়া মেয়েরা যৌবনের মুখোশ প'রে ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে অট্টহাস্যে উচ্চকণ্ঠে পরস্পর গা-টেপা-টিপিতে যুবতীদের ছাড়িয়ে যাবার জন্যে মাতামাতির ঘোড়দৌড় চালিয়েছে।

হঠাৎ ঘরে ঢুকল সোহিনী। স্তব্ধ হয়ে গেল ঘরসুদ্ধ সবাই। রেবতীর দিকে তাকিয়ে সোহিনী বললে, "চিনতে পারছি নে। ডক্টর ভট্টাচার্য বুঝি? খরচের টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলে, পাঠিয়ে দিয়েছি গেল শুক্রবারে; এই তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কিছু অকুলোন হচ্ছে না। এখন একবার উঠতে হচ্ছে, আজ রাত্রেই ল্যাবরেটরির ফর্দ অনুসারে জিনিসপত্র মিলিয়ে দেখব।"

"আপনি আমাকে অবিশ্বাস করছেন?"

"এতদিন অবিশ্বাস তো করি নি। কিন্তু লজ্জাশরম যদি থাকে বিশ্বাসরক্ষার কথা তুমি আর মুখে এনো না।"

রেবতী উঠতে যাচ্ছিল, নীলা তাকে কাপড় ধরে টেনে বসিয়ে দিলে। বললে, "আজ উনি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছেন, সকলে যান আগে, তার পরে উনি যাবেন।"

এর মধ্যে একটা নিষ্ঠুর ঠোকর ছিল। সার আইজাক মায়ের বড়ো পেয়ারের, ওর মতো এতবড়ো বিশ্বাসী আর কেউ নেই, তাই সকলকে ছাড়িয়ে ল্যাবরেটরির ভার ওর উপরেই। আরও একটু দেগে দেবার জন্যে বললে, "জান মা? অতিথি আজ পঁয়ষট্টি জন, এ ঘরে সকলকে ধরে নি, এক দল আছে পাশের ঘরে—ঐ শুনছ না হো হো লাগিয়েছে? মাথা পিছু পঁচিশ টাকা ধরে নেয়, মদ না খেলেও মদের দাম ধরে দিতে হয়। খালি গেলাসের জরিমানা কম লাগল না। আর কেউ হলে মুখ চুপসে যেত। ওঁর দরাজ হাত দেখে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরের তাক লেগে গেছে। সিনেমার গাইয়েকে কত দিতে হয়েছে জান?—তার এক রাত্তিরের পাওনা চারশো টাকা।"

রেবতীর মনের ভিতরটা কাটা কইমাছের মতো ধড়্‌ফড়্‌ করছে। শুকনো মুখে কথাটি নেই।

সোহিনী জিজ্ঞাসা করলে, "আজকের সমারোহটা কিসের জন্যে?"

"তা জান না বুঝি? অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে তো বেরিয়ে গেছে, উনি জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট্‌ হয়েছেন, তারই সম্মানে এই ভোজ। লাইফ মেম্বরশিপের ছশো টাকা সুবিধেমত পরে শুধে দেবেন।"

"সুবিধে বোধ হয় শীঘ্র হবে না।"

রেবতীর মনটার মধ্যে স্টীমরোলার চলাচল করছিল।

সোহিনী তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তা হলে এখন তোমার ওঠবার সুবিধে হবে না?"

রেবতী নীলার মুখের দিকে তাকালে। তার কুটিল কটাক্ষের খোঁচায় পুরুষ-মানুষের অভিমান জেগে উঠল। বললে, "কেমন করে যাই, নিমন্ত্রিতেরা সব—"

সোহিনী বললে, "আচ্ছা, আমি ততক্ষণ এখানে বসে রইলুম। নাসেরউল্লা তুমি দরজার কাছে হাজির থাকো।"

নীলা বললে, "সে হতে পারবে না মা! আমাদের একটা গোপন পরামর্শ আছে, এখানে তোমার থাকা উচিত হবে না।"

"দেখ্‌ নীলা, চাতুরীর পালা তুই সবে শুরু করেছিস, এখনও আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবি নে। তোদের কিসের পরামর্শ সে খবর কি আমি পাই নি। বলে দিচ্ছি, তোদের সে পরামর্শের জন্যে আমারই থাকা সব চেয়ে দরকার।"

নীলা বললে, "তুমি কী শুনেছ কার কাছে।"

"খবর নেবার ফন্দি থাকে গর্তের সাপের মতো টাকার থলির মধ্যে। এখানে তিনজন আইনওয়ালা মিলে দলিলপত্র ঘেঁটে বের করতে চাও ল্যাবরেটরি-ফণ্ডে কোনো ছিদ্র আছে কি না। তাই নয় কি নীলু।"

নীলা বললে, "তা, সত্যি কথা বলব। বাবার অতখানি টাকায় তাঁর মেয়ের কোনো

শেয়ার থাকবে না, এটা অস্বাভাবিক। তাই সবাই সন্দেহ করে—"

সোহিনী চৌকি থেকে উঠে দাঁড়াল। বললে, "আসল সন্দেহের মূল আরও অনেক আগেকার দিনের। কে তোর বাপ, কার সম্পত্তির শেয়ার চাস? এমন লোকের তুই মেয়ে এ কথা মুখে আনতে তোর লজ্জা করে না?"

নীলা লাফিয়ে উঠে বললে, "কী বলছ মা!"

"সত্যি কথা বলছি। তাঁর কাছে কিছুই গোপন ছিল না, তিনি জানতেন সব। আমার কাছে যা পাবার তা তিনি সম্পূর্ণ পেয়েছেন, আজও পাবেন তা, আর-কিছু তিনি গ্রাহ্য করেন নি।"

ব্যারিস্টর ঘোষ বললে, "আপনার মুখের কথা তো প্রমাণ নয়।"

"সে কথা তিনি জানতেন। সকল কথা খোলসা করে তিনি দলিল রেজেস্ট্রি করে গেছেন।"

"ওহে বঙ্কু, রাত হল যে, আর কেন। চলো।"

পেশোয়ারীর ভঙ্গি দেখে পঁয়ত্রিশ জন অন্তর্ধান করলে।

এমন সময় সুটকেস হাতে এসে উপস্থিত চৌধুরী। বললেন, "তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে আসতে হল।—কী রে রেবি, বেবি, মুখখানা যে পার্চমেন্টের মতো সাদা হয়ে গেছে।—ওরে, খোকার দুধের বাটি গেল কোথায়।"

নীলাকে দেখিয়ে সোহিনী বললে, "যিনি জোগাবেন তিনি যে ঐ বসে আছেন।"

"গয়লানীর ব্যবসা ধরেছ নাকি মা।"

"গয়লা ধরার ব্যবসা ধরেছে, ঐ যে বসে আছে শিকারটি।"

"কে, আমাদের রেবি নাকি।"

"এইবার আমার মেয়ে আমার ল্যাবরেটরিকে বাঁচিয়েছে। আমি লোক চিনতে পারি নি, কিন্তু আমার মেয়ে ঠিক বুঝেছিল যে ল্যাবরেটরিতে গোয়ালঘর বসিয়ে দিয়েছিলুম—গোবরের কুণ্ডে আর-একটু হলেই ডুবত সমস্ত জিনিসটা।"

অধ্যাপক বললেন, "মা, তুমি এই জীবটিকে আবিষ্কার করেছ যখন, তখন এই গোষ্ঠবিহারীর ভার তোমাকেই নিতে হবে। ওর আর সবই আছে কেবল বুদ্ধি নেই, তুমি কাছে থাকলে তার অভাবটা টের পাওয়া যাবে না। বোকা পুরুষদের নাকে দড়ি দিয়ে চালিয়ে নিয়ে বেড়ানো সহজ।"

নীলা বললে, "কী গো সার আইজাক নিউটন, রেজেস্ট্রি আপিসে নোটিস তো দেওয়া হয়েছে, ফিরিয়ে নিতে চাও নাকি।"

বুক ফুলিয়ে রেবতী বললে, "ম'রে গেলেও না।"

"বিয়েটা হবে তা হলে অশুভ লগ্নে।"

"হবেই, নিশ্চয় হবে।"

সোহিনী বললে, "কিন্তু ল্যাবরেটরি থেকে শত হস্ত দূরে।"

অধ্যাপক বললেন, "মা নীলু, ও বোকা, কিন্তু অক্ষম নয়। ওর নেশাটা কেটে যাক, তার পরে ওর খোরাকের জন্যে বেশি ভাবতে হবে না।"

"সার আইজাক, তা হলে কিন্তু তোমার কাপড়চোপড়গুলো একটু ভদ্র রকমের বানাতে হবে, নইলে তোমার সামনে আমাকে আবার ঘোমটা ধরতে হবে।"

হঠাৎ আর-একটা ছায়া পড়ল দেয়ালে। পিসিমা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "রেবি, চলে আয়।"

সড়্ সড়্ করে রেবতী পিসিমার পিছন পিছন চলে গেল, একবার ফিরেও তাকাল না।

আশ্বিন ১৩৪৭

বদনাম

প্রথম

ক্লিং ক্লিং ক্লিং সাইকেলের আওয়াজ ; সদর দরজার কাছে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন ইন্‌স্‌পেক্টার বিজয়বাবু। গায়ে ছাঁটা কোর্তা, কোমরে কোমরবন্ধ, হাফ-প্যান্ট্‌-পরা, চলনে কেজো লোকের দাপট। দরজার কড়া নাড়া দিতেই গিন্নি এসে খুলে দিলেন।

ইন্‌স্‌পেক্টার ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ঝংকার দিয়ে উঠলেন—"এমন করে তো আর পারি নে, রাত্তিরের পর রাত্তির খাবার আগলে রাখি! তুমি কত চোর ডাকাত ধরলে, সাধু সজ্জনও বাদ গেল না, আর ঐ একটা লোক অনিল মিত্তিরের পিছন পিছন তাড়া করে বেড়াচ্ছ, সে থেকে থেকে তোমার সামনে এসে নাকের উপর বুড়ো আঙুল নাড়া দিয়ে কোথায় দৌড় মারে তার ঠিকানা নেই। দেশসুদ্ধ লোক তোমার এই দশা দেখে হেসে খুন, এ যেন সার্কাসের খেলা হচ্ছে।"

ইন্‌স্‌পেক্টার বললেন, "আমার উপরে ওর নেকনজর আছে কী ভাগ্যিস। ও বেলে খালাস আসামীই বটে, তবু পুলিসে না রিপোর্ট্‌ করে কোথাও যাবার হুকুম নেই, তাই আমাকে সেদিন চিঠিতে জানিয়ে গেল—'ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু, ভয় পাবেন না, সভার কাজ সেরেই আমি ফিরে আসছি।' কোথায় সভা তার কোনো সন্ধান নেই। পুলিসে ও যেন ভেলকি খেলছে।"

স্ত্রী সৌদামিনী বললে, "শোনো তবে আজ রাত্তিরের খবর দিই, শুনলে তোমার তাক লেগে যাবে। লোকটার কী আস্পর্ধা, কী বুকের পাটা! রাত্তির তখন দুটো, আমি তোমার খাবার আগলে বসে আছি, একটু ঝিমুনি এসেছে। হঠাৎ চমকে দেখি সেই তোমাদের অনিল ডাকাত, আমাকে প্রণাম করে বললে, 'দিদি, আজ ভাইফোঁটার দিন, মনে আছে? ফোঁটা নিতে এসেছি। আমার আপন দিদি এখন চট্টগ্রামে কী সব চক্রান্ত করছে। কিন্তু ফোঁটা আমি চাই, ছাড়ব না, এই বসলুম।'...সত্যি কথা তোমাকে বলব। আমার মনের মধ্যে উছলে উঠল স্নেহ। মনে হল এক রাত্তিরের জন্যে আমি ভাইকে পেয়েছি। সে বললে, 'দিদি, আজ তিন দিন কোনোমতে আধ-পেটা খেয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরেছি। আজ তোমার হাতের ফোঁটা তোমার হাতের অন্ন নিয়ে আবার আমি উধাও হব।' তোমার জন্যে যে ভাত বাড়া ছিল তাই আমি তাকে আদর করে খাওয়ালুম। বললুম, 'এই বেলা তুমি পালাও, তাঁর আসবার সময় হয়েছে।' লোকটা বললে, 'কোনো ভয় নেই, তিনি আমারই সন্ধানে চিতলবেড়ে গেছেন, ফিরতে অন্তত তিনটে বাজবে। আমি রয়ে বসে তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে যেতে পারব।' বলে তোমারই জন্যে সাজা পান টপ করে মুখে নিলে তুলে। তার পরে বললে কিনা—'ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু হাভানা চুরুট খেয়ে থাকেন ; তারই একটা আমাকে দাও, আমি খেতে খেতে যাব যেখানে আমার সব দলের লোক আছে ; তারা আজ সভা করবে।' তোমার ঐ ডাকাত অনায়াসে, নির্ভয়ে, সেই জায়গাটার নাম আমাকে বলে দিলে।"

ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু বললেন, "নামটা কী শুনতে পারি কি।"

সদু বললে, "তুমি এমন প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করলে এর থেকে প্রমাণ হয় তোমার ডাকাত আমাকে চিনেছিল কিন্তু তুমি আজও আমাকে চেনো নি। যা হোক, আমি তাকে তোমার বহু শখের একটি হাভানা চুরুট দিয়েছি। সে জন্নাসিয়ে দিব্যি সুস্থ মনে পায়ের ধুলো নিয়ে চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে চলে গেল।"

বিজয় বসে ছিলেন, লাফ দিয়ে উঠে বললেন, "বলো সে কোন্‌ দিকে গেল, কোথায় তাদের সভা হচ্ছে।"

সদু উঠে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, "কী! এমন কথা তোমার মুখ দিয়ে বের হল। আমি তোমার স্ত্রী হয়েছি, তাই বলে কি পুলিসের চরের কাজ করব। তোমার ঘরে এসে আমি যদি ধর্ম খুইয়ে বসি, তবে তুমিই বা আমাকে বিশ্বাস করবে কী করে।"

ইন্‌স্‌পেক্টার চিনতেন তাঁর স্ত্রীকে ভালো করে। খুব শক্ত মেয়ে, এর জিদ কিছুতেই নরম হবে না। হতাশ হয়ে বসে নিশ্বেস ফেলে বললেন, "হায় রে, এমন সুযোগটাও কেটে গেল!"

বসে বসে তাঁর নবাবি ছাঁদের গোঁফ-জোড়াটাতে তা দিতে লাগলেন, আর থেকে থেকে ফুঁসে উঠলেন অধৈর্যে। তাঁর জন্য তৈরি দ্বিতীয় দফার খিচুড়ি তাঁর মুখে রুচল না।

এই গেল এই গল্পের প্রথম পালা।

দ্বিতীয়

সদু স্বামীকে বললে, "কী গো, তুমি যে নৃত্য জুড়ে দিয়েছ! আজ তোমার মাটিতে পা পড়ছে না। ডিস্ট্রিক্‌ট্‌ পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডের নাগাল পেয়েছ নাকি।"

"পেয়েছি বৈকি।"

"কী রকম শুনি।"

"আমাদের যে চর, নিতাই চক্রবর্তী, সে ওদের ওখানে চরাগিরি করে। তার কাছে শোনা গেল আজ মোচকাঠির জঙ্গলে ওদের একটা মস্ত সভা হবে। সেটাকে ঘেরাও করবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। ভারী জঙ্গল, আমরা আগে থাকতে লুকিয়ে সার্ভেয়ার পাঠিয়ে তন্ন তন্ন করে সার্ভে করে নিয়েছি। কোথাও আর লুকিয়ে পালাবার ফাঁক থাকবে না।"

"তোমাদের বুদ্ধির ফাঁকের মধ্য দিয়ে বড়ো বড়ো ফুটোই থাকবে। অনেক বার তো লোক হাসিয়েছ, আর কেন। এবারে ক্ষান্ত দাও।"

"সে কি কথা সদু। এমন সুযোগ আর পাব না।"

"আমি তোমাকে বলছি, আমার কথা শোনো—ও মোচকাঠির জঙ্গল ও-সব বাজে কথা। সে তোমাদেরই ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরছে। তোমাদের মুখের উপরে তুড়ি মেরে দেবে দৌড়, এ আমি তোমাকে বলে দিলুম।"

"তা, তুমি যদি লুকিয়ে তাদের ঘরের খবর দাও, তা হলে সবই সম্ভব হবে।"

"দেখো, অমন চালাকি কোরো না। বোকামি করতে হয় পেট ভরে করো, অনেক বার করেছ, কিন্তু নিজের ঘরের বউকে নিয়ে—"

কথাটা চাপা পড়ল চোখের উপর আঁচল চাপার সঙ্গে।

"সদু, আমি দেখেছি যে এই একটা বিষয়ে তোমার ঠাট্টাটুকুও সয় না।"

"তা সত্যি, পুলিসের ঠাট্টাতেও যে গায়ে দাঁত বসে। এখন কিছু খেয়ে নেবে কি না বলো।"

"তা নেব, সময় আছে, সব একেবারে পাকাপাকি ঠিকঠাক হয়ে গেছে।"

"দেখো, আমি সত্যি কথাই বলব। তোমরা যা কানাকানি কর তা যদি জানতে পারতুম তা হলে ওদের কাছে ফাঁস করে দেওয়া কর্তব্য মনে করতুম।"

"সর্বনাশ, কিছু শুনেছ নাকি তুমি।"

"তোমাদের সংসারে চোখ কান খুলে রাখতেই হয়, কিছু কানে যায় বৈকি।"

"কানে যায়, আর তার পরে?"

"আর তার পরে চণ্ডীদাস বলেছেন 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিয়া দিল প্রাণ'।"

"তোমার ঐ ঠাট্টাতেই তুমি জিতে যাও, কোন্‌টা যে তোমার আসল কথা ধরা যায় না।"

"তা বুঝবার বুদ্ধিই যদি থাকত তবে এই পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টরি কাজ তুমি করতে না। এর চেয়ে বড়ো কাজেই সরকার বাহাদুর তোমাকে লাগিয়ে দিতেন বিশ্ব-হিতৈষীর পদে, বক্তৃতা দিতে দিতে দেশে বিদেশে জাল ফেলতে।"

"সর্বনাশ, তা হলে সেই-যে মেয়েটির গুজব শোনা যাচ্ছে, সে দেখি আমার আপন ঘরেরই ভিতরকার।"

"ঐ দেখো, কুকুরটা চেঁচিয়ে মরছে। তাকে খাইয়ে ঠাণ্ডা করে আসি।"

ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু মহা খাপ্পা হয়ে বললেন, "আমি এক্ষুনি গিয়ে লাগাব ঐ কুকুরটাকে আমার পিস্তলের গুলি।"

সদু তার স্বামীর কাপড় ধরে টেনে বললে, "না, কক্ষনো তুমি যেতে পারবে না।"

"কেন।"

"তুমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই একেবারে টুঁটি ক্যাঁক্‌ করে চেপে ধরবে। ও বড়ো বদমাইস কুকুর। ও কেবল আমাকেই চেনে।"

"একটা খবর পেয়েছি সদু, সেই অনিল লোকটা হরবোলা, ও সব জন্তুরই নকল করতে পারে। রোজ রাত্রি দুটোর সময়ে ওই-যে তোমার ডাক দিচ্ছে না তাই বা বলি কী করে।"

সদু একেবারে জ্বলে উঠে বললে, "অ্যাঁ, শেষকালে আমাকে সন্দেহ! এই রইল তোমার ঘরকন্না পড়ে, আমি চললুম আমার ভগ্নীপতির বাড়িতে।"

এই বলে সে উঠে পড়ল।

"আরে কোথায় যাও! ভালো মুশকিল! নিজের ঘরের স্ত্রীকে ঠাট্টা করব না, আমি ঠাট্টার জন্যে পরের ঘরের মেয়ে কোথায় খুঁজে পাই। পেলেই বা শান্তি রক্ষা হবে কী করে।"

ব'লে ওকে জোর করে ধরে বসালেন।

সদু কেবলই চোখ মুছতে লাগল।

"আহা, কী করছ, কাঁদ কেন, সামান্য একটা ঠাট্টা নিয়ে!"

"না, তোমার এই ঠাট্টা আমার সইবে না, আমি বলে রাখছি।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, ব্যস্‌— রইল, এখন তুমি আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার কুকুরকে খাইয়ে এসো। ও আবার কাটলেট নইলে খায় না, পুডিং না হলে পেট ওর ভরে না। সামান্য কুকুর নিয়ে তুমি অত বাড়াবাড়ি কর কেন আমি বুঝতেই পারি না।"

সদু বললে, "তোমরা পুরুষ মানুষ বুঝবে না। পুত্রহীনা মেয়ের বুকে যে স্নেহ জমে থাকে সে যে-কোনো একটা প্রাণীকে পেলে তাকে বুকের কাছে টেনে নেয়। ওকে একদিন না দেখলে আমার মনে কেবলই ভয় হতে থাকে, কে ওকে কোন্‌ দিক থেকে ধরে নিয়ে গেল। তাই তো আমি ওকে এত যত্নে ঢেকেঢুকে রাখি।"

"কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি সদু, কোনো জানোয়ার এত আদরে বেশি দিন বাঁচতে পারে না।"

"তা, যতদিন বাঁচে ভালো করেই বাঁচুক।"

বিজয়বাবু বিশ্রাম করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে পুলিসের দলবল জুটল, চলল সবাই আলাদা আলাদা রাস্তায় মোচকাঠির দিকে। বহু দূরের পথ, প্রায় রাত পুইয়ে গেল যেতে-আসতে।

পরের দিন বেলা সাতটার সময় মুখ শুকিয়ে ইন্‌স্‌পেক্টার বাড়িতে এসে কেদারাটার উপরে ধপাস করে বসে পড়লেন। বললেন, "সদু, বড়ো ফাঁকি দিয়েছে! তোমার কথাই সত্যি। পুলিসের লোক ঘেরাও করলে বন, সে বনে জনমানব নেই। হৈ হৈ লাগিয়ে দিলে ; চীৎকার করে বলতে লাগলে, 'কোথায় আছ বের হও, নইলে আমরা গুলি চালাব। অনেকগুলো ফাঁকা গুলি চলল, কোনো সাড়া নেই। পুলিসের লোক খুব সাবধানে বনের মধ্যে ঢুকে তল্লাস করলে। তখন ভোর হয়ে এসেছে। রব উঠল, 'ধর্‌ সেই নিতাইকে, বদমাইসকে।' নিতাইয়ের আর টিকি দেখা যায় না। একখানা চিঠি পাওয়া গেল, কেবল এই কটি কথা—'আসামী নিরাপদ। দিদিকে আমার প্রণাম জানাবেন। অনিল।' দেখো দেখি কী কাণ্ড, এর মধ্যে আবার তোমার নাম জড়ানো কেন, শেষ কালে"—

"শেষকালে আবার কী। পুলিসের ঘরের গিন্নি কি আসামীর ঘরের দিদি হতেই পারে না। সংসারের সব সম্বন্ধই কি সরকারী খামের ছাপ-মারা। আমি আর কিছু বলব না। এখন তুমি একটু শোও, একটু ঘুমোও।"

ঘুম ভাঙল তখন বেলা দুপুর। স্নান করে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিজয় বসে বসে পান চিবোতে চিবোতে বললেন, "লোকটার চালাকির কথা কী আর তোমাকে বলব। ও দলবল নিয়ে চার দিকে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে. ও ভোর রাত্তিরে কুম্ভক যোগ করে শূন্যে আসন করে—এটা নাকি অনেকের স্বচক্ষে দেখা। গ্রামের লোকের বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছে—ও একজন সিদ্ধপুরুষ, বাবা ভোলানাথের চিহ্নিত। ওর গায়ে হাত দেবে হিন্দুর ঘরে আজ এমন লোক নেই। তারা আপন ঘরের দাওয়ায় ওর জন্য খাবার রেখে দেয়—রীতিমত নৈবেদ্য। সকাল-বেলা উঠে দেখে তার কোনো চিহ্ন নেই। হিন্দু পাহারাওয়ালারা তো ওর কাছে ঘেঁষতেই চায় না। একজন দারোগা সাহস করে হিজলাকান্দির দাঙ্গার পরে ওকে গ্রেপ্তার

করেছিল। হপ্তা খানেকের মধ্যে তার স্ত্রী বসন্ত হয়ে মারা গেল। এর পরে আর প্রমাণের অভাব রইল না। সেই জন্য এবারে যখন মোচকাঠিতে ওর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না, পাহারাওয়ালারা ঠিক করলে যে ও যখন খুশি আপনাকে লোপ করে দিতে পারে। ও তার একটি সাক্ষীও রেখে গেছে—একটা জলা জায়গায় পায়ের দাগ দেখা গেল, দুহাত অন্তর এক-একটি পদক্ষেপ—দেড় হাত লম্বা। হিন্দু পাহারা-ওয়ালারা সেই পায়ের দাগের উপরে ভক্তিভরে লুটিয়ে পড়ে আর-কি! এই লোককে সম্পূর্ণ মন দিয়ে ধরপাকড় করা শক্ত হয়ে উঠেছে। ভাবছি মুসলমান পাহারাওয়ালা আনাব, কিন্তু দেশের হাওয়ার গুণে মুসলমানকে যদি ছোঁয়াচ লাগে তবে আরও সর্বনাশ হবে। খবরের কাগজওয়ালারা মোচকাঠিতে সংবাদদাতা পাঠাতে শুরু করলে। কোন্ পলাতকার এই লম্বা পা, তা নিয়ে অনেক ক্ষণ আলোচনা হল। এখন এ লোকটাকে কী করা যায়। এই কিছুদিন বেলে খালাস পেয়েছিল, সেই সুযোগে দেশের হাওয়ায় যেন গাঁজার ধোঁওয়া লাগিয়ে দিলে। এ দিকে পিছনে প্রোপাগাণ্ডা চলছেই, নানা রকম ছায়া নানা জায়গায় দেখা যায়। এক জায়গায় মহাদেবের একগাছি চুল পাওয়া গেছে বলে আমার ভক্ত কনস্টেবল অত্যন্ত গদগদ হয়ে উঠেছে। সেটা যে শণের দড়ি সে কথা বিচার করবার সাহসই হল না। ক'দিনের মধ্যে চার দিকে একেবারে গুজবের ঝড় উঠে গেল। মোচকাঠিতে ঐ পায়ের চিহ্নের উপরে মন্দির বানাবে ব'লে একজন ধনী মাড়োয়ারি ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে বসেছে। একজন ভক্ত পাওয়া গেল, তিনি ছিলেন এক সময়ে ডিস্ট্রিক্ট্ জজ। তাঁর কাছে বসে অনিল ডাকাত শিবসংহিতার ব্যাখ্যা শুরু করে দিলে—লোকটার পড়াশুনা আছে। এমনি করে ভক্তি ছড়িয়ে যেতে লাগল। এবারকার বেলের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে পর ওর নামে সাক্ষী জোগাড় করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। অনিল ডাকাতকে নিয়ে এই তো আমার এক মস্ত সমস্যা বাধল।

"সদু, তুমি জান বোধ হয় এ দিকে আর এক সংকট বেধেছে। আমার মামাতো ভাই গিরিশ সে হাতিবাঁধা পরগনায় পুলিসের দারোগাগিরি করে। কর্তব্যের খাতিরে একজন কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলের হাতে হাতকড়ি লাগিয়েছিল। সেই অবধি গ্রামের লোকেরা তাকে জাতে ঠেলবার মন্ত্রণা করছে। এ দিকে তার মেয়ের বিয়ের বয়স পেরিয়ে যায়, যে পাত্রই জোটে তাকে ভাঙিয়ে দেয় গ্রামের লোক। পাত্র যদি জোটে তবে পুরুত জোটে না। দূর গ্রাম থেকে পুরুতের সন্ধান পেল, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল সে কখন দিয়েছে দৌড়। এবারে একটা কিনারা পাওয়া গেছে। বৃন্দাবন থেকে এক বাবাজি এসে হঠাৎ আমার হেড কনস্টেবলের বাড়িতে আড্ডা দিলে, সদ্‌ব্রাহ্মণ খাইয়ে-দাইয়ে আমরা সবাই মিলে তাঁকে খুশি করাচ্ছি। তাঁকে রাজি করানো গেছে। এখন গ্রামের লোকের হাত থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সদু, তুমিও এ কাজে সাহায্য করো।"

"ওমা, করব না তো কী! ও তো আমার কর্তব্য। আহা, তোমাদের গিরিশের মেয়ে, আমাদের মিনু। সে তো কোনো অপরাধ করে নি। তার বিয়ে তো হওয়াই চাই। আনো তোমার বৃন্দাবনবাসীকে, আমি জানি ঐ-সব স্বামীজিদের কী করে আদর যত্ন করতে হয়।"

এলেন বৃন্দাবনবাসী। বুকে লুটিয়ে পড়ছে সাদা দাড়ি, নারদ মুনির মতো।

সদু ভক্তিতে গদগদ হয়ে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল, পাড়ার লোক তার প্রণামের ঘটা দেখে হেসে বাঁচে না। প্রবীণা প্রতিবেশিনী মুচকে হেসে বললেন, "সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি তোমার এত ভক্তি হঠাৎ জেগে উঠল কী করে।"

সদু হেসে বললে, "দরকার পড়লেই ভক্তি উথলে ওঠে। বাবাঠাকুরেরা পায়ের ধুলো নিলে গলে যান। মিনুর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আমার ভক্তিটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে।"

ঘন ঘন শাঁখ বেজে উঠল, উলুর সঙ্গে বর আসার শব্দ এল চার দিক থেকে। কনেকে একটি চেলী-জড়ানো পুটুলির মতো করে এয়োর দল নিয়ে এল ছাঁদনাতলায়। নির্বিঘ্নে কাজ সমাধা হল। বর কনে বাবাজিকে প্রণাম করে অন্দরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল, তখন বাবাজি আশীর্বাদ শেষ করে বিজয়বাবুকে আর সভার সবাইকে বললেন, "মশায়, আমার খবরটা এবারে দিয়ে যাই। পুরুতের কাজ আমার পেশা নয়। আমার যা পেশা সে আপনার সমস্ত দারোগা-কনস্টেবলদের ভালো করেই জানা আছে। এখন আপনাদের পুরুতের দক্ষিণা দেবার সময় এসেছে। সে পর্যন্ত আমার আর সবুর সইবে না। অতএব আপনারা বিদায় করবার আগেই আমি বিদায় নিলেম।"

এই ব'লে সন্ন্যাসী সকলের সামনে দাড়ি গোঁফ টেনে ফেলে তিন লাফে চণ্ডী-মণ্ডপের পাঁচিল ডিঙিয়ে উধাও।

সভার লোকেরা হাঁ করে চেয়ে রইল। বিজয়বাবুর মুখে কথা নেই।

বিয়ের ভোজ শেষ হয়ে গেছে, পাড়াপড়শী গেছে যে যার ঘরে। বরবধূ বাসর ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে। সদু স্বামীকে বললে, "তুমি ভাবছ কী, যেমন করে হোক কাজ তো উদ্ধার হয়ে গেছে। সন্ন্যাসী উধাও হয়ে গিয়ে তোমাদেরই তো কাজ হালকা করে দিয়ে গেল। এখন বাসিবিয়ের আয়োজন করতে হবে, চোর-ডাকাতের পিছনে সময় নষ্ট কোরো না। কিন্তু সেই মেয়েটির কোনো খোঁজ পেলে কি।"

"দুঃখের কথা বলব কী, এখন একটি মেয়ের জায়গায় রোজ আমার থানার সামনে পঁচিশটি মেয়ের আমদানি হচ্ছে চাল কলা নৈবেদ্য নিয়ে। এখন কোন্‌টি যে কে খোঁজ করা শক্ত হয়ে উঠল।"

"সে কী, তোমার দরজায় এত মেয়ের আমদানি তো ভালো নয়। ওখানে তুমি কি বাবাজি সেজে বসেছ নাকি।"

"না, লোকটার চালাকির কথা শোনো একবার, অবাক হবে। একদিন হঠাৎ কিষণলাল এসে খবর দিলে আফিসের সামনের রাস্তায় একটি পাথর বেরিয়েছে। তার গায়ে পাড়ার মেয়েরা এসে সিঁদুর লাগাচ্ছে, চন্দন মাখাচ্ছে ; কেউ চাইতে এসেছে সন্তান, কেউ স্বামীসৌভাগ্য, কেউ আমারই সর্বনাশ। এই ভিড় পরিষ্কার করতে গেলেই খবরের কাগজে মহা হাঁউমাউ করে উঠবে যে এইবার হিন্দুর ধর্ম গেল। আমার হিন্দু পাহারাওয়ালারাও তাকে পাঁচ সিকা করে প্রণামী দেয়। ব্যবসা খুব জমে উঠল। টাকাগুলো কে আদায় করছে অবশেষে সেটার দিকে চোখ পড়ল। একদিন দেখা গেল—না আছে পাথরটা, না আছে টাকার থালা। আর সেই পাগলা গোছের লোকটা সেও তার সাজ বদলে কোথায় যে গা-ঢাকা দিল সে সম্বন্ধে নানা

অদ্ভুত গুজব শোনা যেতে লাগল। মুশকিল এই—হিন্দুধর্মের পাহারাওয়ালারা হাংগার-স্ট্রাইকের ভয় দেখাতে থাকে। এই নিয়ে যদি শান্তিভঙ্গ হয় তা হলে আবার সকলের কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। এখন কোন্ দিক সামলাই! আর এক উৎপাত ঘটেছে, একদিন ছেদীলাল এসে পড়ল পুলিসের থানার দরজায় দড়াম করে। হাঁউমাউ করে বললে যে, ভোলানাথের একশিঙওয়ালা ভৃঙ্গীবাবা ষাঁড়ের মতো গর্জাতে গর্জাতে তাকে এসে তাড়া করেছিল। সে তো কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে সন্ন্যাসী হয়ে। গাছতলায় বসে বসে গাঁজা খাচ্ছে। এখন লোক পাওয়া শক্ত হয়েছে। আর ওর সংগে আমরা পেরে উঠি নে, কেননা মেয়েরা ওর সহায়। ও তাদের সব বশ করে নিয়েছে।”

সদু হেসে বললে, “ওর গল্প যতই শুনি আমারই তো মন টলমল করে ওঠে।”

“দেখো, সর্বনাশ কোরো না যেন।”

“না, তোমার ভয় নেই, আমার এত সৌভাগ্য নয়। মেয়েদের চাতুরী দিয়ে ঘরকন্না চালাতে হয়, সেটা দেশের সেবায় লাগালে ঐ স্ত্রীবুদ্ধি ষোলো-আনা কাজে লাগতে পারে। পুরুষরা বোকা, তারা আমাদের বলে সরলা, অথলা—এই নামের আড়ালেই আমরা সাধ্বীপনা করে থাকি আর ঐ খোকার বাবারা মুগ্ধ হয়ে যায়। আমরা অবলা অথলা, কুকুরের গলায় শিকলের মতো এই খ্যাতি আমরা গলায় পরে থাকি, আর তোমরা আমাদের পিছন পিছন টেনে নিয়ে বেড়াও। তার চেয়ে সত্যি কথা বলো-না কেন—সুযোগ পেলে তোমরাও ঠকাতে জান, সুযোগ পেলে আমরাও ঠকাতে জানি। আমরা এত বোকা নই যে শুধু ঠকবই আর ঠকাব না। বুড়িগুলো বলে থাকে ‘সদু বড়ো লক্ষ্মী’, অর্থাৎ রাঁধতে বাড়তে ঘর নিকোতে সদুর ক্লান্তি নেই। এইটুকু বেড়ার মধ্যে আমাদের সুনাম। দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে আর যাঁরা মানুষের মতো মানুষ তাঁদের হাতে হাতকড়ি পড়ছে, আমরা রেঁধে বেড়ে বাসন মেজে করছি সতীসাধ্বীগিরি! আমরা অলক্ষ্মী হয়ে যদি কাজের মতন একটা-কিছু করতে পারি তা হলে আমাদের রক্ষা, এই আমি তোমাকে বলে রাখলুম। আমাদের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দেখো তো দেখবে—হয়তো আছে কোথাও কিছু কলঙ্কের চিহ্ন, কিন্তু তার সংগে সংগেই আছে জ্বলন্ত আগুনের দাগা। নিছক আরামের খেলার দাগ নয়। মেরেছি, কিন্তু মরেছি তার অনেক আগে। সংসারে মেয়েরা দুঃখের কারবার করতেই এসেছে। সেই দুঃখ কেবল আমি ঘরকন্নার কাজে ফুঁকে দিতে পারব না। আমি চাই সেই দুঃখের আগুনে জ্বালিয়ে দেব দেশের যত জমানো আঁস্তাকুড়। লোকে বলবে না সতী, বলবে না সাধ্বী। বলবে দজ্জাল মেয়ে। এই কলঙ্কের-তিলক-আঁকা ছাপ পড়বে তোমার সদুর কপালে, আর তুমি যদি মানুষের মতো মানুষ হও তবে তার গুমোর বুঝতে পারবে।”

“তোমার মুখে ও রকম কথা আমি ঢের শুনেছি, তার পরে দেখেছি সংসার যেমন চলে তেমনি চলছে। মাঝে মাঝে মন খোলসা করা দরকার, তাই শুনি আর হাভানা চুরুট টানি।”

যাই হোক-না কেন, আমি জানি আমি যাই করি শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে ক্ষমা করবেই আর সেই ক্ষমাই যথার্থ পুরুষ মানুষের লক্ষণ, যেন শ্রীকৃষ্ণের বুকে ভৃগুর পায়ের চিহ্ন। তোমার সেই ক্ষমার কাছেই তো আমি হার মেনে আছি। মিথ্যা

স্তব করব না—পুলিসের কাজে তোমার খবরদারির শেষ নেই, কিন্তু আমাকে তুমি চোখ বুজে বিশ্বাস করে এসেছ, যদিও সব সময়ে সেই বিশ্বাসের যোগ্যতা আমার ছিল না। আমি এই জন্যই তোমাকে ভক্তি করি, আমার ভক্তি শাস্ত্রমতে গড়া নয়।"

"সদু আর কেন, পেট ভরে যা বলবার সে তো বলে গেলে, এখন তোমার ঐ কুকুরটাকে খাওয়াতে যাও, বড্ড চেঁচাচ্ছে—ও আমাকে ঘুমোতে দেবে না। আমি ভাবছি আমাকে এবারে ছুটির দরখাস্ত দিতে হবে।"

সদু হেসে বললে, "তুমি ইন্‌স্‌পেক্টারি ছেড়ে দিয়ে গাছতলায় বাবাজি সেজে বোসো, তোমার আয় যাবে বেড়ে, আমিও তার কিছু বখরা পাব।"

"সব তাতেই তুমি যেমন নিশ্চিন্ত হয়ে থাক, আমার ভালো লাগে না।"

"ও আমার স্বভাব, তোমার খুনী ডাকাতদের জন্য আমি চিন্তা করতে পারব না। একা তোমার চিন্তাতেই আমার দিন চলে গেল। সমস্ত দেশের লোকের হাসিতে যোগ না দিয়ে আমি করব কী। তোমার এই পুলিসের থানায় স্বদেশীদের নিয়ে অনেক চোখের জল বয়ে গেছে, এত দিনে লোকেরা একটু হেসে বাঁচছে। এই জন্যই অনিলবাবুকে সবাই দু হাত তুলে আশীর্বাদ করছে, তুমি ছাড়া। আমি দুশ্চিন্তার ভান করব কী করে বলো দেখি।"

তৃতীয়

"দেখো, সদু, এবারে আমি তোমার শরণাপন্ন।"

সদু বললে, "কবে তুমি আমার শরণাপন্ন নও, শুনি। এই জন্য তো তোমাকে সবাই স্ত্রৈণ বলে। দু জাতের স্ত্রৈণ আছে। এক দল পুরুষ স্ত্রীর জোরের কাছে হার না মেনে থাকতে পারে না, তারা কাপুরুষ। আর এক দল আছে তারা সত্যিকার পুরুষ, তাই তারা স্ত্রীর কাছে অসংশয়ে হার মেনেই নেয়। তারা অবিশ্বাস করতে জানেই না, কেননা তারা বড়ো। এই দেখো-না আমার কত বড়ো সুবিধে—তোমাকে যখন খুশি যেমন খুশি ঠকাতে পারি, তুমি চোখ বুজে সব নাও।"

"সদু, কী পষ্ট পষ্ট তোমার কথাগুলি গো!"

"সে তোমারই গুণে কর্তা, সে তোমারই গুণে।"

"এবারে কাজের কথাটা শুনে নাও—ও-সব আলোচনা পরে হবে। এবারে একটা সরকারী কাজে তোমার সাহায্য চাই। নইলে আমার আর মান থাকে না। পুলিসের লোকরা নিশ্চয়ই জেনেছে এই কাছাকাছি কোথায় এক জায়গায় একজন মেয়ে আছে। সেই এখানকার খবর কেমন করে পায় আর ওকে সাবধানে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। সে আচ্ছা জাঁহাবাজ মেয়ে। ওরা বলছে সে এই পাড়ারই কোনো বিধবা মেয়ে। যেমন করে হোক তার সন্ধান নিয়ে তার সঙ্গে তোমাকে ভাব করতে হবে।"

সদু বললে, "শেষকালে আমাকেও তোমাদের চরের কাজে লাগাবে! আচ্ছা, তাই হবে, মেয়েকে দিয়ে মেয়ে ধরার কাজে লাগা যাবে, নইলে তোমার মুখ রক্ষা হবে না। আমি এই ভার নিলুম। দুদিনের মধ্যে সমস্ত রহস্য ভেদ হয়ে যাবে।"

"পরশু হল শিবরাত্রি, খবর পেয়েছি অনিল ডাকাত সিদ্ধেশ্বরী তলার মন্দিরে জপতপ করে রাত কাটাবে। তার মনে তো ভয়-ডর কোথাও নেই। এ দিকে ও ভারি

ধার্মিক কিনা, ও মেয়েটা থাকবে তার কিরকম তান্ত্রিক মতের স্ত্রী হয়ে।"

"তোমরা পুলিসের লোক আড়ালে আড়ালে থেকো, আমি ধরে দেব। কিন্তু রাত্রি একটার আগে যেয়ো না। তাড়াহুড়ো করলে সব ফসকে যাবে।"

অমাবস্যার রাত, একটা বেজেছে। পায়ের-জুতো-খোলা দুটো একটা লোক অন্ধকারে নিঃশব্দে এ দিকে ও দিকে বেড়াচ্ছে। বিজয়বাবু মন্দিরের দরজার কাছে।

একজন চুপিচুপি তাঁকে ইশারা করে ডাকলে, আস্তে আস্তে বললে, "সেই ঠাকরুনটি আজ মন্দিরের মধ্যে এসেছেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। তিনি বিখ্যাত কোনো যোগিনী ভৈরবী। দিনের বেলা কারো চোখেই পড়েন না। রাত্রি একটার পর শুনেছি নটরাজের সঙ্গে তাঁর নৃত্য। একটা লোক দৈবাৎ দেখেছিল, সে পাগল হয়ে বেড়াচ্ছে চারি দিকে। হুজুর, আমরা মন্দিরে গিয়ে ঐ ঠাকরুনের গায়ে হাত দিতে পারব না। এমন-কি চোখে দেখতেও পারব না—এ বলে রাখছি। আমরা ব্যারাকে ফিরে যাব ঠিক করেছি। আপনি একলা যা পারেন করবেন।"

একে একে তারা সবাই চলে গেল। নিঃশব্দ—বিজয়বাবু যত বড়ো একেলে লোক হোন-না কেন, তাঁর যে ভয় করছিল না এ কথা বলা যায় না। তাঁর বুক দুর্‌দুর্‌ করছে তখন। দরজার কাছ থেকে মেয়েলি গলায় গুন্‌ গুন্‌ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে : ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং!

বিজয়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। ভাবলেন কী করা যায়। এক সময়ে সাহসে ভর করে দিলেন দরজায় ধাক্কা। ভাঙা দরজা খুলে গেল। ভিতরে একটি মাটির প্রদীপ মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছে, দেখলেন শিবলিঙ্গের সামনে তাঁর স্ত্রী জোড়-হাত করে বসে, আর অনিল এক পাশে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। নিজের স্ত্রীকে দেখে সাহস হল মনে, বললেন—"সদু, অবশেষে তোমার এই কাজ!"

"হ্যাঁ, আমিই সেই মেয়ে যাকে তোমরা এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছ। নিজের পরিচয় দেব ব'লেই আজ এসেছি এখানে। তুমি তো জান আমাদের দেশে দৈবাৎ দুই একজন সত্যিকার পুরুষ দেখা দেয়। তোমাদের একমাত্র চেষ্টা এঁদের একেবারে নির্জীব করে দিতে। আমরা দেশের মেয়েরা যদি এই-সব সুসন্তানদের আপন প্রাণ দিয়ে রক্ষা না করি তবে আমাদের নারীধর্মকে ধিক্‌। তোমার অগোচরে নানা কৌশলে এতদিন এই কাজ করে এসেছি। যাঁর কোনো হুকুম কখনও ঠেলতে পারি নি, সকলের চেয়ে কঠিন আজকের এই হুকুম—এও আমাকে মানতে হবে। এই আমার দেবতাকে আজ তোমার হাতেই ছেড়ে দিয়ে আমি সরে দাঁড়াব। জানি আমার চেয়ে বড়ো রক্ষক তাঁর মাথার উপরে আছেন। দু দিন পরেই সমাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কী রকম নিন্দায় ভরে উঠবে তা আমি জানি। এই লাঞ্ছনা আমি মাথায় করে নেব। কখনো মনে কোরো না চাতুরী করে তোমার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে এই মানুষকে আলাদা নালিশে জড়াতে পারবে। আমি চিরদিন তাঁর পিছন পিছন থেকে শাস্তির শেষ পালা পর্যন্ত যাব। তুমি সুখে থেকো। তোমার ভয় নেই, ইচ্ছা করলেই তুমি নূতন সঙ্গিনী পাবে। আর যা কর আমাকে দয়া কোরো না। আমার চেয়ে অনেক বড়ো যাঁরা তাঁদের তুমি তা কর নি। সেই নিষ্ঠুরতার অংশ নিয়ে মাথা উঁচু করেই আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নেব। প্রাণপণে তোমার সেবা করেছি ভালোবেসে, প্রাণপণে তোমাকে

কল্পনা করেছি কর্তব্যবোধে, এই তোমাকে জানিয়ে গেলুম। এর পরে হয়তো আর সময় পাব না।"

সদুর কথায় বাধা দিয়ে অনিল বলে উঠল, "বিজয়বাবু, আজ আমি ধরা দেব ব'লেই স্থির করে এসেছিলুম। আমার আর কোনো ভাবনা নেই। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আপনি সদুর কথায় ভড়কাবেন না। ও একটি অসাধারণ মেয়ে, জন্মেছে আমাদের দেশে, একেবারে খাপছাড়া সমাজে। খুব ভালো করেই চিনেছি আমি ওকে, চিনি বলেই আপনাকে বলছি ও নিষ্কলঙ্ক। যে কঠিন কর্তব্য আমরা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়েছি সেখানে ভালোবাসার কোনো ফাঁক নেই, আছে কেবল আপনাকে জলাঞ্জলি দেওয়া। বিশ্বসংসারের লোক সদু সম্বন্ধে কিছু জানবে না, আপনার কোনো ভয় নেই। ওকে নিয়ে আপনি মন্দিরের সুরঙ্গ পথ দিয়ে বাড়ি ফিরুন। আর আমি অন্য দিক থেকে পুলিসের হাতে এখুনি ধরা দিচ্ছি। এই সঙ্গে একটি কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি, আমাকে আপনারা বাঁধতে পারবেন না। রবিঠাকুরের একটা গান আমার কণ্ঠস্থ—

আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি
তোদের আছে!"

হঠাৎ গেয়ে উঠল বিদেশী গলায়, মন্দিরের ভিত থর থর করে কেঁপে উঠল গলার জোরে। অবাক হয়ে গেলেন ইন্‌স্‌পেক্টার বাবু।

"এই গান অনেক বার গেয়েছি, আবার গাইব, তার পরে চলব আফগানিস্থানের রাস্তা দিয়ে, যেমন করে হোক পথ করে নেব। আপনাদের সঙ্গে এই আমার কথা রইল। আর পনেরো দিন পরে খবরের কাগজে বড়ো বড়ো অক্ষরে বের হবে, অনিল বিপ্লবী পলাতক। আজ প্রণাম হই।"

হঠাৎ বিজয়ের হাত কেঁপে উঠল, টর্চটা মাটিতে পড়ে গেল হাত থেকে। মুখের উপরে দুই হাত চেপে বসে পড়লেন। প্রদীপটাও দমকা বাতাসে শেষ হয়ে গেছে আগেই।

১১-২১ জুন ১৯৪১ আষাঢ় ১৩৪৮

প্রগতিসংহার

এই কলেজে ছেলেমেয়েদের মেলামেশা বরঞ্চ কিছু বাড়াবাড়ি ছিল। এরা প্রায় সবাই ধনী ঘরের—এরা পয়সার ফেলাছড়া করতে ভালোবাসে: নানা রকম বাজে খরচ করে মেয়েদের কাছে দরাজ হাতের নাম কিনত। মেয়েদের মনে ঢেউ তুলত, তারা বুক ফুলিয়ে বলত—'আমাদেরই কলেজের ছেলে এরা'। সরস্বতী পুজো তারা এমনি ধুম করে করত যে, বাজারে গাঁদা ফুলের আকাল পড়ে যেত। এ ছাড়া চোখ-টেপাটেপি ঠাট্টা তামাসা চলেইছে। এই তাদের মাঝখানে একটা সংঘ তেড়েফুঁড়ে উঠে মেলামেশা ছারখার করে দেবার জো করলে।

সংঘের হাল ধরে ছিল সুরীতি। নাম দিল 'নারীপ্রগতিসংঘ'। সেখানে পুরুষের ঢোকবার দরজা ছিল বন্ধ। সুরীতির মনের জোরের ধাক্কায় এক সময়ে যেন পুরুষ-বিদ্রোহের একটা হাওয়া উঠল। পুরুষরা যেন বেজাত, তাদের সঙ্গে জলচল বন্ধ। কদর্য তাদের ব্যাভার।

এবার সরস্বতী পুজোতে কোনো ধুমধাম হল না। সুরীতি ঘরে ঘরে গিয়ে মেয়েদের বলেছে জাঁক-জমকের হুল্লোড়ে তারা যেন এক পয়সা না দেয়। সুরীতির স্বভাব খুব কড়া, মেয়েরা তাকে ভয় করে। তা ছাড়া নারীপ্রগতিসংঘে দিব্যি গালিয়ে নিয়েছে যে-কোনো পালপার্বণে তারা কিছুমাত্র বাজে খরচ করতে পারবে না। তার বদলে যাদের পয়সা আছে পুজো-আর্চায় তারা যেন দেয় গরিব ছাত্রীদের বেতনসাহায্য বাবদ কিছু-কিঞ্চিৎ।

ছেলেরা এই বিদ্রোহে মহা খাপা হয়ে উঠল। বললে, 'তোমাদের বিয়ের সময় আমরা গাধার পিঠে বরকে চড়িয়ে যদি না নিয়ে আসি, তবে আমাদের নাম নেই।'

মেয়েরা বললে, 'এ রকম জুড়ি গাধা, একটার পিঠে আর-একটা, আমাদের সংসারে কোনো কাজে লাগবে না। সে দুটি আমরা তোমাদের দরবারে গলায় মালা দিয়ে আর রক্তচন্দন কপালে পরিয়ে পাঠিয়ে দেব। তাদের আদর করে দলে টেনে নিয়ো।'

যাই হোক, এ কলেজে ছেলেতে মেয়েতে একটা ছাড়াছাড়ি হবার জো হল। ছেলেরা কেউ কাছে এসে কথা বলতে গেলেই মেয়েরা নাক তুলে বলতে আরম্ভ করলে 'এ বড্ড গায়ে-পড়া'। ছেলেদের কেউ কেউ মেয়েদের পাশে বসে সিগারেট খেত—এখন সেটা তাদের মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে ফেলে দেয়। ছেলেদের উপর রূঢ় ব্যবহার করা ছিল যেন মেয়েদের আত্মগরিমা। কোনো ছেলে বাসে মেয়েদের জন্য জায়গা করে দিতে এগিয়ে এলে বিদ্রোহিণী বলে উঠত—'এইটুকু অনুগ্রহ করবার কী দরকার ছিল! ভিড়ের মধ্যে আমরা কারও চেয়ে স্বতন্ত্র অধিকারের সুযোগ চাই নে।'

ওদের সংঘের একটা বুলি ছিল—ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে বুদ্ধিতে কম। দৈবাৎ প্রায়ই পরীক্ষার ফলে তার প্রমাণ হতে থাকত। কোনো পুরুষ যদি পরীক্ষায় তাদের ডিঙিয়ে প্রথম হত, তা হলে সে একটা চোখের জলের ব্যাপার হয়ে উঠত। এমন-কি তার প্রতি বিশেষ পক্ষপাত করা হয়েছে, স্পষ্ট করে এমন নালিশ জানাতেও সংকোচ করত না।

আগে ক্লাসে যাবার সময়ে মেয়েরা খোঁপায় দুটো ফুল গুঁজে যেত, বেশভূষার কিছু-না-কিছু বাহার করত। এখন তা নিয়ে এদের সংঘে ধিক্ ধিক্ রব ওঠে। পুরুষের মন ভোলাবার জন্যে মেয়েরা সাজবে, গয়না পরবে, এ অপমান মেয়েরা অনেকদিন ইচ্ছে করে মেনে নিয়েছে, কিন্তু আর চলবে না। পরনে বেরঙা খদ্দর চলিত হল। সুরীতি তার গয়নাগুলো দিদিমাকে দিয়ে বললে—'এগুলো তোমার দান-খয়রাতে লাগিয়ে দিয়ো, আমার দরকার নেই, তোমার পুণ্যি হবে।' বিধাতা যাকে যে রকম রূপ দিয়েছেন তার উপরে রঙ চড়ানো অসভ্যতা। এ-সমস্ত মধ্য আফ্রিকার শোভা পায়। মেয়েরা যদি তাকে বলত—'দেখ্ সুরীতি, অত বাড়াবাড়ি করিস নে। রবি ঠাকুরের চিত্রাঙ্গদা পড়েছিস তো? চিত্রাঙ্গদা লড়াই করতে জানত, কিন্তু পুরুষের মন ভোলাবার বিদ্যে তার জানা ছিল না, সেখানেই তার হার হল।' শুনে সুরীতি জ্বলে উঠত, বলত—'ও আমি মানি নে। এমন অপমানের কথা আর হতে পারে না।'

এদের মধ্যে কোনো কোনো মেয়ের আত্মবিদ্রোহ দেখা দিল। তারা বলতে লাগল, মেয়ে-পুরুষের এই রকম ঘেঁষাঘেঁষি তফাত করে দেওয়া এখনকার কালের উলটো চাল। বিরুদ্ধবাদিনীরা বলত, 'পুরুষেরা যে বিশেষ করে আমাদের সমাদর করবে, আমাদের চৌকি এগিয়ে দেবে, আমাদের রুমাল কুড়িয়ে দেবে, এই তো যা হওয়া উচিত। সুরীতি তাকে অপমান বলবে কেন। আমরা তো বলি এই আমাদের সম্মান। পুরুষদের কাছ থেকে আমাদের সেবা আদায় করা চাই। একদিন ছিল যখন মেয়েরা ছিল সেবিকা, দাসী। এখন পুরুষেরা এসে মেয়েদের স্তবস্তুতি করে—এই সমাদর, সুরীতি যাই বলুক, আমরা ছাড়তে পারব না। এখন পুরুষ আমাদের দাস।'

এই রকম গোলমাল ভিতরে ভিতরে জেগে উঠল সকলের মধ্যে। বিশেষ করে সলিলার এই নীরস ক্লাসের রীতি ভালো লাগত না। সে ধনী ঘরের মেয়ে, বিরক্ত হয়ে চলে গেল দার্জিলিঙে ইংরেজি কলেজে। এমনি করে দুটো-একটি মেয়ে খসে যেতেও শুরু করেছিল, কিন্তু সুরীতির মন কিছুতেই টলল না।

মেয়েদের মধ্যে, বিশেষত সুরীতির, এই গুমর ছেলেদের অসহ্য হয়ে উঠল। তারা নানা রকম করে ওর উপরে উৎপাত শুরু করলে। গণিতের মাস্টার ছিলেন খুব কড়া। তিনি কোনো রকম ছ্যাবলামি সহ্য করতেন না। তাঁরই ক্লাসে একদিন মহা গোলমাল বেধে গেল। সুরীতির ডেস্কে তার বাপের হাতের অক্ষরে লেখা লেফাফা—খুলবামাত্রই তার মধ্য থেকে একটা আরসোলা ফর্‌ফর্ করে বেরিয়ে এল। মহা চেঁচামেচি বেধে গেল। সে জন্তুটা ভয় পেয়ে পাশের মেয়ের খোঁপার উপরে আশ্রয় নিলে। সে এক বিষম হাঁউমাউ কাণ্ড। গণিতের মাস্টার বেণীবাবু খুব কড়া কটাক্ষপাত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু আর্‌সোলার ফর্‌ফরানির উপরে তাঁর শাসন খাটবে কী করে। সেই চেঁচামেচিতে ক্লাসের মান-রক্ষা আর হয় না। আর-একদিন—সুরীতির নোট বইয়ের পাতায় পাতায় ছেলেরা নস্যি দিয়েছে ভরে, খুব কড়া নস্যি। বইটা খুলতেই ঘোরতর হাঁচির ছোঁয়াচে উৎপাত বেধে গেল। সে গুঁড়ো পাশের মেয়েদের নাকে ঢুকে পড়ল। সকলকে নাকের জলে চোখের জলে করে দিলে। আর ঘন ঘন হ্যাঁচ্চো শব্দে পড়াশুনা বন্ধ হয় আর-কি। মাস্টার

আড়চোখে দেখেন—দেখে তাঁরও হাসি চাপা শক্ত হয়ে ওঠে।

একদিন রব উঠল কোনো মহারাজা কলেজ দেখতে আসবেন, বিশেষ করে মেয়েদের ক্লাস। কানে কানে গুজব রটল—তাঁর এই দেখতে আসার লক্ষ্য ছিল বধূ জোগাড় করা। একদল মেয়ে ভান করলে যে, তাদের যেন অপমান করা হচ্ছে। কিন্তু ওরই ভিতরে দেখা গেল সেদিনকার খোঁপায় কিছু শিল্পকাজ, সেদিনকার পাড়ে কিছু রঙ। লোকটি তো যে সে নয়, সে ক্রোড়পতি। মেয়েদের মনের মধ্যে একটা হুড়োমুড়ি ছিল সকলের আগে তাঁর চোখে পড়বার। তার পরে ক্লাস তো হয়ে গেল। একটা দূত এসে জানালে যে তাঁর পছন্দ ঐ সুরীতিকেই। সুরীতি জানে, এ রাজার তহবিলে অগাধ টাকার জোরে পুরুষ জাতির সমস্ত নীচতা কোথায় তলিয়ে যায়। ভান করলে এ প্রস্তাবে সে যে কেবল রাজি নয় তা নয়, বরঞ্চ সে অপমানিত বোধ করছে। কেননা, মেয়েদের ক্লাস তো গোহাটা নয়, যে, ব্যবসায়ী এসে গোরু বাছাই করে নিয়ে যাবে। কিন্তু মনে-মনে ছিল আর-একটু সাধ্যসাধনার প্রত্যাশা। ঠিক এমন সময়ে খবর পাওয়া গেল, মহারাজা তাঁর সমস্ত পাগড়ি-টাগড়ি-সমেত অন্তর্ধান করেছেন। তিনি বলে গিয়েছেন, বাঙালি মেয়েদের মধ্যে একটাকেও বাছাই করে নেবার যোগ্য তিনি দেখলেন না। এর চেয়ে তাঁদের পশ্চিমের বেদের মেয়েরাও অনেক ভালো।

ক্লাস-সুদ্ধ মেয়েরা একেবারে জ্বলে উঠল। বললে, কে বলেছিল তাঁকে আমাদের এই অপমান করতে আসতে! সেদিন তাদের সাজসজ্জার মধ্যে যে একটু কারিগরি দেখা গিয়েছিল সেটা লজ্জা দিতে লাগল। এমন সময়ে প্রকাশ পেল—মহারাজটি তাদেরই একজন পুরোনো ছাত্র। বাপ-মায়ের বিষয়-সম্পত্তি জুয়ো খেলে উড়িয়ে দিয়ে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে টাকাওয়ালা মেয়ে। মেয়েদের মাথা হেঁট হয়ে গেল। সুরীতি বার বার করে বলতে লাগল—সে একটুও বিশ্বাস করে নি। সে প্রথম থেকেই কেবল যে বিশ্বাস করে নি তা নয়, সে কলেজের প্রিন্সিপালকে এই পড়ার ব্যাঘাত নিয়ে নালিশ করতে পর্যন্ত তৈরি ছিল। হয়তো ছিল, কিন্তু তার তো কোনো দলিল পাওয়া গেল না।

এমনি করে একটার পর আর-একটা উৎপাত চলতেই লাগল। এই সমস্ত উপদ্রবের প্রধান পাণ্ডা ছিল নীহার।

একবার ডিগ্রি নিতে যাচ্ছিল যখন সুরীতি, তার পাশে এসে নীহার বললে, "কী গো গরবিনী, মাটিতে যে পা পড়ছে না!"

সুরীতি মুখ বেঁকিয়ে বললে, "দেখুন, আপনি আমার নাম নিয়ে ঠাট্টা করবেন না।"

নীহার বললে, "তুমি বিদুষী হয়ে একে ঠাট্টা বলো, এ যে বিশুদ্ধ ক্লাসিক্যাল সাহিত্য থেকে কোটেশন করা! এমন সম্মান কি আর কোনো নামে হতে পারে!"

"আমাকে আপনার সম্মান করতে হবে না।"

"সম্মান না করে বাঁচি কী করে! হে বিকচকমলায়তলোচনা, হে পরিণত-শরচ্চন্দ্রবদনা, হে স্মিতহাস্যজ্যোৎস্নাবিকাশিনী, তোমাকে আদরের নামে ডেকে যে তৃপ্তির শেষ হয় না।"

"দেখুন, আপনি আমাকে রাস্তার মধ্যে যদি এরকম অপমান করেন, আমি

প্রিন্সিপালের কাছে নালিশ করব।"

"নালিশ করতে হয় কোরো, তবে অপমানের একটা সংজ্ঞা ঠিক করে দিয়ো। এর মধ্যে কোন্ শব্দটা অপমানের? বলো তো আমি আরও চড়িয়ে দিতে পারি। বলব—হে নিখিলবিশ্বহৃদয়-উন্মাদিনী"—

রাগে লাল হয়ে সুরীতি দ্রুতপদে চলে গেল। তার পিছন দিকে খুব একটা হাসির ধ্বনি উঠল। ডাক পড়তে লাগল, "ফিরে চাও হে রোষারুণলোচনা, হে যৌবনমদমত্তমাতঙ্গিনী"—

তার পরের দিন ক্লাস আরম্ভ হবার মুখেই রব উঠল, "হে সরস্বতী-চরণকমল-দল-বিহারিণী-গুঞ্জনমত্ত-মধুব্রতা, পূর্ণচন্দ্রনিভাননী"—

সুরীতি রেগে গিয়ে পাশের ঘরে সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট্ গোবিন্দবাবুকে বললে, "দেখুন, আমাকে কথায় কথায় অপমান করলে আমি থাকব না।"

তিনি এসে বললেন, ক্লাসের ছেলেদের, "তোমরা কেন ওকে এত উপদ্রব করছ।"

নীহার বললে, "এ'কে কি উপদ্রব বলে! যদি কেউ নালিশ করতে পারে, তবে পূর্ণচন্দ্রই করতে পারতেন যে তাঁকে আমি ঠাট্টা করেছি। আমাদের ক্লাসে যোগেশ বলে—ওগুলো বাদ দিয়ে শুধু ওকে নিভাননা বললেই হয়, কেননা কলমের নিভের মতন সুতীক্ষ্ণ ওর মুখ। শুনে বরং আমি বলেছিলুম 'ছি, এরকম করে বলতে নেই, ওঁরা হলেন বিদুষী'—কথাটা চাপা দিয়েছিলুম। কিন্তু পূর্ণচন্দ্রনিভাননাতে আমি তো দোষের কিছু দেখি নি।"

ছেলেরা বললে, "আপনি বিচার করে দেখুন, আমরা মনের আনন্দে আউড়ে গিয়েছিলুম—হে সরস্বতীচরণকমলদলবিহারিণী গুঞ্জনমত্তমধুব্রতা! প্রথমত কথাটা নিন্দার নয়, দ্বিতীয়ত সেটা যে ওরই প্রতি লক্ষ করে বলা এত বড়ো অহংকার ওর কেন হল। ঘরেতে আরও তো ছাত্রী আছে, তারা তো ছিল খুশি।"

সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট্ বললেন, "অস্থানে অসময়ে এ রকম সম্ভাষণগুলো লোকে পরিহাস বলেই নেয়। দরকার কী বলা!"

"দেখুন সার, মন যখন উতলা হয়ে ওঠে তখন কি সময় অসময়ের বিচার থাকে। তা ছাড়া আমাদের এ সম্ভাষণ যদি পরিহাসই হয়, তা হলে তো এটা কেউ গায়ে না নিয়ে হেসে উড়িয়ে দিতে পারতেন। আর, আপনার কলেজে এত বড়ো বড়ো সব বিদুষী, এ'রা কি পরিহাসের উত্তরে পরিহাস করতেও জানেন না? এদের দন্তরুচিকৌমুদীতে কি হাস্যমাধুরী জাগবে না। তা হলে আমরা সব তৃষিত সুধাপিপাসু পুরুষগুলো বাঁচি কী করে।"

এই রকম কথা-কাটাকাটির পালা চলত যখন তখন। সুরীতি অস্থির হয়ে উঠল—তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য আর টেকে না। সে ঠাট্টা করতে জানে না, অথচ কড়া জবাব করবার ভাষাও তার আসে না। সে মনে-মনে জ্বলে পুড়ে মরে। সুরীতির এই দুর্গতিতে দয়া হয় এমন পুরুষও ছিল ওদের মধ্যে, কিন্তু তারা ঠাঁই পায় না।

আর-একদিন হঠাৎ কী খেয়াল গেল, যখন সুরীতি কলেজে আসছিল তখন রাস্তার ওপার থেকে নীহার তাকে ডেকে উঠল—'হে কনকচম্পকদামগৌরী!'

লোকটা পড়াশুনা করেছে বিস্তর, তার ভাষা শিখবার যেন একটা নেশা ছিল। যখন তখন অকারণে সংস্কৃত আওড়াত, তার ধ্বনিটা লাগত ভালো। পাঠ্য পুস্তকের

পড়ায় সুরীতি তাকে এগিয়ে থাকত, মুখস্থ বিদ্যেয় সে ছিল ওস্তাদ। কিন্তু পাঠ্যের বাইরে ছিল নীহারের প্রচুর পড়াশুনো। সুরীতি একেবারে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে ছুটে গোবিন্দবাবুর ঘরে গিয়ে বললে, "রাস্তায় ঘাটে এরকম সম্ভাষণ আমার সহ্য হয় না।"

নীহার বললে, "আমার অন্যায় হয়েছে। কাল থেকে ওকে বলব 'মসীপুঞ্জিত-বর্ণা', কিন্তু সেটা কি বড্ড বেশি রিয়ালিস্টিক হবে না।"

সুরীতি প্রায় কাঁদতে কাঁদতে ছুটে চলে গেল।

নীহারের চরিত্রে একটা নিরেট নিষ্ঠুরতা ছিল। যথোপযুক্ত ঘুষ দিয়ে তবে সেটাকে শান্ত করা যেত। এ কথা সবাই জানে।

একদিন নীহার জাপানি খেলনা—কট্‌কটে-আওয়াজ-করা কাঠের ব্যাঙ দিয়ে ছেলেদের পকেট ভর্তি করে আনলে। ঠিক যে সময়ে প্লেটোর দার্শনিকতত্ত্ব ব্যাখ্যা করবার পালা এল—সমস্ত ক্লাসে কট্‌কট্ কট্‌কট্ শব্দ পড়ে গেল। শব্দটা যে কোথা থেকে হচ্ছে তাও স্পষ্ট বোঝা শক্ত। সেদিন কট্‌কটে ব্যাঙের শব্দে প্লেটোর কণ্ঠ একেবারে ডুবে গেল। শেষকালে খানাতল্লাসি করে দেখা গেল, দশটা কাঠের ব্যাঙ সুরীতির ডেস্কের ভিতরে।

সে চীৎকার করে বলে উঠল, "এ কখনো আমার নয়। অন্যরা কেউ আমার ডেস্কে দুষ্টুমি করে ভরে রেখেছে।"

ছেলেরা মহা তেরিয়া হয়ে বলে উঠল, "আমাদের উপর এ রকম অন্যায় দোষ দিলে আমরা সইতে পারব না। এ রকম ছেলেমানুষি খেলবার শখ কখনো পুরুষদের হতেই পারে না। এ-সমস্ত মেয়েদেরই খুকির ধর্ম।"

কিছুক্ষণ ক্লাসঘর নীরব। তারপরে হঠাৎ অপর কোণ থেকে অদ্ভুত শব্দ উঠল, একসঙ্গে সব ছেলেরা পা ঘষতে শুরু করেছে সিমেন্টের উপর। এতগুলো জুতো ঘষার শব্দে একটা উৎকট কন্‌সার্টের সৃষ্টি হল। ক্রমশ মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, সুরীতির পক্ষে আর চুপ করে বসে থাকা চলল না। কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে রইল, এক সময়ে হঠাৎ দড়াম করে একটা শব্দ হওয়ার পর ছেলেরা উঃ হুঃ শব্দে সানাইয়ের আওয়াজ নকল করতে লাগল।

তখন সুরীতি বলে উঠল, "সার, অনুগ্রহ করে ওদের গোলমাল করতে বারণ করবেন কি। আমরা এখানে পড়তে এসেছি, কিন্তু সংগীতচর্চার জায়গা এটা নয়। যদি কারও ক্লাস করতে ইচ্ছে না হয়, তবে ক্লাস ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।"

সঙ্গে সঙ্গে চার দিক থেকে রব উঠল 'শেম' 'শেম' এবং লেফ্‌ট্ রাইট মার্চ্ করতে করতে ছেলেরা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সেদিনকার মতো ক্লাস আর জমল না। মেয়েরা যখন ক্লাস থেকে বেরিয়ে কমন্‌রুমে বসেছে, একটি পিয়ন এসে খবর দিল—সুরীতিকে সেক্রেটারি বাবু ডেকেছেন। মেয়েরা সব কানাকানি করতে লাগল। সুরীতি সেক্রেটারির ঘরে ঢুকে দেখলে সেখানে তাদের সেদিনকার প্রফেসার বসে আছেন আর নীহার পাশে দাঁড়িয়ে। সেক্রেটারি সুরীতিকে বললেন, "ছেলেরা, নালিশ করেছে তোমার আজকের ব্যবহারে তারা অপমান বোধ করেছে। তোমার দিক থেকে যদি কিছু বলবার থাকে তো বলো।"

সুরীতি বললে, "সার, ওরা যে প্রফেসারের সঙ্গে অপমানজনক ব্যবহার করল,

আমাদের সঙ্গে অভদ্রতা করল, তাতে কি আমাদেরই অপমান হয় না!"

যাই হোক, সেক্রেটারি ও প্রফেসার উভয় পক্ষের কথা শুনে বিবেচনা করে নীহারকে বললেন, "সব দিক থেকে প্রমাণ হল ক্লাসে তুমিই প্রথম উৎপাত শুরু কর এবং তুমিই ছিলে দলের অগ্রণী। এ ক্ষেত্রে তোমারই ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

নীহার বললে, "সার, আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয়, তার চেয়ে অনুমতি দিন— আমি কলেজ ছাড়তে রাজি।"

সেক্রেটারি বললেন,-"তোমাকে সময় দিচ্ছি, ভালো করে ভেবে দেখো।"

সে তথাস্তু ব'লে খাতাপত্র নিয়ে উঠে পড়ল। সেদিন ক্লাসের শেষে ছেলেমেয়েরা বাইরে নেমে দেখলে, নোটিশ-বোর্ডে নোটিশ টাঙানো রয়েছে— আজ থেকে পুজোর ছুটি আরম্ভ হল।

সলিলার সঙ্গে নীহারের ছিল বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। সে নীহারকে প্রস্তাব করলে, "তুমিও দার্জিলিঙে চলে এসো।"

নীহার বললে, "আমার বাপ তো তোমার বাপের মতো লক্ষপতি নয়। দার্জিলিঙে পড়াশুনা করি এমন শক্তি কোথায়।"

শুনে সে মেয়ে বললে, "আচ্ছা, আমি দেব তোমার খরচ।"

নীহারের এই গুণ ছিল, তাকে যা দেওয়া যায় তা পকেটে করে নিতে একটুও ইতস্তত করে না। সে ধনী ছাত্রীর খরচায় দার্জিলিঙে যাওয়াই ঠিক করলে।

এ দিকে যত অহংকারই সুরীতির থাক্, নীহারের মনের টান যে সলিলার দিকে সেটা তার মনে বাজল। নীহার ধনী মেয়ের আশ্রয়ে সুরীতির প্রতি আরও বেশি যখন-তখন যা-তা বলতে লাগল। সে বলত, 'পুরুষের কাছে ভদ্রতার দাবি করতে পারে সেই মেয়েরাই, যারা মেয়েদের স্বভাব ছাড়ে নি।' পুরুষের কাছ থেকে এই অনাদর সুরীতি ঘাড় বেঁকিয়ে অগ্রাহ্য করবার ভান করত। কিন্তু তার মনের ভিতরে এই নীহারের মন পাবার ইচ্ছাটা যে ছিল না, তা বলা যায় না। নীহার ধনী মেয়ের কাছ থেকে মাসোহারা নিত, তাতে ছেলেরা কেউ কেউ ঈর্ষা ক'রে ও কেউ কেউ ঘৃণা ক'রে নীহারকে বলত 'ঘরজামাই'। নীহার তা গ্রাহ্যই করত না। তার দরকার ছিল পয়সার। যতক্ষণ পর্যন্ত তার ফিরপোর দোকানে বন্ধুদের নিয়ে পিক্‌নিক্ করবার খরচ চলত এবং নানা প্রকার সৌখিন ও দরকারী জিনিসের সরবরাহ সুসাধ্য হয়ে উঠত, ততদিন পর্যন্ত সেই মেয়ের আশ্রিত হয়ে থাকতে তার কিছুমাত্র সংকোচ হত না। দরকার হলেই নীহার সলিলার কাছে টাকা চেয়ে পাঠাত। এই-যে তার একজন পুরুষ পোষ্য ছিল, তার প্রতিভার উপর সলিলার খুব বিশ্বাস ছিল। মনে করেছিল এক সময়ে নীহার একটা মস্ত নাম করবে। সমস্ত বিশ্বের কাছে তার প্রতিভার যে একটা অকুণ্ঠিত দাবি আছে— নীহার সেটার আভাস দিতে ছাড়ত না, সলিলাও তা মেনে নিত।

সলিলা দার্জিলিঙে থাকতে থাকতেই এক সময়ে তার ডবল নিমোনিয়া হল, চিকিৎসার ত্রুটি হল না, কিন্তু যমদূতকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলে না। মৃত্যু হল সলিলার। শেষ পর্যন্ত নীহার তাকিয়েছিল হয়তো উইলে তার নামে কিছু দিয়ে

যাবে। কিন্তু তার কোনো চিহ্ন মিলল না, তখন সলিলার উপরে বিষম রাগ হল। বিশেষত যখন সে শুনল সলিলা তার দাসীকে দিয়ে গিয়েছে একশো টাকা, তখন সে সলিলাকে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠল— কী রকম নীচতা। ইংরেজিতে যাকে বলে 'মীন্‌নেস'!

যে মেয়েকে নীহার স্তব করে বলত 'জগদ্ধাত্রী', পুরুষ-পালনের পালা তিনি সাঙ্গ করে নীহারকে নৈরাশ্যের ধাক্কা দিয়ে চলে গেলেন। দার্জিলিঙের খরচ আর তো চলে না, আবার নীহার ফিরে এল কলকাতার মেসে। ছেলেরা একদফা খুব হাসাহাসি করে নিলে। নীহারের তাতে গায়ে বাজত না। ওর আশা ছিল দ্বিতীয় আর-একটি জগদ্ধাত্রী জুটে যাবে। একজন বিখ্যাত উড়িয়া গণৎকার তাকে গনে বলেছিল কোনো বড়ো ধনী মেয়ের প্রসাদ সে লাভ করবে। সেই গণনাফলের দিকে উৎসুকচিত্তে সে তাকিয়ে রইল। জগদ্ধাত্রী কোন্‌ রাস্তা দিয়ে যে এসে পড়েন তা তো বলা যায় না। অত্যন্ত টানাটানির দশায় পড়ে গেল।

দার্জিলিঙ-ফেরত নীহারকে হঠাৎ কলেজে দেখে সুরীতিও আশ্চর্য হয়ে গেল— বললে, "আপনি হিমালয় থেকে ফিরলেন কবে।"

নীহার হেসে বললে, "ওগো সীমন্তিনী, কিছু হাওয়া খেয়ে আসা গেল। কালিদাস বলেছেন : মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ। ঐ দেবদারুর চেয়ে ঢের বেশি কাঁপিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশের রোগা হাড়, এই দেখো-না কম্বল জড়িয়ে ভুটিয়া সেজে এসেছি।"

সুরীতি হেসে বললে, "কেন, সাজ তো মন্দ হয় নি আর আপনার চেহারাও তো দেখাচ্ছে ভালো, ভুটিয়া বকুর সাজসজ্জাতে আপনাকে ভালো মানিয়েছে।"

নীহার বললে, "খুশি হলুম, এখন তো আর শীতের থেকে রক্ষা পাবার কথা ভাবতে হবে না, এখন কী দিয়ে তোমাদের চোখ ভোলাব এইটেই হচ্ছে সমস্যা— সেটা আরো শক্ত কথা।"

সুরীতি। তা চোখ ভোলাবার দরকার কী। পুরুষ মানুষের সহায়তা করে তার বিদ্যে, তুমি জান তো তোমার মধ্যে তার অভাব নেই।

নীহার। এইটে তোমাদের ভুল। নিউটন বলেছিলেন তিনি জ্ঞানসমুদ্রের নুড়ি কুড়িয়েছেন, আমি তো কেবলমাত্র বালুর কণা সংগ্রহ করেছি।

সুরীতি। বাস্‌ রে! এবার পাহাড় থেকে দেখছি তুমি অনেকখানি বিনয় সংগ্রহ করে এনেছ, এ তো তোমার কখনো ছিল না।

নীহার। দেখো, এ শিক্ষা আমার স্বয়ং কালিদাসের কাছ থেকে, যিনি বলেছেন : প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্‌বাহুরিব বামনঃ।

সুরীতি। এই-সব সংস্কৃত শ্লোকের জ্বালায় হাঁপিয়ে উঠলুম, একটু বিশুদ্ধ বাংলা বলো।

এর মধ্যে আশ্চর্যের কথা এই যে, সলিলার মৃত্যুর উল্লেখমাত্রও সে করল না।

এ দিকে ক্লাসের ঘণ্টার শব্দে দুজনকেই দ্রুত চলে যেতে হল, কিন্তু সংস্কৃত শ্লোকগুলো সুরীতির মনের ভিতরে দেবদারুর মতোই মুহুর্মুহু কম্পিত হতে লাগল। সে দেখেছে আজকাল নীহারের ঠাট্টা আর সংস্কৃত শ্লোক আওড়ানো অন্য মেয়েরা খুব পছন্দ করে। তারা তাই নিয়ে ওকে প্রশংসা করে, তাই সেও বুঝেছে

়তে পরিহাসের কড়া স্বাদ নেই। সেইজন্য ইদানীং নীহারের হঠাৎ সংস্কৃত আবৃত্তিকে ভালো লাগাবার চেষ্টা করত।

এমন সময়ে একটা ঘটনা ঘটল যাতে ছাত্রছাত্রীদের মিলেমিশে কাজ করবার একটা সুযোগ হল। সর্বন ইউনিভার্সিটির একজন ভারতপ্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত আসবেন কলকাতা ইউনিভার্সিটির নিমন্ত্রণে। ছেলেমেয়েরা ঠিক করেছিল পথের মধ্যে থেকে তারাই তাঁকে অভ্যর্থনা করার গৌরব সর্বপ্রথমে লুটে নেবে। আগে ভাগে অধ্যাপকের কাছে গিয়ে তাঁকে ওদের প্রগতিসংঘের নিমন্ত্রণ জানালে। তিনি ফরাসী সৌজন্যের আতিশয্যে এই নিমন্ত্রণ স্বীকার করে নিলেন। তার পরে কে তাঁর অভিনন্দন পাঠ করবে, সেটা ওরা ভালো করে ভেবে পাচ্ছিল না। কেউ বলছিল সংস্কৃত ভাষায় বলবে, কেউ বলছিল ইংরেজি ভাষাই যথেষ্ট—কিন্তু তা কারও মনঃপূত হল না। ফরাসী পণ্ডিতকে ফরাসী ভাষায় সম্মান প্রকাশ করাই উপযুক্ত ঠিক করল। কিন্তু করবে কে। বাইরের লোক পাওয়া যায়, কিন্তু সেটাতে তো সম্মান রক্ষা হয় না। এমন সময়ে নীহাররঞ্জন বলে উঠল, "আমার উপর যদি ভার দাও, আমি কাজ চালিয়ে নিতে পারব এবং ভালো রকমেই পারব।"

মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল যাদের নীহাররঞ্জনের উপর বিশেষ টান, তারা বললে—দেখা যাক্-না।

সুরীতির বিশেষ আপত্তি, সে বললে—একটা ভাঁড়ামি হয়ে উঠবে।

দলের মেয়েরা বললে, "আমরা বিদেশী, যদি বা আমাদের ভাষায় কিংবা বক্তৃতায় কোনো ত্রুটি হয় তা ফরাসী অধ্যাপক নিশ্চয়ই হাসিমুখে মেনে নেবেন। ওঁরা তো আর ইংরেজ নন, ইংরেজরা বিদেশীদের কাছ থেকেও নিজেদের আদবকায়দার স্খলন সইতে পারেন না, এমন ওঁদের অহংকার। কিন্তু ফরাসীদের তা নয়, বরঞ্চ যদি কিছু অসম্পূর্ণ থাকে সেটা হেসে গ্রহণ করবে। দেখা যাক্-না—নীহাররঞ্জনের বিদ্যের দৌড় কতদূর। শুনেছি ও ঘরে বসে বসে ফরাসী পড়ার চর্চা করে।"

নীহাররঞ্জনের বাড়ি চন্দননগরে। প্রথম বয়সে ফরাসী স্কুলে তার বিদ্যাশিক্ষা, সেখানে ওর ভাষার দখল নিয়ে খুব খ্যাতি পেয়েছিল, এ-সব কথা ওর কলকাতার বন্ধু-মহল কেউ জানত না। যা হোক, সে তো কোমর বেঁধে দাঁড়ালো। কী আশ্চর্য, অভিনন্দন যখন পড়ল তার ভাষার ছটায় ফরাসী পণ্ডিত এবং তাঁর দু-একজন অনুচর আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁরা বললেন—এ রকম মার্জিত ভাষা ফ্রান্সের বাইরে কখনো শোনেন নি। বললেন, এ ছেলেটির উচিত প্যারিসে গিয়ে ডিগ্রি অর্জন করে আসা। তার পর থেকে ওদের কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীতে ধন্য ধন্য রব উঠল; বললে—কলেজের নাম রক্ষা হল, এমন-কি কলকাতা ইউনিভার্সিটিকেও ছাড়িয়ে গেল খ্যাতিতে।

এর পরে নীহারকে অবজ্ঞা করা কারও সাধ্যের মধ্যে রইল না। 'নীহারদা' 'নীহারদা' গুঞ্জনধ্বনিতে কলেজ মুখরিত হয়ে উঠল। প্রগতিসংঘের প্রথম নিয়মটা আর টেকে না। পুরুষদের মন ভোলাবার জন্য রঙিন কাপড়-চোপড় পরা ওরা ত্যাগ করেছিল। সব-প্রথমে সে নিয়মটি ভাঙল সুরীতি, রঙ লাগালো তার আঁচলায়। আগেকার বিরুদ্ধ ভাব কাটিয়ে নীহাররঞ্জনের কাছে ঘেঁষতে তার সংকোচ বোধ হতে লাগল, কিন্তু সে সংকোচ বুঝি টেকে না।

দেখলে অন্য মেয়েরা সব তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কেউ বা ওকে চায়ে নিমন্ত্রণ করছে, কেউ বা বাঁধানো টেনিসন এক সেট দান করে ওর ডেস্কের মধ্যে উপহার রেখে যাচ্ছে। কিন্তু সুরীতি পড়ছে পিছিয়ে। একজন মেয়ে নীহারকে যখন নিজের হাতের কাজ-করা সুন্দর একটি টেবিল-ঢাকা দিলে, তখন সুরীতির প্রথম মনে বিঁধল, ভাবল, 'আমি যদি এই-সব মেয়েলি শিল্পকার্যের চর্চা করতাম'। সে যে কোনোদিন সূচের মুখে সুতো পরায় নি, কেবল বই পড়েছে। সেই তার পাণ্ডিত্যের অহংকার আজ তার কাছে খাটো হয়ে যেতে লাগল। 'কিছু-একটা করতে পারতুম যেটাতে নীহারের চোখ ভুলতে পারত'—সে আর হয় না। অন্য মেয়েরা তাকে নিয়ে কত সহজে সামাজিকতা করে। সুরীতির খুব ইচ্ছে সেও তার মধ্যে ভরতি হতে পারত যদি, কিন্তু কিছুতেই খাপ খায় না। তার ফল হল এই—তার আত্মনিবেদন অন্য মেয়েদের চেয়েও আরও যেন জোর পেয়ে উঠল। সে নীহারের জন্য কোনো অছিলায় নিজের কোনো একটা ক্ষতি করতে পারলে কৃতার্থ হত। একেবারে প্রগতি-সংঘের পালের হাওয়া বদলে গেল।

অন্য মেয়েরা ক্রমে নিয়মিতভাবে তাদের পড়াশুনায় লেগে গেল, কিন্তু সুরীতি তা পেরে উঠল না। একদিন ডেস্কের উপর থেকে দৈবাৎ নীহারের ফাউন্‌টেনপেনটি মেঝের উপর গড়িয়ে পড়েছিল, সর্বাগ্রে সেটা সে তুলে ওকে দিলে। এর চেয়ে অবনতি সুরীতির আর কোনোদিন হয় নি। একদিন নীহার বক্তৃতায় বলেছিল—তার মধ্যে ফরাসী নাট্যকারের কোটেশন ছিল—'সব সুন্দর জিনিসের একটা অবগুণ্ঠন আছে, তার উপরে পুরুষদৃষ্টির হাওয়া লাগলে তার সৌকুমার্য নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের দেশে মেয়েরা যে পারতপক্ষে পুরুষদের কাছে দেখা দিত না, তার প্রধান কারণ এই যে, দেখা দেওয়ার দ্বারা মেয়েদের মূল্য কমে যায়। তাদের কমনীয়তার উপরে দাগ পড়তে থাকে।' অন্য মেয়েরা এই কথা নিয়ে বিরুদ্ধ তর্কে উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারা বললে, এমনতরো করে ঢেকেঢুকে কমনীয়তা রক্ষা করবার চেষ্টা করা অত্যন্ত বিড়ম্বনা। সংসারে পরুষস্পর্শ, কী স্ত্রী, কী পুরুষ, সকলেরই পক্ষে সমান আবশ্যক। আশ্চর্য এই, আর কেউ নয়, স্বয়ং সুরীতি উঠে নীহারের কথার সমর্থন করলে।

এই এক সর্বনের ধাক্কায় তার চালচলন সম্পূর্ণ বদলে যাবার জো হল। এখন সে পরামর্শ নিতে যায় নীহারের কাছে। যখন শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক সিনেমাতে দেখানো হয়, তখন তাও কি মেয়েরা কোনো পুরুষ অভিভাবকের সঙ্গে গিয়ে দেখে আসতে পারে না। নীহার কড়া হুকুম জারি করলে—তাও না। কোনোক্রমে নিয়মের ব্যতিক্রম হলে নিয়ম আর রক্ষা করা যায় না।

প্রত্যেকবারেই সুরীতি ভালো কিছু দেখবার থাকলে সিনেমাতে যেত। এখন তার কী হল! এত বড়ো আত্মত্যাগ তো কল্পনা করা যায় না. এমন-কি আজকালকার দিনে যে সামাজিক নিমন্ত্রণে স্ত্রীপুরুষের এক সঙ্গে খাওয়াদাওয়া চলত, সেখানে সে যাওয়া ছেড়ে দিলে। সনাতনীরা খুব তার প্রশংসা করতে লাগল। প্রগতিসংঘ থেকে সে নিজেই আপনার নাম কাটিয়ে নিলে।

সুরীতি চাকরি নেবে, নীহারের অনুমতি চাইল—স্কুলে পুরুষ ছাত্র খুব ছোটো বয়সের হলেও তাদের পড়ানো চলে কি না।

নীহার বললে, না, তাও চলে না। তার ফল হল সে অর্ধেক মাইনে স্বীকার করে মাস্টারি নিয়ে বললে, তার বাকি বেতন থেকে ছেলেদের আলাদা পড়াবার লোক রাখা হোক। স্কুলের সেক্রেটারিবাবু অবাক।

সুরীতির মনের টান ক্রমশ দুঃসহ হয়ে উঠতে লাগল। এক সময়ে কোনো রকম করে আভাস দিয়েছিল, তাদের বিয়ে হতে পারে কি না। একদিন যে সমাজের নিয়মকে সুরীতি মানত না, সেই সমাজের নিয়ম অনুসারে শুনতে পেল ওদের বিয়ে হতে পারে না কোনোমতেই। অথচ এই পুরুষের আনুগত্য রক্ষা করে চিরকাল মাথা নিচু করে চলতে পারে তাতে অপরাধ নেই, কেননা বিধাতার সেই বিধান।

প্রায়ই সে শুনতে পেত— নীহারের অবস্থা ভালো নয়, পড়বার বই তাকে ধার করে পড়তে হয়। তখন সুরীতি নিজের জলপানি থেকে ওকে যথেষ্ট সাহায্য করতে লাগল। নীহারের তাতে কোনো লজ্জা ছিল না। মেয়েদের কাছ থেকে পুরুষদের যেন অর্ঘ্য নেবার অধিকার আছে। অথচ তার বিদ্যার অভিমানের অন্ত ছিল না। একবার একটি কলেজে বাংলা অধ্যাপকের পদ খালি ছিল। সুরীতির অনুরোধে নীহারকে সে পদে গ্রহণ করবার প্রস্তাবে অনুকূল আলোচনা চলছিল। তাতে নীহারের নাম নিয়ে কমিটিতে এই আলোচনায় তার অহংকারে ঘা লাগল।

সুরীতি নীহারকে বললে, "এ তোমার অন্যায় অভিমান। স্বয়ং ভাইসরয় নিযুক্ত করবার সময়েও কাউন্সিলের মেম্বারদের মধ্যে তা নিয়ে কথাবার্তা চলে।"

নীহার বললে, "তা হতে পারে, কিন্তু আমাকে যেখানে গ্রহণ করবে সেখানে বিনা তর্কেই গ্রহণ করবে। এ না হলে আমার মান বাঁচবে না। আমি বাংলা ভাষায় এম. এ.তে সব-প্রথম পদবী পেয়েছি। আমি অমন করে কমিটি থেকে ঝাঁট দিয়ে নেওয়া পদ নিতে পারব না।"

এ পদ যদি নিত তা হলে সুরীতির কাছ থেকে অর্থসাহায্যের প্রয়োজন চলে যেত নীহারের। পদকে সে অগ্রাহ্য করলে, কিন্তু এই প্রয়োজনকে না। সুরীতির জলখাবার প্রায় বন্ধ হয়ে এল। বাড়ির লোকে ওর ব্যবহারে এবং চেহারায় অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠল।

ছেলেবেলা থেকেই ওর শরীর ভালো নয়, তার উপরে এই কষ্ট করা— এ তপস্যা কার জন্য সে কথা যখন তারা ধরতে পারলে তখন তারা নীহারকে গিয়ে বললে, "হয় তুমি একে বিবাহ করো, নয় এর সঙ্গ ত্যাগ করো।"

নীহার বললে, "বিবাহ করা তো চলবেই না— আর ত্যাগের কথা আমাকে বলছেন কেন, সঙ্গ ইচ্ছে করলেই তো তিনি ত্যাগ করতে পারেন, আমার তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই।"

সুরীতি সে কথা জানত। সে জানত নীহারের কাছে তার কোনো মূল্যই নেই, নিজের সুবিধাটুকু ছাড়া। সেই সুবিধাটুকু বন্ধ হলে তাকে অনায়াসে পথের কুকুরের মতো খেদিয়ে দিতে পারে। এ জেনেও যত রকমে পারে সুবিধে দিয়ে, বই কিনে দিয়ে, নতুন খদ্দরের থান তাকে উপহার দিয়ে, যেমন করে পারে তাকে এই সুবিধার স্বার্থবন্ধনে বেঁধে রাখলে। অন্য গতি ছিল না ব'লে এই অসম্মান সুরীতি স্বীকার করে নিলে।

এক সময়ে মফস্বলে বেশি মাইনের প্রিন্সিপালের পদ পেয়েছিল। তখন তার

কেবল এই মনের ভিতরে বাজত, 'আমি তো খুব আরামে আছি, কিন্তু তিনি তো ওখানে গরিবের মতো পড়ে থাকেন—এ আমি সহ্য করব কী করে।' অবশেষে একদিন বিনা কারণে কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় অল্প বেতনে এক শিক্ষয়িত্রীর পদ নিলে। সেই বেতনের বারো-আনা যেত নীহাররঞ্জনের পেট ভরাতে, তার শখের জিনিস কিনে দিতে। এই ক্ষতিতেই ছিল তার আনন্দ। সে জানত মন ভোলাবার কোনো বিদ্যে তার জানাই ছিল না। এই কারণেই তার ত্যাগ এমন অপরিমিত হয়ে উঠল। এই ত্যাগেই সে অন্য মেয়েদের ছাড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। তা ছাড়া আজকাল উলটো প্রগতির কথা সে ক্রমাগত শুনে আসছে যে, মেয়েরা পুরুষের জন্য ত্যাগ করবে আপনাকে এইটাই হচ্ছে বিধাতার বিধান। পুরুষের জন্য যে মেয়ে আপনাকে না উৎসর্গ করে সে মেয়েই নয়। এই-সমস্ত মত তাকে পেয়ে বসল।

কলকাতায় যে বাসা সে ভাড়া করল খুব অল্প ভাড়ায়—স্যাঁৎসেতে, রোগের আড্ডা। তার ছাদে বের হবার জো নেই, কলতলায় কেবলই জল গড়িয়ে পড়ছে। তার উপরে যা কখনো জীবনে করে নি তাই করতে হল—নিজের হাতে রান্না করতে আরম্ভ করল। অনেক বিদ্যে তার জানা ছিল, কিন্তু রান্নার বিদ্যে সে কখনো শেখে নি। যে অখাদ্য অপথ্য তৈরি হত, তা দিয়ে জোর করে পেট ভরাত। কিন্তু স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ল। মাঝে মাঝে কাজ কামাই করতে বাধ্য হল ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে। এত ঘন ঘন ফাঁক পড়ত কাজে যে অধ্যক্ষরা তাকে আর ছুটি মঞ্জুর করতে পারলেন না। তখন ধরা পড়ল ভিতরে ভিতরে তাকে ক্ষয়রোগে ধরেছে। বাসা থেকে তাকে সরানো দরকার, আত্মীয়-স্বজনরা মিলে তাকে একটা প্রাইভেট হাসপাতালে ভরতি করে দিলে। কেউ জানত না কিছু টাকা তার গোপনে সঞ্চিত ছিল, সেই টাকা থেকেই তার বরাদ্দ-মতন দেয় নীহারের কাছে গিয়ে পৌঁছত। নীহার সব অবস্থাই জানত, তবু তার প্রাপ্য ব'লে এই টাকা সে অনায়াসে হাত পেতে নিতে লাগল। অথচ একদিন হাসপাতালে সুরীতিকে দেখতে যাবার অবকাশ সে পেত না। সুরীতি উৎসুক হয়ে থাকত জানলার দিকে কান পেতে, কিন্তু কোনো পরিচিত পায়ের ধ্বনি কোনোদিন কানে এল না। অবশেষে একদিন তার টাকার থলি নিঃশেষে শেষ হয়ে গেল আর সেই সঙ্গে তার চরম আত্মনিবেদন।

১১-২১ জুন ১৯৪১ আশ্বিন ১৩৪৮

শেষ পুরস্কার

খসড়া

সেদিন আই. এ. এবং ম্যাট্রিক ক্লাসের পুরস্কারবিতরণের উৎসব। বিমলা ব'লে এক ছাত্রী ছিল, সুন্দরী ব'লে তার খ্যাতি। তারই হাতে পুরস্কারের ভার। চার দিকে তার ভিড় জমেছে আর তার মনে অহংকার জমে উঠেছে খুব প্রচুর পরিমাণে। একটি মুখচোরা ভালোমানুষ ছেলে কোণে দাঁড়িয়ে ছিল। সাহস করে একটু কাছে এল যেই, দেখা গেল তার পায়ে হয়েছে ঘা, ময়লা কাপড়ের ব্যান্‌ডেজ জড়ানো। তাকে দেখে বিমলা নাক তুলে বললে, "ও এখানে কেন বাপু, ওর যাওয়া উচিত হাসপাতালে।"

ছেলেটি মন-মরা হয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল। বাড়িতে গিয়ে তার স্কুলঘরের কোণে বসে কাঁদছে, জলখাবারের থালা হাতে তার দিদি এসে বললে, "ও কী হচ্ছে জগদীশ, কাঁদছিস কেন।"

তখন তার অপমানের কথা শুনে মৃণালিনী রাগে জ্বলে উঠল; বললে, "ওর বড়ো রূপের অহংকার, একদিন ঐ মেয়ে যদি তোর এই পায়ের তলায় এসে না বসে তা হলে আমার নাম মৃণালিনী নয়।"

এই গেল ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। দিদি এখন ইন্‌স্পেকট্রেস্ অব স্কুল্‌স্। এসেছেন পরিদর্শন করতে। তিনি তাঁর ভাইয়ের এই দুঃখের কাহিনী মেয়েদের শোনালেন। শুনে মেয়েরা ছি ছি করে উঠল; বললে, কোনো মেয়ে কখনও এমন নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে না— তা সে যত বড়ো রূপসীই হোক-না কেন।

মৃণালিনী মাসি বললেন, জগতে যা সত্য হওয়া উচিত নয়, তাও কখনও কখনও সত্য হয়।

আজ আবার পুরস্কারবিতরণের উৎসব। আরম্ভ হবার কিছু আগেই মৃণালিনী মাসি মেয়েদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, সেদিন সেই-যে ভালোমানুষ ছেলেটিকে অপমান করে বিদায় করা হয়েছিল, সে আজ কী হলে তোমরা খুশি হও।"

কেউ বললে, কবি; কেউ বললে, বিপ্লবী; বাইরে থেকে নিমন্ত্রিত একটি মেয়ে বললে, হাইকোর্টের জজ।

ঘণ্টা বাজলো, সবাই প্রস্তুত হয়ে বসল। যিনি প্রাইজ দেবেন তিনি এসে প্রবেশ করলেন, জগদীশপ্রসাদ— হাইকোর্টের জজ। তিনি বসতেই সেই নিমন্ত্রিত মেয়ে যে মজঃফরপুর মেয়েদের হাইস্কুলে তৃতীয় বর্গে অঙ্ক কষাত, সে এসে প্রণাম করে তাঁর পায়ে ফুলের মালা দিয়ে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে দিলে। জগদীশপ্রসাদ শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "এ আবার কী রকমের সম্মান!"

মাসি বললেন, "নতুন রকমের বলছ কেন— অতি পুরাতন। আমাদের দেশে দেবতাদের পুজো আরম্ভ হয় পায়ের দিক থেকে। আজ তোমার সেই পদের সম্মান করা হল।'

এইবার পরিচয়গুলো সমাপ্ত করা যাক। এই মেয়েটি এককালকার রূপসী ছাত্রী

বিমলাদিদি, বোর্ডিং স্কুলের অহংকারের সামগ্রী ছিল। পিতার মৃত্যুর পরে আজ ক্লাস পড়াবার ভার নিয়েছে; আর এ দিক ও দিক থেকে কিছু টিউশানি করে কাজ চালায়। যে পা'কে একদিন সে ঘৃণা করেছিল সেই পা'কে অর্ঘ্য দেবার জন্য আজ তার বিশেষ করে নিমন্ত্রণ হয়েছে। মৃণালিনী মাসি—সেই সেদিনকার দিদি। আর সেই তার ভাই জগদীশপ্রসাদ, হাইকোর্টের জজ।

এটা গল্পের মতো শোনাচ্ছে, কিন্তু কখনও কখনও গল্পও সত্যি হয়। আর যে লোকটা এই ইতিহাসটা লিখছে সে হচ্ছে অবিনাশ, সেদিন সে লম্বা লম্বা পা ফেলে বড়ো বড়ো পরীক্ষা ডিঙিয়ে চলত—সেও উপস্থিত ছিল সেই প্রথমবারকার পুরস্কারের উৎসবে। সেদিন নানারকম খেলা হয়েছিল—হাইজাম্প্, লম্বা দৌড়, রশি-টানাটানি—তার মধ্যে এই অবিনাশ আবৃত্তি করেছিল রবিঠাকুরের 'পঞ্চনদীর তীরে'। কবিতার ছন্দের জোর যত, তার গলায় ছিল জোর চার গুণ বেশি। সেই-ই সব চেয়ে বড়ো পুরস্কার পেয়েছিল। আজ সে জজের অনুগ্রহে সেরেস্তাদারের সেরেস্তায় হেড-কেরানির পদ পেয়েছে।

৫-৬ মে ১৯৪১ শ্রাবণ ১৩৪৯

মুসলমানীর গল্প

খসড়া

তখন অরাজকতার চরগুলো কণ্টকিত করে রেখেছিল রাষ্ট্রশাসন, অপ্রত্যাশিত অত্যাচারের অভিঘাতে দোলায়িত হত দিন রাত্রি। দুঃস্বপ্নের জাল জড়িয়েছিল জীবনযাত্রার সমস্ত ক্রিয়াকর্মে, গৃহস্থ কেবলই দেবতার মুখ তাকিয়ে থাকত, অপদেবতার কাল্পনিক আশঙ্কায় মানুষের মন থাকত আতঙ্কিত। মানুষ হোক আর দেবতাই হোক কাউকে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল, কেবলই চোখের জলের দোহাই পাড়তে হত। শুভ কর্ম এবং অশুভ কর্মের পরিণামের সীমারেখা ছিল ক্ষীণ। চলতে চলতে পদে পদে মানুষ হোঁচট খেয়ে খেয়ে পড়ত দুর্গতির মধ্যে।

এমন অবস্থায় বাড়িতে রূপসী কন্যার অভ্যাগম ছিল যেন ভাগ্যবিধাতার অভিসম্পাত। এমন মেয়ে ঘরে এলে পরিজনরা সবাই বলত 'পোড়ারমুখী বিদায় হলেই বাঁচি'। সেই রকমেরই একটা আপদ এসে জুটেছিল তিন-মহলার তালুকদার বংশীবদনের ঘরে।

কমলা ছিল সুন্দরী, তার বাপ মা গিয়েছিল মারা, সেই সঙ্গে সেও বিদায় নিলেই পরিবার নিশ্চিন্ত হত। কিন্তু তা হল না, তার কাকা বংশী অত্যন্ত স্নেহে অত্যন্ত সতর্কভাবে এতকাল তাকে পালন করে এসেছে।

তার কাকী কিন্তু প্রতিবেশিনীদের কাছে প্রায়ই বলত, "দেখ্ তো ভাই, মা বাপ ওকে রেখে গেল কেবল আমাদের মাথায় সর্বনাশ চাপিয়ে। কোন্ সময় কী হয় বলা যায় না। আমার এই ছেলেপিলের ঘর, তারই মাঝখানে ও যেন সর্বনাশের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছে, চারি দিক থেকে কেবল দুষ্টলোকের দৃষ্টি এসে পড়ে। ঐ একলা ওকে নিয়ে আমার ভরাডুবি হবে কোন্‌দিন, সেই ভয়ে আমার ঘুম হয় না।"

এতদিন চলে যাচ্ছিল এক রকম করে. এখন আবার বিয়ের সম্বন্ধ এল। সেই ধুমধামের মধ্যে আর তো ওকে লুকিয়ে রাখা চলবে না। ওর কাকা বলত. "সেই জন্যই আমি এমন ঘরে পাত্র সন্ধান করছি যারা মেয়েকে রক্ষা করতে পারবে।"

ছেলেটি মোচাখালির পরমানন্দ শেঠের মেজো ছেলে। অনেক টাকার তবিল চেপে বসে আছে, বাপ ম'লেই তার চিহ্ন পাওয়া যাবে না। ছেলেটি ছিল বেজায় শৌখিন— বাজপাখি উড়িয়ে, জুয়ো খেলে. বুলবুলের লড়াই দিয়ে খুব বুক ঠুকেই টাকা ওড়াবার পথ খোলসা করেছিল। নিজের সম্পদের গর্ব ছিল তার খুব, অনেক ছিল মাল। মোটামোটা ভোজপুরী পালোয়ান ছিল, সব বিখ্যাত লাঠিয়াল। সে বলে বেড়াত, সমস্ত তল্লাটে কোন্ ভগ্নীপতির পুত্র আছে যে ওর গায়ে হাত দিতে পারে। মেয়েদের সম্বন্ধে সে ছেলেটি বেশ একটু শৌখিন ছিল— তার এক স্ত্রী আছে, আর-একটি নবীন বয়েসের সন্ধানে সে ফিরছে। কমলার রূপের কথা তার কানে উঠল। শেঠবংশ খুব ধনী, খুব প্রবল। ওকে ঘরে নেবে এই হল তাদের পণ।

কমলা কেঁদে বলে, "কাকামণি, কোথায় আমাকে ভাসিয়ে দিচ্ছ।"

"তোমাকে রক্ষা করবার শক্তি থাকলে চিরদিন তোমাকে বুকে করে রাখতুম

জানো তো মা!”

বিবাহের সম্বন্ধ যখন হল তখন ছেলেটি খুব বুক ফুলিয়ে এল আসরে, বাজনা-বাদ্দি সমারোহের অন্ত ছিল না। কাকা হাত জোড় করে বললে, “বাবাজি, এত ধুমধাম করা ভালো হচ্ছে না, সময় খুব খারাপ।”

শুনে সে আবার ভগ্নিপতির পুত্রদের আস্পর্ধা করে বললে, “দেখা যাবে কেমন সে কাছে ঘেঁষে।”

কাকা বললে, “বিবাহ-অনুষ্ঠান পর্যন্ত মেয়ের দায় আমাদের, তার পর মেয়ে এখন তোমার—তুমি ওকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছবার দায় নাও। আমরা এ দায় নেবার যোগ্য নই, আমরা দুর্বল।”

ও বুক ফুলিয়ে বললে, “কোনো ভয় নেই।”

ভোজপুরী দারোয়ানরা গোঁফ চাড়া দিয়ে দাঁড়ালে সব লাঠি হাতে।

কন্যা নিয়ে চললেন বর সেই বিখ্যাত মাঠের মধ্যে, তালতড়ির মাঠ। মধুমোল্লার ছিল ডাকাতের সর্দার। সে তার দলবল নিয়ে রাত্রি যখন দুই প্রহর হবে, মশাল জ্বালিয়ে হাঁক দিয়ে এসে পড়ল। তখন ভোজপুরীদের বড়ো কেউ বাকি রইল না। মধু-মোল্লার ছিল বিখ্যাত ডাকাত, তার হাতে পড়লে পরিত্রাণ নেই।

কমলা ভয়ে চতুর্দোলা ছেড়ে ঝোঁপের মধ্যে লুকোতে যাচ্ছিল এমন সময় পিছনে এসে দাঁড়ালো বৃদ্ধ হবির খাঁ, তাকে সবাই পয়গম্বরের মতোই ভক্তি করত। হবির সোজা দাঁড়িয়ে বললে, “বাবাসকল তফাত যাও, আমি হবির খাঁ।”

ডাকাতরা বললে, “খাঁ সাহেব, আপনাকে তো কিছু বলতে পারব না কিন্তু আমাদের ব্যবসা মাটি করলেন কেন।”

যাই হোক তাদের ভঙ্গ দিতেই হল।

হবির এসে কমলাকে বললে, “তুমি আমার কন্যা। তোমার কোনো ভয় নেই, এখন এই বিপদের জায়গা থেকে চলো আমার ঘরে।”

কমলা অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে উঠল। হবির বললে, “বুঝেছি তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে, মুসলমানের ঘরে যেতে সংকোচ হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো—যারা যথার্থ মুসলমান, তারা ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেও সম্মান করে, আমার ঘরে তুমি হিন্দুবাড়ির মেয়ের মতোই থাকবে। আমার নাম হবির খাঁ। আমার বাড়ি খুব নিকটে, তুমি চলো, তোমাকে আমি খুব নিরাপদে রেখে দেব।”

কমলা ব্রাহ্মণের মেয়ে, সংকোচ কিছুতে যেতে চায় না। সেই দেখে হবির বলল, “দেখো, আমি বেঁচে থাকতে এই তল্লাটে কেউ নেই যে তোমার ধর্মে হাত দিতে পারে। তুমি এসো আমার সঙ্গে, ভয় কোরো না।”

হবির খাঁ কমলাকে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। আশ্চর্য এই, মুসলমান বাড়ির আট-মহলা বাড়ির এক মহলে আছে শিবের মন্দির আর হিন্দুয়ানির সমস্ত ব্যবস্থা।

একটি বৃদ্ধ হিন্দু ব্রাহ্মণ এল। সে বললে, “মা, হিন্দুর ঘরের মতো এ জায়গা তুমি জেনো, এখানে তোমার জাত রক্ষা হবে।”

কমলা কেঁদে বললে, “দয়া করে কাকাকে খবর দাও তিনি নিয়ে যাবেন।”

হবির বললে, “বাছা, ভুল করছ, আজ তোমার বাড়িতে কেউ তোমাকে ফিরে

নেবে না, তোমাকে পথের মধ্যে ফেলে দিয়ে যাবে। নাহয় একবার পরীক্ষা করে দেখো।”

হবির খাঁ কমলাকে তার কাকার খিড়কির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বললে, “আমি এখানেই অপেক্ষা করে রইলুম।”

বাড়ির ভিতর গিয়ে কাকার গলা জড়িয়ে ধরে কমলা বললে, “কাকামণি, আমাকে তুমি ত্যাগ কোরো না।”

কাকার দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

কাকী এসে দেখে বলে উঠল, “দূর করে দাও, দূর করে দাও অলক্ষ্মীকে। সর্বনাশিনী, বেজাতের ঘর থেকে ফিরে এসেছিস, আবার তোর লজ্জা নেই!”

কাকা বললে, “উপায় নেই মা! আমাদের যে হিন্দুর ঘর, এখানে তোমাকে কেউ ফিরে নেবে না, মাঝের থেকে আমাদেরও জাত যাবে।”

মাথা হেঁট করে রইল কমলা কিছুক্ষণ, তার পর ধীর পদক্ষেপে খিড়কির দরজা পার হয়ে হবিরের সঙ্গে চলে গেল। চিরদিনের মত বন্ধ হল তার কাকার ঘরে ফেরার কপাট।

হবির খাঁর বাড়িতে তার আচার ধর্ম পালন করবার ব্যবস্থা রইল। হবির খাঁ বললে, “তোমার মহলে আমার ছেলেরা কেউ আসবে না, এই বুড়ো ব্রাহ্মণকে নিয়ে তোমার পুজো-আর্চা, হিন্দুঘরের আচার-বিচার, মেনে চলতে পারবে।”

এই বাড়ি সম্বন্ধে পূর্বকালের একটু ইতিহাস ছিল। এই মহলকে লোকে বলত রাজপুতানীর মহল। পূর্বকালের নবাব এনেছিলেন রাজপুতের মেয়েকে কিন্তু তাকে তার জাত বাঁচিয়ে আলাদা করে রেখেছিলেন। সে শিবপুজো করত, মাঝে মাঝে তীর্থভ্রমণেও যেত। তখনকার অভিজাত বংশীয় মুসলমানেরা ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুকে শ্রদ্ধা করত। সেই রাজপুতানী এই মহলে থেকে যত হিন্দু বেগমদের আশ্রয় দিত, তাদের আচার-বিচার থাকত অক্ষুন্ন। শোনা যায় এই হবির খাঁ সেই রাজপুতানীর পুত্র। যদিও সে মায়ের ধর্ম নেয় নি, কিন্তু সে মাকে পুজো করত অন্তরে। সে মা তো এখন আর নেই, কিন্তু তার স্মৃতি-রক্ষাকল্পে এই রকম সমাজবিতাড়িত অত্যাচারিত হিন্দু মেয়েদের বিশেষভাবে আশ্রয় দান করার ব্রত তিনি নিয়েছিলেন।

কমলা তাদের কাছে যা পেল তা সে নিজের বাড়িতে কোনোদিন পেত না। সেখানে কাকী তাকে ‘দূর ছাই’ করত—কেবলই শুনত সে অলক্ষ্মী, সে সর্বনাশী, সঙ্গে এনেছে সে দুর্ভাগ্য, সে ম’লেই বংশ উদ্ধার পায়। তার কাকা তাকে লুকিয়ে মাঝে মাঝে কাপড়-চোপড় কিছু দিতেন, কিন্তু কাকীর ভয়ে সেটা গোপন করতে হত। রাজপুতানীর মহলে এসে সে যেন মহিষীর পদ পেলে। এখানে তার আদরের অন্ত ছিল না। চারি দিকে তার দাসদাসী, সবাই হিন্দু ঘরের ছিল।

অবশেষে যৌবনের আবেগ এসে পৌঁছল তার দেহে। বাড়ির একটি ছেলে লুকিয়ে লুকিয়ে আনাগোনা শুরু করল কমলার মহলে, তার সঙ্গে সে মনে-মনে বাঁধা পড়ে গেল।

তখন সে হবির খাঁকে একদিন বললে, “বাবা, আমার ধর্ম নেই, আমি যাকে ভালোবাসি সেই ভাগ্যবান্‌ই আমার ধর্ম। যে ধর্ম চিরদিন আমাকে জীবনের সব

ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে, অবজ্ঞার আঁস্তাকুড়ের পাশে আমাকে ফেলে রেখে দিয়েছে, সে ধর্মের মধ্যে আমি তো দেবতার প্রসন্নতা কোনোদিন দেখতে পেলুম না। সেখানকার দেবতা আমাকে প্রতিদিন অপমানিত করেছে সে কথা আজও আমি ভুলতে পারি নে। আমি প্রথম ভালোবাসা পেলুম, বাপজান, তোমার ঘরে। জানতে পারলুম হতভাগিনী মেয়েরও জীবনের মূল্য আছে। যে দেবতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন সেই ভালোবাসার সম্মানের মধ্যে তাঁকেই আমি পুজো করি, তিনিই আমার দেবতা— তিনি হিন্দুও নন, মুসলমানও নন। তোমার মেজো ছেলে করিম, তাকে আমি মনের মধ্যে গ্রহণ করেছি— আমার ধর্মকর্ম ওরই সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। তুমি মুসলমান করে নাও আমাকে, তাতে আমার আপত্তি হবে না— আমার নাহয় দুই ধর্মই থাকল।"

এমনি করে চলল ওদের জীবনযাত্রা, ওদের পূর্বতন পরিজনদের সঙ্গে আর দেখা-সাক্ষাতের কোনো সম্ভাবনা রইল না। এ দিকে হবির খাঁ কমলা যে ওদের পরিবারের কেউ নয়, সে কথা ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করলে— ওর নাম হল মেহেরজান।

ইতিমধ্যে ওর কাকার দ্বিতীয় মেয়ের বিবাহের সময় এল। তার বন্দোবস্তও হল পূর্বের মতো, আবার এল সেই বিপদ। পথের মধ্যে হুংকার দিয়ে এসে পড়ল সেই ডাকাতের দল। শিকার থেকে একবার তারা বঞ্চিত হয়েছিল সে দুঃখ তাদের ছিল, এবার তার শোধ নিতে চায়।

কিন্তু তারই পিছন পিছন আর এক হুংকার এল, "খবরদার!"

"ঐরে, হবির খাঁর চেলারা এসে সব নষ্ট করে দিলে।"

কন্যাপক্ষরা যখন কন্যাকে পালকির মধ্যে ফেলে রেখে যে যেখানে পেল দৌড় মারতে চায় তখন তাদের মাঝখানে দেখা দিল হবির খাঁয়ের অর্ধচন্দ্র-আঁকা পতাকা -বাঁধা বর্শার ফলক। সেই বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়েছে নির্ভয়ে একটি রমণী।

সরলাকে তিনি বললেন, "বোন, তোর ভয় নেই। তোর জন্য আমি তাঁর আশ্রয় নিয়ে এসেছি যিনি সকলকে আশ্রয় দেন। যিনি কারও জাত বিচার করেন না।—

"কাকা, প্রণাম তোমাকে। ভয় নেই, তোমার পা ছোঁব না। এখন এ'কে তোমার ঘরে নিয়ে যাও, একে কিছুতে অস্পৃশ্য করে নি। কাকীকে বোলো অনেক দিন তাঁর অনিচ্ছুক অন্নবস্ত্রে মানুষ হয়েছি, সে ঋণ যে আমি এমন করে আজ শুধতে পারব তা ভাবি নি। ওর জন্যে একটি রাঙা চেলী এনেছি, সে এই নাও, আর একটি কিংখাবের আসন। আমার বোন যদি কখনো দুঃখে পড়ে তবে মনে থাকে যেন তার মুসলমান দিদি আছে, তাকে রক্ষা করবার জন্যে।"

২৪-২৫ জুন ১৯৪১ আষাঢ় ১৩৬২

পরিশিষ্ট ১

'শেষ কথা' গল্পের পাঠান্তর

ছোটো গল্প

শেষ কথা

সাহিত্যে বড়ো গল্প ব'লে যে-সব প্রগল্ভ বাণীবাহন দেখা যায় তারা প্রাক্‌ভূতাত্ত্বিক যুগের প্রাণীদের মতো—তাদের প্রাণের পরিমাণ যত দেহের পরিমাণ তার চার গুণ, তাদের লেজটা কলেবরের অত্যুক্তি।

অতিপরিমাণ ঘাস পাতা খেয়ে যাদের পেট মোটা তারা ভারবাহী জীব. স্তূপাকার মালের বস্তা টানা তাদের অদৃষ্টে। বড়ো গল্প সেই জাতের, মাল-বোঝাই-ওয়ালা। যে-সব প্রাণীর খোরাক স্বল্প এবং সারালো, জাওর কেটে কেটে তারা প্রলম্বিত করে না ভোজন-ব্যাপার অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে। ছোটো গল্প সেই জাতের ; বোঝা বইবার জন্যে সে নয়, একেবারে সে মার লাগায় মর্মে লঘু লম্ফে।

কিন্তু গল্পের ফরমাশ আসছে বড়ো বহরের। অনেকখানি মালকে মানুষ অনেকখানি দাম দিয়ে ঠকতেও রাজি হয়। ওটা তার আদিম দুর্নিবার প্রবৃত্তির দুর্বলতা। এটাই দেখতে পাওয়া যায় আমাদের দেশের বিয়ের ব্যাপারে। ইতরের-মন-ভোলানো অতিপ্রাচুর্য এমনতরো রসাত্মক ক্রিয়াকর্মেও ভদ্রসমাজের বিনা প্রতিবাদে আজও চলে আসছে। আতিশয্যের-ঢাক-বাজানো পৌত্তলিকতা মানুষের প্রপৈত্রিক সংস্কার।

মানুষের জীবনটা বিপুল একটা বনস্পতির মতো। তার আয়তন তার আকৃতি সুঠাম নয়। দিনে দিনে চলছে তার মধ্যে এলোমেলো ডালপালার পুনরাবৃত্তি। এই স্তূপাকার একঘেয়েমির মধ্যে হঠাৎ একটি ফল ফলে ওঠে—সে নিটোল, সে সুডোল, বাইরে তার রঙ রাঙা কিংবা কালো, ভিতরে তার রস তীব্র কিংবা মধুর। সে সংক্ষিপ্ত, সে অনিবার্য, সে দৈবলব্ধ, সে ছোটো গল্প।

একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাক। রাজা এড্‌ওআর্ড্ ভ্রমণে বেরলেন দেশ-দেশান্তরে। মুগ্ধ স্তাবকদের ভিড় চলল সঙ্গে সঙ্গে, খবরের কাগজের প্যারাগ্রাফের ঠোঙাগুলো ঠেসে ভরে ভরে উঠল। এমন সময় যত-সব রাজদূত, রাষ্ট্রনায়ক, বণিক্‌সম্রাট্, লেখনীবজ্রপাণি সংবাদপাত্রিকের ঘেঁষাঘেঁষি ভিড়ের মধ্যে একটা কোন্ ছোটো রন্ধ্র দিয়ে রাজার চোখে পড়ল এক অকুলীন আমেরিকানী। শব্দভেদী সমারোহের স্বর-বর্ষণ মুহূর্তে হয়ে গেল অবাস্তব, কালো পর্দা পড়ে গেল ইতিহাসের অসংখ্য-দীপদীপ্ত রঙ্গমঞ্চের উপর। সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল ছোটো গল্পটি—দুর্লভ, দুর্মূল্য। গোলমালের ভিতরে অদৃশ্য আর্টিস্ট্ ছিলেন আড়ালে, তাকিয়ে ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনসরোবরের গভীর অগোচরে। দেখছিলেন অতল-সঞ্চারী অজানা মাছ কখন পড়ে তাঁর বঁড়শিতে গাঁথা, কখন চমক দিয়ে ওঠে তাঁর ছোটো গল্পটি নানা-বর্ণচ্ছটা-খচিত লেজ আছড়িয়ে।

পৌরাণিক যুগের একটি ছোটো গল্প মনে পড়ছে—ঋষ্যশৃঙ্গমুনির আখ্যান। দুঃসাধ্য তাঁর তপস্যা। নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মচর্যের দুরূহ সাধনায়। অধিরোহণ করছিলেন বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-যাজ্ঞবল্ক্যের দুর্গম উচ্চতায়। হঠাৎ দেখা দিল সামান্য রমণী, সে শুচি নয়, সাধ্বী নয়, সে বহন করে নি তত্ত্ব বা মন্ত্র বা মুক্তি ; এমনকি ইন্দ্রলোক

থেকে পাঠানো অপ্সরীও সে নয়। সমস্ত যাগযজ্ঞ ধ্যানধারণা সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎ আঁট বেঁধে গেল একটি ছোটো গল্পে।

এই হল ভূমিকা। আমি হচ্ছি সেই মানুষ যার অদৃষ্ট ভীল-রমণীর মতো ঝুড়িতে প্রতিদিন সংগ্রহ করত কাঁচা পাকা বদরী ফল, একদিন হঠাৎ কুড়িয়ে পেয়েছিল গজমুক্তা, একটি ছোটো গল্প।

সাহস করে লিখে ফেলব। কাজটা কঠিন। এতে হয়তো স্বাদ কিছু বা পাওয়া যাবে, কিন্তু পেট-ভরা ওজনের বস্তু মিলবে না।

প্রথম পর্ব

জীবনের প্রবহমান ঘোলা রঙের হ-য-ব-র-ল'র মধ্যে হঠাৎ যেখানে গল্পটা আপন রূপ ধ'রে সদ্য দেখা দেয়, তার অনেক পূর্ব থেকেই নায়ক-নায়িকারা আপন পরিচয়ের সূত্র গেঁথে আসে। গল্পের গোড়ায় প্রাক্‌গাল্পিক ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতেই হয়। তাতে কিছু সময় নেবে। আমি যে কে, সে কথাটা পরিষ্কার করে নিই।

কিন্তু নামধাম ভাঁড়াতে হবে। নইলে চেনাশোনার মহলে গল্পের যাথাযথ্যের জবাবদিহি সামলাতে পারব না। এ কথা সবাই বোঝে না যে, ঠিকঠাক সত্য বলবার এক কায়দা আর তার চেয়েও বেশি সত্য বলবার ভঙ্গী আলাদা।

কী নাম নেব তাই ভাবছি। রোম্যাণ্টিক নামকরণের দ্বারা গোড়া থেকে গল্পটাকে বসন্তরাগে পঞ্চমসুরে বাঁধতে চাই নে। নবীনমাধব নামটা বোধ হয় চলনসই। ওর শাম্‌লা রঙটা মেজে ফেলে গিল্‌টি লাগালে ওটা হতে পারত নবারুণ সেনগুপ্ত, কিন্তু খাঁটি শোনাত না।

আমি ছিলুম বাংলাদেশের বিপ্লবীদলের একজন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহাকর্ষ-শক্তি আমাকে প্রায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল আণ্ডামানের তীর-বরাবর। নানা বাঁকা পথে সি. আই. ডি.'র ফাঁস এড়িয়ে প্রথমে আফগানিস্থান, তার পরে জাপান, তার পরে আমেরিকায় গিয়ে পেঁচৌছিলুম জাহাজি গোরার নানা কাজ নিয়ে।

পূর্ববঙ্গীয় দুর্জয় জেদ ছিল মজ্জায়। একদিনও ভুলি নি যে ভারতবর্ষের হাতকড়ায় উখো ঘষতে হবে দিনরাত, যতদিন বেঁচে থাকি। কিন্তু এই সমুদ্রপারের কর্মপেশল হাড়-মোটা প্রাণঘন দেশে থাকতে থাকতে একটা কথা নিশ্চিত বুঝেছিলুম যে, আমরা যে প্রণালীতে বিপ্লবের পালা শুরু করেছিলুম সে যেন আতশবাজিতে পটকা ছোঁড়ার মতো। তাতে নিজেদের পোড়াকপাল আরও পুড়িয়েছে অনেকবার, কিন্তু ফুটো করতে পারে নি ব্রিটিশ রাজপতাকা। আগুনের উপর পতঙ্গের অন্ধ আসক্তি। যখন সদর্পে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছিলুম, তখন বুঝতে পারি নি সেটাতে ইতিহাসের যজ্ঞানল জ্বালানো হচ্ছে না, জ্বালাচ্ছি নিজেদের খুব ছোটো ছোটো চিতানল।

তার পরে স্বচক্ষে দেখলুম য়ুরোপীয় মহাসমর। কী রকম টাকা ওড়াতে হয় ধুলোর মতো, আর প্রাণ উড়িয়ে দেয় ধোঁয়ার মতো দাবানলের। মরবার জন্যে তৈরি হতে হয় সমস্ত দেশ একজোট হয়ে, মারবার জন্যে তৈরি হতে হয় দীর্ঘকাল বিজ্ঞানের দুরূহ দীক্ষা নিয়ে। এই যুগান্তরসাধিনী সর্বনাশাকে আমাদের খোড়ো

ঘরের চন্ডীমন্ডপে প্রতিষ্ঠিত করব কোন্ দুরাশায়! যথোচিত সমারোহে বড়ো রকমের আত্মহত্যা করবার আয়োজনও যে ঘরে নেই ; ঠিক করলুম ন্যাশনাল দুর্গের গোড়া পাকা করতে হবে, যত সময়ই লাগুক। বাঁচতে যদি চাই, আদিম সৃষ্টির হাত দুখানায় গোটাদশেক নখ নিয়ে আঁচড় মেরে লড়াই করা চলবে না। এ যুগে যন্ত্রের সঙ্গে দিতে হবে পাল্লা। হাতাহাতি করার তাল-ঠোকা পালোয়ানি সহজ, বিশ্বকর্মার চেল্যাগিরি সহজ নয়। পথ দীর্ঘ, সাধনা দুরূহ।

দীক্ষা নিলুম যন্ত্রবিদ্যায়। আমেরিকায় ডেট্রয়েটে ফোর্ডের মোটর-কারখানায় কোনোমতে ভর্তি হলুম। হাত পাকাচ্ছিলুম কিন্তু শিক্ষা এগাচ্ছিল বলে মনে হয় নি। একদিন কী দুর্বুদ্ধি ঘটল, মনে হল ফোর্ড্‌কে যদি একটুখানি আভাস দিতে যাই যে নিজের স্বার্থসিদ্ধি আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি চাই দেশকে বাঁচাতে, তা হলে ধনকুবের বুঝি বা খুশি হবে, এমন-কি দেবে আমার রাস্তা প্রশস্ত করে। অতি গম্ভীরমুখে ফোর্ড্ বললে, 'আমার নাম হেন্‌রি ফোর্ড্, পুরোনো পাকা ইংরেজি নাম। কিন্তু আমি জানি আমাদের ইংলন্‌ডের মামাতো ভাইরা অকেজো, ইন্‌এফীসিয়েন্ট্। তাদের আমি কেজো করে তুলব এই আমার সংকল্প।' অর্থাৎ অকেজো টাকাওয়ালাকে কেজো করবে কেজো টাকাওয়ালা স্বগোত্রের লাইন বাঁচিয়ে, আমরা থাকব চিরকাল কেজোদের হাতে কাদার পিণ্ড। তারা পুতুল বানাবে। এই দুঃখেই গিয়েছিলুম একদিন সোভিয়েটের দলে ভিড়তে। তারা আর যাই করুক কোনো নিরুপায় মানব-জাতকে নিয়ে পুতুলনাচের অর্থকরী ব্যাবসা করে না।

কিছুদিন চাকা চালিয়ে শেষকালে বুঝলুম যন্ত্রবিদ্যাশিক্ষার আরও গোড়ায় যেতে হবে। শুরুতে দরকার যন্ত্রনির্মাণের মালমসলা জোগাড় করার বিদ্যে। কৃতকর্মাদের জন্যেই ধরণী দুর্গম পাতালপুরীতে জমা করে রেখেছেন কঠিন খনিজ পিণ্ড। সেইগুলো হস্তগত করে তারাই দিগ্বিজয় করেছে যারা বাহাদুর জাত। আর যাদের চিরকালই অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ তাদের জন্যেই বাঁধা বরাদ্দ উপরিস্তরের ফল-ফসল শাকসব্‌জি— হাড় বেরিয়ে গেল পাঁজরের, পেটে পিঠে গেল এক হয়ে।

লেগে গেলুম খনিজবিদ্যায়। এ কথা ভুলি নি যে ফোর্ড্ বলেছেন ইংরেজ জাত অকেজো। তার প্রমাণ আছে ভারতবর্ষে। একদিন ওরা হাত লাগিয়েছিল নীলের চাষে, চায়ের চাষে আর-একদিন। সিভিলিয়ান-দল দফতরখানায় 'ল অ্যান্ড্ অর্ডর'এর জাঁতা চালিয়ে দেশের অস্থিমজ্জা ছাতু করে বানিয়ে তুলেছে বস্তাবন্দী ভালোমানুষি, অতি মোলায়েম। সামান্য কিছু কয়লার আকর ছাড়া ভারতের অন্তর্ভাণ্ডারের সম্পদ উদ্ঘাটিত করতে উপেক্ষা করেছে কিংবা অক্ষমতা দেখিয়েছে। নিংড়েছে বসে বসে পাটের চাষীর রক্ত। জামশেদজি টাটাকে সেলাম করেছি সমুদ্রের ওপার থেকে। ঠিক করেছি আমার কাজ পটকা ছোঁড়া নয়। সিঁধ কাটতে যাব পাতালপুরীর পাষাণপ্রাচীরে। মায়ের-আঁচল-ধরা খোকাদের দলে মিশে 'মা মা' ধ্বনিতে মন্তর আওড়াব না ; আর দেশের যত অভুক্ত অক্ষম রুগ্‌ণ অশিক্ষিত কাল্পনিক-ভয়ে-দিনরাত-কম্পমান দরিদ্রকে সহজ ভাষায় দরিদ্র বলেই জানব— 'দরিদ্রনারায়ণ' ব'লে একটা বুলি বানিয়ে তাদের বিদ্রূপ করব না। প্রথম বয়সে একবার বচনের পুতুল-গড়া খেলা অনেক খেলেছি। কবি-কারিগরদের কুমোরটুলিতে স্বদেশের যে সজ্জা রাঙতা-লাগানো প্রতিমা গড়া হয় তার সামনে গদগদ ভাষায় অনেক অশ্রুজল ফেলেছি।

লোকে তার খুব একটা চওড়া নাম দিয়েছিল—'দেশাত্মবোধ'। কিন্তু আর নয়। আক্কেলদাঁত উঠেছে। এই জাগ্রত বুদ্ধির দেশে এসে বাস্তবকে বাস্তব বলে জেনেই শুকনো চোখে কোমর বেঁধে কাজ করতে শিখেছি। এবার দেশে ফিরে গিয়ে বেরিয়ে পড়বে এই বিজ্ঞানী বাঙাল কোদাল নিয়ে কুড়ুল নিয়ে, হাতুড়ি নিয়ে, দেশের গুপ্ত-ধনের তল্লাসে। মেয়েলি গলার মিহিসুরের মহাকবি-বিশ্বকবিদের অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠ চেলারা এই অনুষ্ঠানকে তাদের দেশমাতৃকার পুজা বলে চিনতেই পারবে না।

ফোর্ডের কারখানা ছেড়ে তার পর ন' বছর কাটিয়েছি খনিবিদ্যা খনিজবিদ্যা শিখতে। য়ুরোপের নানা কর্মশালায় ফিরেছি, হাতে-কলমে কাজ করেছি, দুই-একটা যন্ত্রকৌশল নিজেও বানিয়েছি, উৎসাহ পেয়েছি অধ্যাপকের কাছ থেকে, নিজের উপরে বিশ্বাস হয়েছে, ধিক্‌কার দিয়েছি ভূতপূর্ব মন্ত্রমুগ্ধ অকৃতার্থ নিজেকে।

আমার ছোটোগল্পের সঙ্গে এই-সব মোটা মোটা কথার বিশেষ যোগ নেই। বাদ দিলে চলত, হয়তো বা ভালোই হত। কেবল এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলার দরকার ছিল, সেইটে বলি। যৌবনের গোড়ায় যখন নারীপ্রভাবের ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌ রঙিন রশ্মির আন্দোলন তোলে জীবনের আকাশে আকাশে, তখন আমি ছিলুম কোমর বেঁধে অন্যমনস্ক। আমি সন্ন্যাসী, আমি কর্মযোগী, এই-সমস্ত বাণীর কুলুপ আমার মনে কষে তালা এঁটে রেখেছিল। কন্যাদায়িকেরা যখন আশেপাশে ঘোরাঘুরি করেছে তখন আমি স্পষ্ট করেই বলেছি, কন্যার কুষ্ঠিতে যদি অকালবৈধব্যযোগ থাকে তবেই যেন তাঁরা আমার কথা চিন্তা করেন।

পাশ্চাত্য মহাদেশে নারীসঙ্গলাভে বাধা দেবার কাঁটার বেড়া নেই। সেখানে দুর্যোগের আশঙ্কা ছিল। আমি যে সুপুরুষ, বঙ্গনারীর মুখের ভাষায় তার কোনো ভাষ্য পাই নি। তাই এ সংবাদটা আমার চেতনার বাইরেই ছিল। বিলেতে গিয়ে প্রথম আবিষ্কার করেছি যে সাধারণের চেয়ে আমার বুদ্ধি বেশি, তেমনি ধরা পড়েছে আমার চেহারা ভালো। আমার দেশের অর্ধাশনশীর্ণ পাঠকের মুখে জল আসবার মতো রসগর্ভ কাহিনীর সূচনা সেখানে মাঝে মাঝে হয়েছিল। সেয়ানারা অবিশ্বাসে চোখ টেপাটেপি করতে পারেন, তবু জোর করেই বলব সে কাহিনী মিলনান্ত বা বিয়োগান্তের যবনিকাপতনে পৌঁছয় নি কেবল আমার জেদ-বশত। আমার স্বভাবটা কড়া, পাথুরে জমিতে জীবনের সংকল্প ছিল যক্ষের ধনের মতো পোঁতা, সেখানে চোরের সাবল ঠিকরে প'ড়ে ঠন্‌ করে ওঠে। তা ছাড়া আমি জাত-পাড়াগেঁয়ে, সাবেককেলে ভদ্রঘরে আমার জন্ম, মেয়েদের সম্বন্ধে আমার সংকোচ ঘুচতে চায় না।

আমার জর্মন ডিগ্রি উঁচুদরের ছিল। সেটা এখানে সরকারী কাজে বাতিল। তাই সুযোগ করে ছোটোনাগপুরে চন্দ্রবংশীয় এক রাজার দরবারে কাজ নিয়েছি। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর ছেলে দেবিকাপ্রসাদ কিছুদিন কেম্‌ব্রিজে পড়াশুনো করেছিলেন। দৈবাৎ জুরিকে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। তাঁকে বুঝিয়েছিলুম আমার প্ল্যান। শুনে উৎসাহিত হয়ে তাঁদের স্টেটে আমাকে লাগিয়ে দিলেন জিয়লজিকাল সর্ভের কাজে, খনি-আবিষ্কারের প্রত্যাশায়। এত বড়ো কাজের ভার আনাড়ি সিভিলিয়নকে না দেওয়াতে সেক্রেটেরিয়টের উপরিস্তরে বায়ুমণ্ডল বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। দেবিকাপ্রসাদ শক্ত ধাতের লোক, বুড়ো রাজার মন টল্‌মল্‌ করা সত্ত্বেও টিঁকে গেলুম।

এখানে আসবার আগে মা বললেন, "ভালো কাজ পেয়েছ, এবার বাবা বিয়ে করো।"

আমি বললুম, "অর্থাৎ, ভালো কাজ মাটি করো।"

তার পরে বোবা পাথরকে প্রশ্ন করে করে বেড়াচ্ছিলুম পাহাড়ে জঙ্গলে। সে সময়টাতে পলাশফুলের রাঙা রঙে বনে বনে নেশা লেগে গিয়েছে। শালগাছে অজস্র মঞ্জরী, মৌমাছিদের অনবরত গুঞ্জন। ব্যাবসাদারেরা মৌ সংগ্রহে লেগেছে, কুলের পাতা থেকে জমা করছে তসব-রেশমের গুটি, সাঁওতালরা কুড়চ্ছে পাকা মহুয়া ফল। ঝির্‌ঝির্‌ শব্দে হালকা নাচের ওড়না ঘুরিয়ে চলেছিল একটি ছিপ্‌ছিপে নদী। শুনেছি এখানকার কোনো অধিবাসিনী তার নাম দিয়েছেন তনিকা। তাঁর কথা পরে হবে।

দিনে দিনে বুঝতে পারছি এ জায়গাটা ঝিমিয়ে-পড়া ঝাপসা চেতনার দেশ, এখানে একলা মনের সন্ধান পেলে প্রকৃতি মায়াবিনী তাকে নিয়ে রঙরেজিনীর কাজ করে, যেমন করে সে অস্তসূর্যের উত্তরীয়ে।

মনটাতে একটু আবেশের ঘোর লাগছিল। ক্ষণে ক্ষণে ঢিলে হয়ে আসছিল কাজের চাল। নিজের উপর বিরক্ত হচ্ছিলুম, ভিতর থেকে কষে জোর লাগাচ্ছিলুম দাঁড়ে। ভয় হচ্ছিল ট্রপিকাল মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়ছি বুঝি। শয়তান ট্রপিক্‌স্‌ জন্মকাল থেকে এ দেশে হাতপাখার হাওয়ায় ডাইনে বাঁয়ে হারের মন্ত্র চালাচ্ছে আমাদের ললাটে, মনে-মনে পণ করছি এর স্বেদসিক্ত জাদু এড়াতেই হবে।

বেলা পড়ে এল। এক জায়গায় মাঝখানে চর ফেলে নুড়ি পাথর ঠেলে ঠেলে দুই শাখায় ভাগ হয়ে চলে গিয়েছে নদী। সেই বালুর দ্বীপে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সারি সারি বকের দল। দিনাবসানে তাদের এই ছুটির ছবি দেখে রোজ আমি চলে যাই আমার কাজের বাঁক ফেরাতে। ঝুলিতে মাটি পাথর অভ্রের টুকরো নিয়ে সেদিন ফিরছিলুম আমার বাংলাঘরে, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার কাজে। অপরাহ্ণ আর সন্ধ্যার মাঝখানে দিনের যে একটা ফালতো পোড়ো সময় থাকে সেইখানটাতে একলা মানুষের মন এলিয়ে পড়ে। তাই আমি নিজেকে চেতিয়ে রাখবার জন্যে এই সময়টা লাগিয়েছি পরখ করার কাজে। ডাইনামো দিয়ে বিজলি বাতি জ্বালাই—কেমিকাল নিয়ে, মাইক্রস্‌কোপ নিয়ে, নিক্তি নিয়ে বসি। এক-একদিন রাত দুপুর পেরিয়ে যায়।

আজ একটা পুরোনো পরিত্যক্ত তামার খনির খবর পেয়ে দ্রুত উৎসাহে তারই সন্ধানে চলেছিলুম। কাকগুলো মাথার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলেছে ফিকে আলোর আকাশে কা কা শব্দে। অদূরে একটা ঢিবির উপরে তাদের পঞ্চায়েত বসবার পড়েছে হাঁকডাক।

হঠাৎ বাধা পড়ল আমার কাজের রাস্তায়। পাঁচটা গাছের চক্রমণ্ডলী ছিল বনের পথের ধারে একটা উঁচু ডাঙার 'পরে। সেই বেষ্টনীর মধ্যে কেউ বসে থাকলে কেবল একটিমাত্র অবকাশে তাকে দেখা যায়, হঠাৎ চোখ এড়িয়ে যাবারই কথা। সেদিন মেঘের মধ্যে দিয়ে একটি আশ্চর্য দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়েছিল। সেই গাছগুলোর ফাঁকটার ভিতর দিয়ে রাঙা আলোর ছোরা চিরে ফেলেছিল ভিতরকার ছায়াটাকে।

ঠিক সেই আলোর পথে বসে আছে মেয়েটি গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে, পা দুটি বুকের কাছে গুটিয়ে নিয়ে। পাশে ঘাসের উপর পড়ে আছে একখানা খাতা, বোধ হয় ডায়ারি।

বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল, থমকিয়ে গেলুম। দেখলুম যেন বিকেলের ম্লান রৌদ্রে গড়া একটি সোনার প্রতিমা। চেয়ে রইলুম গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে। অপূর্ব ছবি এক মুহূর্তে চিহ্নিত হয়ে গেল মনের চিরস্মরণীয়াগারে।

আমার বিস্তৃত অভিজ্ঞতার পথে অনেক অপ্রত্যাশিত মনোহরের দরজায় ঠেকেছে মন, পাশ কাটিয়ে চলে গেছি, আজ মনে হল জীবনের একটা কোন্ চরমের সংস্পর্শে এসে পৌঁছলুম। এমন করে ভাবা, এমন করে বলা আমার একেবারে অভ্যস্ত নয়। যে আঘাতে মানুষের নিজের অজানা একটা অপূর্ব স্বরূপ ছিটকিনি খুলে অবারিত হয়, সেই আঘাত আমাকে লাগল কী করে!

অত্যন্ত ইচ্ছা করছিল ওর কাছে গিয়ে কথার মতো কথা একটা-কিছু বলি। কিন্তু জানি নে কী কথা যে পরিচয়ের সব-প্রথম কথা, যে কথায় জানিয়ে দেবে খৃস্টীয় পুরাণের প্রথম সৃষ্টির বাণী— আলো হোক, ব্যক্ত হোক যা অব্যক্ত।

আমি মনে মনে ওর নাম দিলুম— অচিরা। তার মানে কী? তার মানে এক মুহূর্তেই যার প্রকাশ, বিদ্যুতের মতো।

এক সময়ে মনে হল অচিরা যেন জানতে পেরেছে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে আড়ালে। স্তব্ধ উপস্থিতির একটা নিঃশব্দ শব্দ আছে বুঝি।

একটু তফাতে গিয়ে কোমরবন্ধ থেকে ভুজালি নিয়ে একান্ত মনোযোগের ভান করে মাটি খোঁচাতে লাগলুম। ঝুলিতে যা-হয় কিছু দিলুম পুরে, গোটাকয়েক কাঁকরের ঢেলা। চলে গেলুম মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে কী যেন সন্ধান করতে করতে।

কিন্তু নিশ্চয় মনে জানি যাঁকে ভোলাতে চেয়েছিলুম তিনি ভোলেন নি। মুগ্ধ পুরুষচিত্তের বিহ্বলতার আরও অনেক দৃষ্টান্ত আরও অনেকবার তাঁর গোচর হয়েছে সন্দেহ নেই। আশা করলুম আমার বেলায় এটা তিনি উপভোগ করলেন, সকৌতুকে কিংবা সগর্বে, কিংবা হয়তো বা একটু মুগ্ধ মনে। কাছে যাবার বেড়া যদি আর-একটু ফাঁক করতুম তা হলে কী জানি কী হত। রাগ করতেন, না রাগের ভান করতেন?

অত্যন্ত চঞ্চল মনে চলেছি আমার বাংলাঘরের দিকে, এমন সময় চোখে পড়ল দুই টুকরোয় ছিন্ন করা একখানা চিঠির খাম। তাতে নাম লেখা ভবতোষ মজুমদার আই. সি. এস., ছাপরা। তার বিশেষত্ব এই যে, এতে টিকিট আছে, কিন্তু সে টিকিটে ডাকঘরের ছাপ নেই। বুঝতে পারলুম ছেঁড়া চিঠির খামের মধ্যে একটা ট্র্যাজেডির ক্ষতচিহ্ন আছে। পৃথিবীর ছেঁড়া স্তর থেকে তার বিপ্লবের ইতিহাস বের করা আমার কাজ। সেই রকম কাজে লাগলুম ছেঁড়া খামটা নিয়ে।

ইতিমধ্যে ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে আমার নিজের অন্তঃকরণটা। নিজের অপ্রমত্ত কঠিন মনটাকে চিনে নিয়েছি বলে স্পষ্ট ধারণা ছিল। আজ এই প্রথম দেখলুম তার পাশের পাড়াতেই লুকিয়ে বসে আছে বুদ্ধিশাসনের বহির্ভূত একটা অবোধ।

নির্জন অরণ্যের সুগভীর কেন্দ্রস্থলে একটা সুনিবিড় সম্মোহন আছে যেখানে চলছে তার বুড়ো বুড়ো গাছপালার কানে কানে চক্রান্ত, যেখানে ভিতরে ভিতরে

উচ্ছ্বসিত হচ্ছে সৃষ্টির আদিম প্রাণের মন্ত্রগুঞ্জরণ। দিনে দুপুরে ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে তার সুর উদাত্ত পর্দায়, রাতে দুপুরে তার মন্দ্রগম্ভীর ধ্বনি স্পন্দিত হতে থাকে জীবচেতনায়, বুদ্ধিকে দেয় আবিষ্ট করে। জিয়লজি-চর্চার ভিতরে ভিতরেই মনের আন্তর্ভৌম প্রদেশে ব্যাপ্ত হচ্ছিল এই আরণ্যক মায়ার কাজ। হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠে সে এক মুহূর্তে আমার দেহমনকে আবিষ্ট করে দিল, যখনই দেখলুম অচিরাকে কুসুমিত ছায়ালোকের পরিবেষ্টনে।

বাঙালি মেয়েকে ইতিপূর্বে দেখেছি সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে এমন বিশুদ্ধ স্বপ্রকাশ স্বাতন্ত্র্যে দেখি নি। লোকালয়ে যদি এই মেয়েটিকে দেখতুম তা হলে যাকে দেখা যেত নানা লোকের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে জড়িত বিমিশ্রিত, এ মেয়ে সে নয়; এ দেখা দিল পরিবিস্তৃত নির্জন সবুজ নিবিড়তার পরিপ্রেক্ষিতে একান্ত স্বকীয়তায়। মনে হল না বেণী দুলিয়ে এ কোনো কালে ডায়োসিশনে পর্সেণ্টেজ রাখতে গেছে, শাড়ির উপরে গাউন ঝুলিয়ে ডিগ্রি নিতে গেছে কন্‌ভোকেশনে, বালিগঞ্জে টেনিস-পার্টিতে চা ঢালছে উচ্চ কলহাস্যে। অল্প বয়সে শুনেছি পুরোনো বাংলা গান 'মনে রইল সই মনের বেদনা'—তারই সরল সুরের সঙ্গে মিশিয়ে চিরকালের বাঙালি মেয়ের একটা করুণ চেহারা আমি দেখতে পেতুম। অচিরাকে দেখে মনে হল সেইরকম বারোয়াঁ গানে তৈরি বাণীমূর্তি, যে গান রেডিয়োতে বাজে না, গ্রামোফোনে পাড়া মুখর করে না। এ দিকে আমার আপনার মধ্যে দেখলুম মনের নীচের তলাকার তপ্তবিগলিত একটা প্রদীপ্ত রহস্য হঠাৎ উপরের আলোতে উদ্‌গীর্ণ হয়ে উঠেছে।

বুঝতে পারছি আমি যখন রোজ বিকেলে এই পথ দিয়ে কাজে ফিরেছি অচিরা আমাকে দেখেছে, অন্যমনস্ক আমি ওকে দেখি নি। নিজের চেহারা সম্বন্ধে যে বিশ্বাস এনেছি বিলেত থেকে, এই ঘটনা সম্পর্কে মনের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া যে হয় নি তা বলতে পারি নে। কিন্তু সন্দেহও ছিল। বিলেত-ফেরত কোনো কোনো বন্ধুর কাছে শুনেছি, বিলিতি মেয়ের রুচির সঙ্গে বাঙালি মেয়ের রুচি মেলে না। এরা পুরুষের রূপে খোঁজে মেয়েলি মোলায়েম ছাঁদ। বাঙালি কার্তিক আর যাই হোক কোনো কালে দেবসেনাপতি ছিল না। এটা বলতে হবে আমাকেও ময়ূরে চড়ালে মানাবে না। এতদিন এ-সব আলোচনা আমার মনের ধার দিয়েও যায় নি। কিন্তু কয়েক দিন ধরে আমাকে ভাবিয়েছে। রোদে পোড়া আমার রঙ, লম্বা আমার দেহ, শক্ত আমার বাহু, দ্রুত আমার চলন, নাক চিবুক কপাল নিয়ে খুব স্পষ্ট রেখায় আঁকা আমার চেহারা—আমি নবনীনিন্দিত কষিতকাঞ্চনকান্তি বাঙালি মায়ের আদরের ধন নই।

আমার নিকটবর্তিনী বঙ্গনারীর সঙ্গে আমি মনে মনে ঝগড়া করেছি—একলা ঘরের কোণে বুক ফুলিয়ে বলেছি, 'তোমার পছন্দ পাই আর নাই পাই এ কথা নিশ্চয় জেনো তোমার দেশের চেয়ে বড়ো বড়ো দেশের স্বয়ম্বরসভার বরমাল্য উপেক্ষা করে এসেছি।' এই বানানো ঝগড়ার উষ্মায় একদিন হেসে উঠেছি আপন ছেলে-মানুষিতে। আবার এ দিকে বিজ্ঞানীর যুক্তিও কাজ করেছে ভিতরে ভিতরে। আপন মনে তর্ক করেছি, একান্ত নিভৃতে থাকাই যদি ওর প্রার্থনীয় তা হলে বারবার আমার সুস্পষ্ট দৃষ্টিপাত এড়িয়ে এতদিনে ও তো ঠাঁই বদল করত। কাজ সেরে এ পথ দিয়ে আগে যেতুম একবার মাত্র, আজকাল যখন-তখন যাতায়াত করি, যেন এই

জায়গাটাতেই সোনার খনির খবর পেয়েছি। কখনও স্পষ্ট যখন চোখোচোখি হয়েছে আমার বিশ্বাস সেটাকে চার চোখের অপঘাত বলে ওর ধারণা হয় নি। এক-একদিন হঠাৎ পিছন ফিরে দেখেছি আমার তিরোগমনের দিকে অচিরা তাকিয়ে আছে, ধরা পড়তেই দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

তথ্যসংগ্রহের কাজে লাগলুম। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কেম্‌ব্রিজের সতীর্থ প্রোফেসর আছেন বঙ্কিম। তাঁকে চিঠি লিখলুম, 'তোমাদের বেহার সিভিল সার্ভিসে আছেন এক ভদ্রলোক, নাম ভবতোষ। আমার কোনো বন্ধু, তাঁর মেয়ের জন্যে লোকটিকে উদ্‌বাহবন্ধনে জড়াবার দুষ্কর্মে সাহায্য করতে আমাকে অনুরোধ করেছেন। জানতে চাই রাস্তা খোলসা কি না, আর লোকটার মতিগতি কী রকম।'

উত্তর এল, 'পাকা দেয়াল তোলা হয়ে গেছে, রাস্তা বন্ধ। তার পরেও লোকটার মতিগতি সম্বন্ধে যদি কৌতূহল থাকে তবে শোনো।—এ দেশে থাকতে আমি যাঁর ছাত্র ছিলুম তাঁর নাম নাই জানলে। তিনি পরম পণ্ডিত আর ঋষিতুল্য লোক। তাঁর নাতনিটিকে যদি দেখ তা হলে জানবে সরস্বতী কেবল যে আবির্ভূত হয়েছেন অধ্যাপকের বিদ্যামন্দিরে তা নয়, তিনি দেহ নিয়ে এসেছেন তাঁর কোলে। এমন বুদ্ধিতে উজ্জ্বল অপরূপ সুন্দর চেহারা কখনও দেখি নি।

'ভবতোষ ঢুকল শয়তান তাঁর স্বর্গলোকে। স্বল্পজল নদীর মতো বুদ্ধি তার অগভীর ব'লেই জ্বল্‌ জ্বল্‌ করে আর সেই জন্যেই তার বচনের ধারা অনর্গল। ভুললেন অধ্যাপক, ভুললেন নাতনি। রকমসকম দেখে আমাদের তো হাত নিস্‌পিস্‌ করতে থাকত। কিছু বলবার পথ ছিল না—বিবাহের সম্বন্ধ পাকাপাকি, বিলেত গিয়ে সিভিলিয়ান হয়ে আসবে তারই ছিল অপেক্ষা। তারও পাথেয় এবং খরচ জুগিয়েছেন কন্যার পিতা। লোকটার সর্দির ধাত, একান্ত মনে কামনা করেছিলুম ন্যুমোনিয়া হবে। হয় নি। পাস করলে পরীক্ষায়; দেশে ফেরবামাত্রই বিয়ে করলে ইন্‌ডিয়া গবর্মেণ্টের উচ্চপদস্থ মুরুব্বির মেয়েকে। লোকসমাজে নাতনির লজ্জা বাঁচাবার জন্যে মর্মাহত অধ্যাপক কোথায় অন্তর্ধান করেছেন জানি নে। অনতি-কালের মধ্যে ভবতোষের অপ্রত্যাশিত পদোন্নতির সংবাদ এল। মস্ত একটা বিদায়ভোজের আয়োজন হল। শুনেছি খরচটা দিয়েছে ভবতোষ গোপনে নিজের পকেট থেকে। আমরাও নিজের পকেট থেকেই খরচ দিয়ে গুণ্ডা লাগিয়ে ভোজটা দিলুম লণ্ডভণ্ড করে। কাগজে কংগ্রেসওয়ালাদের প্রতিই সন্দেহ প্রকাশ করেছিল ভবতোষেরই ইশারায়। আমি জানি এই সৎকার্যে তাদের কিছু ছিল না। যে নাগরা জুতো লেগেছিল পলায়মানের পিঠে, সেটা অধ্যাপকেরই এক প্রাক্তন ছাত্রের প্রশস্ত পায়ের মাপে। পুলিস এল গোলমালের অনেক পরে—ইনস্পেক্টর আমার বন্ধু, লোকটা সহৃদয়।'

চিঠিখানা পড়লুম, প্রাক্তন ছাত্রটির প্রতি ঈর্ষা হল।

·

অচিরার সঙ্গে প্রথম কথাটি শুরু করাই সব চেয়ে কঠিন কাজ। আমি বাঙালি মেয়েকে ভয় করি। বোধ করি চেনা নেই বলেই। অথচ কাজে যোগ দেবার কিছু আগেই কলকাতায় কাটিয়ে এসেছি। সিনেমামণ্ডপবর্তিনী বাঙালি মেয়ের নতুন-চাষ-করা ভ্রূবিলাস দেখে তো স্তম্ভিত হয়েছি—তারা সব জাতবান্ধবী—থাক্‌

তাদের কথা। কিন্তু অচিরাকে দেখলুম এ কালের ঠেলাঠেলি ভিড়ের বাইরে— নির্মল আত্মমর্যাদায়, স্পর্শভীরু মেয়ে।

আমি তাই ভাবছি প্রথম কথাটি শুরু করব কী করে।

জনরব এই-যে কাছাকাছি ডাকাতি হয়ে গেছে। ভাবলুম, হিতৈষী হয়ে বলি 'রাজা-বাহাদুরকে বলে আপনার জন্যে পাহারার বন্দোবস্ত করে দিই।' ইংরেজ মেয়ে হলে হয়তো গায়ে-পড়া আনুকূল্য সইতে পারত না, মাথা বাঁকিয়ে বলত 'সে ভাবনা আমার'। এই বাঙালি মেয়ে অচেনার কাছ থেকে কী ভাবে কথাটা নেবে আমার জানা নেই, হয়তো আমাকেই ডাকাত বলে সন্দেহ করবে।

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটল সেটা উল্লেখযোগ্য।

দিনের আলো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অচিরার সময় হয়েছে ঘরে ফেরবার। এমন সময়ে একটা হিন্দুস্থানী গোঁয়ার এসে তার হাত থেকে তার খাতা আর থলিটা নিয়ে যখন ছুটেছে আমি তখনই বনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বললুম, "কোনো ভয় নেই আপনার।" এই ব'লে ছুটে সেই লোকটার ঘাড়ের উপর পড়তেই সে ব্যাগ খাতা ফেলে দৌড় মারলে। আমি লুঠের মাল নিয়ে এসে অচিরাকে দিলুম। অচিরা বললে. "ভাগ্যিস আপনি— "

আমি বললেম, "আমার কথা বলবেন না, ভাগ্যিস ঐ লোকটা এসেছিল।"

"তার মানে!"

"তার মানে তারই কৃপায় আপনার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়ে গেল।"

অচিরা বিস্মিত হয়ে বললে, "কিন্তু ও যে ডাকাত!"

"এমন অন্যায় অপবাদ দেবেন না। ও আমার বরকন্দাজ, রামশরণ।"

অচিরা মুখের উপর খয়েরি রঙের আঁচল টেনে নিয়ে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল। হাসি থামতে চায় না। কী মিষ্টি তার ধ্বনি। যেন ঝর্‌নার নীচে নুড়ি-গুলো ঠুন্‌ঠুন্‌ করে উঠল সুরে সুরে। হাসি-অবসানে সে বললে, "কিন্তু সত্যি হলে খুব মজা হত।"

"মজা কার পক্ষে?"

"যাকে নিয়ে ডাকাতি।"

"আর উদ্ধারকর্তার?"

"বাড়ি নিয়ে গিয়ে তাকে এক পেয়ালা চা খাইয়ে দিতুম আর গোটা দুয়েক স্বদেশী বিস্কুট।"

"আর এই ফাঁকি উদ্ধারকর্তার কী হবে।"

"যে রকম শোনা গেল তাঁর তো আর-কিছুতে দরকার নেই, কেবল প্রথম কথাটা।"

"ঐ প্রথম পদক্ষেপেই গণিতের অগ্রগতিটা কি বন্ধ হবে।"

"কেন হবে। ওকে চালাবার জন্যে বরকন্দাজের সাহায্য দরকার হবে না।"

বসলুম সেখানেই ঘাসের উপরে। একটা কাটা গাছের গুঁড়ির উপরে বসে ছিল অচিরা। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি হলে আমাকে প্রথম কথাটা কী বলতেন।"

"বলতুম রাস্তায় ঘাটে ঢেলা কুড়িয়ে কুড়িয়ে করছেন কী। আপনার কি বয়স হয় নি।"

"বলেন নি কেন।"

"ভয় করেছিল।"

"আমাকে ভয় কিসের।"

"আপনি যে মস্ত লোক, দাদুর কাছে শুনেছি। তিনি আপনার লেখা প্রবন্ধ বিলিতি কাগজে পড়েছেন। তিনি যা পড়েন আমাকে শোনাতে চেষ্টা করেন।"

"এটাও কি করেছিলেন।"

"নিষ্ঠুর তিনি, করেছিলেন। লাটিন শব্দের ভিড় দেখে জোড়হাত করে তাঁকে বলেছিলুম, 'দাদু, এটা থাক্‌। বরঞ্চ তোমার সেই কোয়াণ্টম থিয়োরির বইখানা খোলো।' "

"সে থিয়োরিটা বুঝি আপনার জানা আছে?"

"কিছুমাত্র না। কিন্তু দাদুর দৃঢ় বিশ্বাস সবাই সব-কিছু বুঝতে পারে। আর তাঁর অদ্ভুত এই একটা ধারণা যে, মেয়েদের বুদ্ধি পুরুষদের বুদ্ধির চেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ। তাই ভয়ে ভয়ে আছি অবিলম্বে আমাকে 'টাইম্‌স্পেস'এর জোড়মিলনের ব্যাখ্যা শুনতে হবে। দিদিমা যখন বেঁচে ছিলেন, দাদু বড়ো বড়ো কথা পাড়লেই তিনি মুখ বন্ধ করে দিতেন; এটাই যে মেয়েদের বুদ্ধির প্রমাণ, দাদু কিন্তু সেটা বোঝেন নি।"

অচিরার দুই চোখ স্নেহে আর কৌতুকে ছল্‌ছল্‌ জ্বল্‌জ্বল্‌ করে উঠল।

দিনের আলো নিঃশেষ হয়ে এল। সন্ধ্যায় প্রথম তারা জ্বলে উঠেছে একটা একলা, তালগাছের মাথার উপরে। সাঁওতাল মেয়েরা ঘরে চলেছে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ ক'রে, দূর থেকে শোনা যাচ্ছে তাদের গান।

এমন সময় বাইরে থেকে ডাক এল, "কোথায় তুমি। অন্ধকার হয়ে এল যে! আজকাল সময় ভালো নয়।"

অচিরা উত্তর দিল, "সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তাই জন্যে একজন ভলাণ্টিয়র নিযুক্ত করেছি।"

আমি অধ্যাপকের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলুম। তিনি শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমি পরিচয় দিলুম, "আমার নাম শ্রীনবীনমাধব সেনগুপ্ত।"

বৃদ্ধের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, "বলেন কী। আপনিই ডাক্তার সেনগুপ্ত? কিন্তু আপনাকে যে বড়ো ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে।"

আমি বললুম, "ছেলেমানুষ না তো কী। আমার বয়স এই ছত্রিশের বেশি নয়— সাঁইত্রিশে পড়ব।"

আবার অচিরার সেই কলমধুর কণ্ঠের হাসি। আমার মনে যেন দুন লয়ের ঝংকারে সেতার বাজিয়ে দিল। বললে, "দাদুর কাছে সবাই ছেলেমানুষ। আর উনি নিজে সব ছেলেমানুষের আগরওয়াল।"

অধ্যাপক হেসে বললেন, "আগরওয়াল, ভাষায় নতুন শব্দের আমদানি!"

অচিরা বললে, "মনে নেই? সেই যে তোমার মাড়োয়াড়ি ছাত্র কুন্দনলাল আগর-ওয়ালা, আমাকে এনে দিত বোতলে করে কাঁচা আমের চাট্‌নি— তাকে জিগ্‌গেসা করেছিলুম আগরওয়াল শব্দের অর্থ কী, সে ফস্‌ করে বলে দিল পায়োনিয়র।"

অধ্যাপক বললেন, "ডাক্তার সেনগুপ্ত, আপনার সংগে আলাপ হল যদি,

আমাদের ওখানে খেতে যেতে হবে তো।"

"কিছু বলতে হবে না দাদু, খাবার জন্যে ওঁর মন লাফালাফি করছে। আমি যে এইমাত্র ওঁকে বলে দিয়েছি দেশকালের মিলনতত্ত্ব তুমি ব্যাখ্যা করবে।"

মনে মনে বললুম, 'বাস্ রে, কী দুষ্টুমি।'

অধ্যাপক উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন, "আপনার বুঝি 'টাইম-স্পেস'এর—"

আমি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলুম, "কিছু জানা নেই—বোঝাতে গেলে আপনার বৃথা সময় নষ্ট হবে।"

বৃদ্ধ ব্যগ্র হয়ে বলে উঠলেন, "এখানে সময়ের অভাব কোথায়। আচ্ছা, এক কাজ করুন-না, আজই চলুন আমার ওখানে আহার করবেন।"

আমি লাফ দিয়ে বলতে যাচ্ছিলুম, 'এখ্খুনি।' অচিরা বলে উঠল, "দাদু, সাধে তোমাকে বলি ছেলেমানুষ? যখন খুশি নেমন্তন্ন করে ফেল, আমি পড়ি মুশকিলে। ওঁরা বিলেতের ডিনার-খাইয়ে সর্বগ্রাসী মানুষ, কেন তোমার নাতনির বদনাম করবে!"

অধ্যাপক ধমক-খাওয়া বালকের মতো বললেন, "আচ্ছা, তবে আর কোন্ দিন আপনার সুবিধে হবে বলুন।"

"সুবিধে আমার কালই হতে পারবে কিন্তু অচিরাদেবীকে রসদ নিয়ে বিপন্ন করতে চাই নে। পাহাড়ে পর্বতে ঘুরি, সঙ্গে রাখি থলি ভরে চিঁড়ে, ছড়া কয়েক কলা, বিলিতি-বেগুন, কাঁচা ছোলার শাক, চিনেবাদাম। আমিই বরঞ্চ সঙ্গে নিয়ে আসব ফলারের আয়োজন। অচিরাদেবী যদি স্বহস্তে দই দিয়ে মেখে দেন লজ্জা পাবে ফিরপোর দোকান।"

"দাদু, বিশ্বাস কোরো না এই-সব মুখমিষ্টি লোককে। উনি নিশ্চয় পড়েছেন তোমার সেই লেখাটা বাংলা কাগজে, সেই ভিটামিনের গুণপ্রচার। তাই তোমাকে খুশি করবার জন্যে শোনালেন চিঁড়েকলার ফর্দ।"

মুশকিলে ফেললে। বাংলা কাগজ পড়া তো আমার ঘটেই ওঠে না।

অধ্যাপক উৎফুল্ল হয়ে জিগ্‌গেসা করলেন, "সেটা পড়েছেন বুঝি?"

অচিরার চোখের কোণে দেখতে পেলুম একটু হাসি। তাড়াতাড়ি শুরু করে দিলুম, "পড়ি আর নাই পড়ি তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে—"

আসল কথাটা আর হাতড়ে পাই নে।

অচিরা দয়া করে ধরিয়ে দিলে, "আসল কথা উনি নিশ্চিত জানেন, কাল যদি তোমার ওখানে নেমন্তন্ন জোটে তা হলে ওঁর পাতে পশুপক্ষী স্থাবরজঙ্গম কিছুই বাদ যাবে না। তাই অত নিশ্চিন্ত মনে বিলিতি-বেগুনের নামকীর্তন করলেন। দাদু, তুমি সবাইকে অত্যন্ত বেশি বিশ্বাস কর, এমন-কি, আমাকেও। সেইজন্যেই ঠাট্টা করে তোমাকে কিছু বলতে সাহস হয় না!"

কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে ওঁদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছি এমন সময় অচিরা হঠাৎ আমাকে বলে উঠল, "বাস্, আর নয়—এইবার যান বাসায় ফিরে।"

আমি বললুম, "দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেব।"

অচিরা বললে, "সর্বনাশ! দরজা পেরলেই আলুথালু উচ্ছৃঙ্খলতা, আমাদের

দুজনের সম্মিলিত রচনা। আপনি অবজ্ঞা করে বলবেন বাঙালি মেয়েরা অগোছালো। একটু সময় দিন, কাল দেখলে মনে হবে শ্বেতদ্বীপের শ্বেতভুজার অপূর্ব কীর্তি, মেমসাহেবী সৃষ্টি।"

অধ্যাপক কিছু কুণ্ঠিত হয়ে আমাকে বললেন, "আপনি কিছু মনে করবেন না—দিদি বড়ো বেশি কথা কচ্ছে। কিন্তু ওটা ওর স্বভাব নয় মোটে। এখানে অত্যন্ত নির্জন, তাই ও আমার মনের ফাঁক ভরে রেখে দেয় কথা কয়ে। সেটা ওর অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে। ও যখন চুপ করে থাকে ঘরটা ছম্‌ছম্‌ করতে থাকে, আমার মনটাও। ও নিজে জানে না সে কথা। আমার ভয় হয় পাছে বাইরের লোকে ওকে ভুল বোঝে।"

বুড়োর গলা জড়িয়ে ধরে অচিরা বললে, "বুঝুক-না দাদু! অত্যন্ত অনিন্দনীয়া হতে চাই নে, সেটা অত্যন্ত আন্‌ইণ্টারেস্টিঙ্‌।"

অধ্যাপক সগর্বে বলে উঠলেন, "আমার দিদি কিন্তু কথা বলতে জানে, অমন আর কাউকে দেখি নি।"

"তুমিও আমার মতো কাউকে দেখ নি, আমিও কাউকে দেখি নি তোমার মতো।"

আমি বললুম, "আচার্যদেব, আজ বিদায় নেবার পূর্বে আমাকে একটা কথা দিতে হবে।"

"আচ্ছা বেশ।"

"আপনি যতবার আমাকে আপনি বলেন, আমি মনে-মনে ততবার জিভ কাটি। আমাকে দয়া করে তুমি বলে যদি ডাকেন তা হলে মন সহজে সাড়া দেবে। আপনার নাতনিও সহকারিতা করবেন।"

অচিরা দুই হাত নেড়ে বললে, "অসম্ভব, আরও কিছুদিন যাক। সর্বদা দেখা-শুনো হতে হতে বড়োলোকের তিলকলাঞ্ছন যখন ঘষা পয়সার মতো পালিশ করা হয়ে যাবে তখন সবই সম্ভব হবে। দাদুর কথা স্বতন্ত্র। আমি বরঞ্চ ওঁকে পড়িয়ে নিই। বলো তো দাদু, 'তুমি কাল খেতে এসো। দিদি যদি মাছের ঝোলে নুন দিতে ভোলে, মুখ না বেঁকিয়ে বোলো, কী চমৎকার। বোলো, সবটা আমারই পাতে দেওয়া ভালো, অন্যরা এরকম রান্না তো প্রায়ই ভোগ করে থাকেন।' "

অধ্যাপক সস্নেহে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "ভাই, তুমি বুঝতে পারবে না আসলে এই মেয়েটি লাজুক, তাই যখন আলাপ করা কর্তব্য মনে করে তখন সংকোচ ঠেলে উঠতে গিয়ে কথা বেশি হয়ে পড়ে।"

"দেখেছেন ডক্টর সেনগুপ্ত? দাদু আমাকে কী রকম মধুর করে শাসন করেন। অনায়াসে বলতে পারতেন, তুমি বড়ো মুখরা, তোমার বকুনি অসহ্য। আপনি কিন্তু আমাকে ডিফেন্‌ড্‌ করবেন। কী বলবেন বলুন তো।"

"আপনার মুখের সামনে বলব না।"

"বেশি কঠোর হবে?"

"আপনি মনে-মনেই জানেন।"

"থাক্‌, থাক্‌, তা হলে বলে কাজ নেই। এখন বাড়ি যান।"

আমি বললুম, "তার আগে সব কথাটা শেষ করে নিই। কাল আপনাদের ওখানে আমার নেমন্তন্নটা নামকর্তন-অনুষ্ঠানের। কাল থেকে নবীনমাধব নামটা থেকে কাটা

পড়বে ডাক্তার সেনগুপ্ত। সূর্যের কাছাকাছি এলে ধূমকেতুর কেতুটা পায় লোপ, মুণ্ডুটা থাকে বাকি।"

এইখানে শেষ হল আমার বড়োদিন। দেখলুম বার্ধক্যের কী সৌম্যসুন্দর মূর্তি। পালিশ-করা লাঠি হাতে, গলায় শুভ্র পাট-করা চাদর, ধুতি যত্নে কোঁচানো, গায়ে তসরের জামা, মাথায় শুভ্র চুল বিরল হয়ে এসেছে কিন্তু পরিপাটি করে আঁচড়ানো। স্পষ্ট বোঝা যায় নাতনির হাতের শিল্পকার্য এঁর বেশভূষণে, এঁর দিনযাত্রায়। অতিলালনের অত্যাচার ইনি সস্নেহে সহ্য করেন, খুশি রাখবার জন্যে নাতনিটিকে।

এই গল্পের পক্ষে অধ্যাপকের ব্যবহারিক নাম অনিলকুমার সরকার। তিনি গত জেনেরেশনের কেম্‌ব্রিজের-বড়োপদবী-ধারী। মাস আষ্টেক আগে কোনো কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করে এখানকার এস্টেটের একটা পোড়ো বাড়ি ভাড়া নিয়ে নিজের খরচে সেটা বাসযোগ্য করেছেন।

অন্তপর্ব

আমার গল্পের আদিপর্ব হল শেষ। ছোটো গল্পের আদি ও অন্তের মাঝখানে বিশেষ একটা ছেদ থাকে না— ওর আকৃতিটা গোল।

অচিরার সঙ্গে আমার অপরিচয়ের ব্যবধান ক্ষয় হয়ে আসছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে যেন পরিচয়টাই ব্যবধান। কাছাকাছি আসছি বটে কিন্তু তাতে একটা প্রতিঘাত জাগছে। কেন। অচিরার প্রতি আমার ভালোবাসা ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে আসছে, অপরাধ কি তারই মধ্যে। কিংবা আমার দিকে ওর সৌহৃদ্য স্ফুটতর হয়ে উঠছে, সেইটেতেই ওর গ্লানি? কে জানে।

সেদিন চড়িভাতি তনিকা নদীর তীরে।

অচিরা ডাক দিলে, "ডাক্তার সেনগুপ্ত!"

আমি বললুম, "সেই প্রাণীটার কোনো ঠিকানা নেই, সুতরাং কোনো জবাব মিলবে না।"

"আচ্ছা, তা হলে নবীনবাবু।"

"সেও ভালো, যাকে বলে মন্দর ভালো।"

"কাণ্ডটা কী দেখলেন তো?"

আমি বললুম, "আমার সামনে লক্ষ্য করবার বিষয় কেবল একটিমাত্রই ছিল, আর কিছুই ছিল না।"

এইটুকু ঠাট্টায় অচিরা সত্যই বিরক্ত হয়ে বললে, "আপনার আলাপ ক্রমেই যদি অমন ইশারাওয়ালা হয়ে উঠতে থাকে তা হলে ফিরিয়ে আনব ডাক্তার সেনগুপ্তকে, তাঁর স্বভাব ছিল গম্ভীর।"

আমি বললুম, "আচ্ছা, তা হলে কাণ্ডটা কী হয়েছিল বলুন।"

"ঠাকুর যে ভাত রেঁধেছিল সে কড়্‌কড়ে, আধেক তার চাল। আমি বললুম, 'দাদু, এ তো তোমার চলবে না।' দাদু অমনি বলে বসলেন, 'জান তো ভাই, খাবার জিনিস শক্ত হলে ভালো করে চিবোবার দরকার হয়, তাতেই হজমের সাহায্য করে।'

পাছে আমি দুঃখ করি দাদুর জেগে উঠল সায়েন্সের বিদ্যে। নিমকিতে নুনের বদলে যদি চিনি দিত তা হলে নিশ্চয় দাদু বলত, চিনিতে শরীরের এনার্জি বাড়িয়ে দেয়।—

"দাদু, ও দাদু, তুমি ওখানে বসে বসে কী পড়ছ। আমি সে এ দিকে তোমার চরিত্রে অতিশয়োক্তি-অলংকার আরোপ করছি, আর নবীনবাবু সমস্তই বেদবাক্য বলে বিশ্বাস করে নিচ্ছেন।"

কিছু দূরে পোড়ো মন্দিরের সিঁড়ির উপরে বসে অধ্যাপক বিলিতি ত্রৈমাসিক পড়ছিলেন। অচিরার ডাক শুনে সেখান থেকে উঠে আমাদের কাছে বসলেন। ছেলেমানুষের মতো হঠাৎ আমাকে জিগ্‌গেসা করলেন, "আচ্ছা নবীন, তোমার কি বিবাহ হয়েছে।"

কথাটা এতই সুস্পষ্টভাবব্যঞ্জক যে আর কেউ হলে বলত না, কিংবা ঘুরিয়ে বলত।

আমি আশাপ্রদ ভাষায় উত্তর দিলুম, "না, এখনও হয় নি।"

অচিরার কাছে কোনো কথা এড়ায় না। সে বললে, "ঐ এখনও শব্দটা সংশয়-গ্রস্ত কন্যাকর্তাদের মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে, ওর কোনো যথার্থ অর্থ নেই।"

"একেবারেই নেই নিশ্চিত ঠাওরালেন কী করে।"

"ওটা গণিতের প্রব্লেম, সেও হাইয়ার ম্যাথ্‌ম্যাটিক্‌স্ নয়। পূর্বেই শোনা গেছে আপনি ছত্রিশ বছরের ছেলেমানুষ। হিসেব করে দেখলুম এর মধ্যে আপনার মা অন্তত পাঁচ-সাত-বার বলেছেন, 'বাবা, ঘরে বউ আনতে চাই।' আপনি জবাব করেছেন, 'তার পূর্বে ব্যাঙ্কে টাকা আনতে চাই।' মা চোখের জল মুছে চুপ করে রইলেন, তার পরে মাঝখানে আপনার আর-সব ঘটেছিল— কেবল ফাঁসি ছিল বাকি। শেষকালে এখানকার রাজসরকারে মোটা মাইনের কাজ জুটল। মা বললেন, 'এইবার বউ নিয়ে এসো ঘরে। বড়ো কাজ পেয়েছ।' আপনি বললেন, 'বিয়ে করে সে কাজ মাটি করতে পারব না।' আপনার ছত্রিশ বছরের গণিতফল গণনা করতে ভুল হয়েছে কি না বলুন।"

এ মেয়ের সঙ্গে অনবধানে কথা বলা নিরাপদ নয়। কিছুদিন আগেই আমার একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। কথায় কথায় অচিরা আমাকে বলেছিল, "আমাদের দেশের মেয়েরা আপনাদের সংসারের সঙ্গিনী হতে পারে কিন্তু বিলেতে যারা জ্ঞানের তাপস তাদের তপস্যার সঙ্গিনী তো জোটে যেমন ছিলেন অধ্যাপক কুরির সধর্মিণী মাদাম কুরি। আপনার কি তেমন কেউ জোটে নি।"

মনে পড়ে গেল ক্যাথারিনকে। সে একই কালে আমার বিজ্ঞানের এবং জীবন-যাত্রার সাহচর্য করতে চেয়েছিল।

অচিরা জিগ্‌গেসা করলে, "আপনি কেন তাঁকে বিয়ে করতে চাইলেন না।"

কী উত্তর দেব ভাবছিলুম— অচিরা বললে, "আমি জানি কেন। আপনার সত্যভঙ্গ হবে এই ভয় ছিল ; নিজেকে আপনার মুক্ত রাখতেই হবে। আপনি যে সাধক। আপনি তাই নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর নিজের প্রতি, নিষ্ঠুর তার 'পরে যে আপনার পথের সামনে আসে। এই নিষ্ঠুরতায় আপনার বীরত্ব দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার সে বললে, "বাংলা সাহিত্য বোধ হয় আপনি

পড়েন না। কচ ও দেবযানী বলে একটা কবিতা আছে। তার শেষ কথাটা এই, মেয়েদের ব্রত পুরুষকে বাঁধা আর পুরুষের ব্রত মেয়ের বাঁধন কাটিয়ে স্বর্গলোকের রাস্তা বানানো। কচ বেরিয়ে পড়েছিল দেবযানীর অনুরোধ এড়িয়ে, আর আপনি মায়ের অনুনয়—একই কথা।"

আমি বললুম, "দেখুন, আমি হয়তো ভুল করেছিলুম। মেয়েদের নিয়ে পুরুষের কাজ যদি না চলে, তা হলে মেয়েদের সৃষ্টি কেন।"

অচিরা বললে, "বারো-আনার চলে মেয়েরা তাদের জন্যেই। কিন্তু বাকি মাইনরিটি, যারা সব-কিছু পেরিয়ে নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়েছে, তাদের চলে না। সব-পেরোবার মানুষকে মেয়েরা যেন চোখের জল ফেলে রাস্তা ছেড়ে দেয়। যে দুর্গম পথে মেয়ে-পুরুষের চিরকালের দ্বন্দ্ব সেখানে পুরুষেরা হোক জয়ী। যে মেয়েরা মেয়েলি, প্রকৃতির বিধানে তাদের সংখ্যা অনেক বেশি, তারা ছেলে মানুষ করে, সেবা করে ঘরের লোকের। যে পুরুষ যথার্থ পুরুষ, তাদের সংখ্যা খুব কম; তারা অভিব্যক্তির শেষ কোঠায়। মাথা তুলছে দুটি-একটি করে। মেয়েরা তাদের ভয় পায়, বুঝতে পারে না, টেনে আনতে চায় নিজের অধিকারের গণ্ডিতে। এই তত্ত্ব শুনেছি আমার দাদুর কাছে।—

"দাদু, তোমার পড়া রেখে আমার কথা শোনো। মনে আছে?—তুমি একদিন বলেছিলে, পুরুষ যেখানে অসাধারণ সেখানে সে নিরতিশয় একলা, নিদারুণ তার নিঃসঙ্গতা, কেননা তাকে যেতে হয় যেখানে কেউ পৌঁছয় নি। আমার ডায়ারিতে লেখা আছে।"

অধ্যাপক মনে করবার চেষ্টা করে বললেন, "বলেছিলুম নাকি। হয়তো বলেছিলুম।"

অচিরা খুব বড়ো কথাও কয় হাসির ছলে, আজ সে অত্যন্ত গম্ভীর।

খানিক বাদে আবার সে বললে, "দেবযানী কচকে কী অভিসম্পাত দিয়েছিল জানেন?"

"না।"

"বলেছিল, তোমার সাধনায় পাওয়া বিদ্যা তোমার নিজের ব্যবহারে লাগাতে পারবে না। যদি এই অভিসম্পাত আজ দিত দেবতা য়ুরোপকে, তা হলে য়ুরোপ বেঁচে যেত। বিশ্বের জিনিসকে নিজের মাপে ছোটো করেই ওখানকার মানুষ মরছে লোভের তাড়ায়।—সত্যি কি না বলো দাদু!"

"খুব সত্যি, কিন্তু এত কথা কী করে ভাবলে।"

"নিজের বুদ্ধিতে না। একটা তোমার মহদ্‌গুণ আছে, কখন কাকে কী যে বল, ভোলানাথ তুমি সব ভুলে যাও। তাই চোরাই মালের উপর নিজের ছাপ লাগিয়ে দিতে ভাবনা থাকে না।"

আমি বললুম, "নিজের ছাপ যদি লাগে তা হলেই অপরাধ খণ্ডন হয়।"

"জানেন, নবীনবাবু, ওঁর কত ছাত্র ওঁর কত মুখের কথা খাতায় টুকে নিয়ে বই লিখে নাম করেছে? উনি তাই পড়ে আশ্চর্য হয়ে প্রশংসা করেছেন, বুঝতেই পারেন নি নিজের প্রশংসা নিজেই করছেন। কোন্‌ কথা আমার কথা আর কোন্‌ কথা ওঁর নিজের, সে ওঁর মনে থাকে না—লোকের সামনে আমাকে বলে বসেন

ওরিজিন্যাল, তখন সেটার প্রতিবাদ করার মতো মনের জোর পাওয়া যায় না। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নবীনবাবুরও এ ভ্রম ঘটছে।—কী করব বলো, আমি তো কোটেশন-মার্কা দিয়ে দিয়ে কথা বলতে পারি নে।"

"নবীনবাবুর এ ভ্রম কোনোদিন ঘুচবে না।"

অচিরা বললে, "দাদু একদিন আমাদের কলেজ-ক্লাসে কচ ও দেবযানীর ব্যাখ্যা করছিলেন। কচ হচ্ছে পুরুষের প্রতীক, আর দেবযানী মেয়ের। সেই দিন নির্মম পুরুষের মহৎ গৌরব মনে-মনে মেনেছি, মুখে কক্‌খনো স্বীকার করি নে।"

অধ্যাপক বললেন, "কিন্তু দিদি, আমার কোনো কথায় মেয়েদের গৌরবের আমি কোনোদিন লাঘব করি নি।"

"তুমি আবার করবে! হায় রে! মেয়েদের তুমি যে অন্ধ ভক্ত। তোমার মুখের স্তবগান শুনে মনে-মনে হাসি। মেয়েরা নির্লজ্জ হয়ে সব মেনে নেয়। তার উপরেও বুক ফুলিয়ে সতীসাধ্বীগিরির বড়াই করে নিজের মুখে। সস্তায় প্রশংসা আত্মসাৎ করা ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে।"

অধ্যাপক বললেন, "না দিদি, অবিচার কোরো না। অনেক কাল ওরা হীনতা সহ্য করেছে, হয়তো সেই জন্যেই নিজেদের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে একটু বেশি জোর দিয়ে তর্ক করে।"

"না দাদু, ও তোমার বাজে কথা। আসল হচ্ছে এটা স্ত্রীদেবতার দেশ—এখানে পুরুষেরা স্ত্রৈণ, মেয়েরাও স্ত্রৈণ। এখানে পুরুষরা কেবলই 'মা মা' করছে, আর মেয়েরা চিরশিশুদের আশ্বাস দিচ্ছে যে তারা মায়ের জাত। আমার তো লজ্জা করে। পশুপক্ষীদের মধ্যেও মায়ের জাত নেই কোথায়।"

চিত্তচাঞ্চল্যে কাজের এত বাধা ঘটছে যে লজ্জা পাচ্ছি মনে-মনে। সদরে বাজেটের মিটিঙে রিসর্চ্‌ বিভাগে আরও কিছু দান মঞ্জুর করিয়ে নেবার প্রস্তাব ছিল। তার সমর্থক রিপোর্ট্‌খানা অর্ধেকের বেশি লেখাই হয় নি। অথচ এ দিকে ক্রোচের এস্‌থেটিক্‌স্‌ নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা শুনে আসছি। অচিরা নিশ্চিত জানে বিষয়টা আমার উপলব্ধি ও উপভোগের সম্পূর্ণ বাইরে। তা হলেও চলত, কিন্তু আমার বিশ্বাস ব্যাপারটাকে সে ইচ্ছে করে শোচনীয় করে তুলেছে। ঠিক এই সময়টাতেই সাঁওতালদের পার্বণ। তারা পচাই মদ খাচ্ছে আর মাদল বাজিয়ে মেয়ে-পুরুষে নৃত্য করছে। অচিরা ওদের পরম বন্ধু। মদের পয়সা জোগায়, সালু কিনে দেয় সাঁওতাল ছেলেদের কোমর বাঁধবার জন্যে, বাগান থেকে জবাফুলের জোগান দেয় সাঁওতাল মেয়েদের চুলে পরবার। ওকে না হলে তাদের চলেই না। অচিরা অধ্যাপককে বলেছে, ও তো এ কদিন থাকতে পারবে না, অতএব এই সময়টাতে বিরলে আমাকে নিয়ে ক্রোচের রসতত্ত্ব যদি পড়ে শোনান তা হলে আমার সময় আনন্দে কাটবে। একবার সসংকোচে বলেছিলুম, 'সাঁওতালদের উৎসব দেখতে আমার বিশেষ কৌতূহল আছে।' স্বয়ং অধ্যাপক বললেন, 'না, সে আপনার ভালো লাগবে না।' আমার ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল মনোবৃত্তির নির্জলা একান্ততার 'পরে তাঁর এত বিশ্বাস। মধ্যাহ্নভোজনের পরেই অধ্যাপক গুন্‌ গুন্‌ করে পড়ে চলেছেন। দূরে মাদলের আওয়াজ এক-একবার থামছে। পরক্ষণেই দ্বিগুণ জোরে বেজে উঠছে।

কখনও বা পদশব্দ কল্পনা করছি, কখনও বা হতাশ হয়ে ভাবছি অসমাপ্ত রিপোর্টের কথা। সুবিধে এই অধ্যাপক জিগ্‌গেসাই করেন না কোথাও আমার ঠেকছে কি না। তিনি ভাবেন সমস্তই জলের মতো সোজা। মাঝে মাঝে প্রতিবাদ উপলক্ষে প্রশ্ন করেন, 'আপনারও কি এই মনে হয় না।' আমি খুব জোরের সঙ্গে বলি, 'নিশ্চয়!'

ইতিমধ্যে কিছুদূরে আমাদের অর্ধসমাপ্ত কয়লার খনিতে মজুরদের হল স্ট্রাইক। ঘটালেন যিনি, এই তাঁর ব্যাবসা, স্বভাব এবং অভাব -বশত; সমস্ত কাজের মধ্যে এইটেই সব চেয়ে সহজ। কোনো কারণ ছিল না—কেননা আমি নিজে সোশালিস্ট্‌, সেখানকার বিধিবিধান আমার নিজের হাতে বাঁধা, কারও সেখানে না ছিল লোকসান, না ছিল অসম্মান।

নূতন যন্ত্র এসেছে জর্মানি থেকে, তারই খাটাবার চেষ্টায় ব্যস্ত আছি। এমন সময় উত্তেজিতভাবে এসে উপস্থিত অচিরা। বললে, "আপনি মোটা মাইনে নিয়ে ধনিকের নায়েবি করছেন, এ দিকে গরিবের দারিদ্র্যের সুযোগটাকে নিয়ে আপনি—"

চন্‌ করে উঠল মাথা। বাধা দিয়ে বললুম, "কাজ চালাবার দায়িত্ব এবং ক্ষমতা যাদের তারাই অন্যায়কারী আর জগতে যারা কোনো কাজই করে না, করতে পারেও না, দয়ামায়া কেবল তাদেরই—এই সহজ অহংকারের মত্ততায় সত্য-মিথ্যার প্রমাণ নিতেও মন চায় না।"

অচিরা বললে, "সত্য নয় বলতে চান?"

আমি বললুম, "সত্য শব্দটা আপেক্ষিক। যা-কিছু যত ভালোই হোক, তার চেয়ে আরও ভালো হতেও পারে। এই দেখুন-না আমার মোটা মাইনে বটে, তার থেকে মাকে পাঠাই পঞ্চাশ, নিজে রাখি ত্রিশ, আর বাকি—সে হিসেবটা থাক্‌। কিন্তু মার জন্যে পনেরো নিজের জন্যে পাঁচ রাখলে আইডিয়ালের আরও কাছ ঘেঁষে যেত, কিন্তু একটা সীমা আছে তো।"

অচিরা বললে, "সীমাটা কি নিজের ইচ্ছের উপরেই নির্ভর করে।"

আমি বললুম, "না, অবস্থার উপরে। যে কথাটা উঠল সেটা একটু বিচার করে দেখুন। য়ুরোপে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজ্‌ম্‌ গড়ে উঠেছে দীর্ঘকাল ধরে। যাদের হাতে টাকা ছিল এবং টাকা করবার প্রতিভা ছিল তারাই এটা গড়েছে। গড়েছে নিছক টাকার লোভে—সেটা ভালো নয় তা মানি। কিন্তু ঐ ঘুষটুকু যদি না পেত তা হলে একেবারে গড়াই হত না। এতদিন পরে আজ ওখানে পড়েছে হিসেবনিকেশের তলব।"

অচিরা বললে, "আপনি বলতে চান পায়ে তেল শুরুতে, কানমলা তার পরে?"

"নিশ্চয়। আমাদের দেশে ভিত গাঁথা সবে আরম্ভ হয়েছে, এখনই যদি মার লাগাই তা হলে শুরুতেই হবে শেষ—সুবিধে হবে বিদেশী বণিকদের। মানছি আজ আমি লোভীদের ঘুষ দেওয়ার কাজ নিয়েছি, টাকাওয়ালার নায়েবি আমি করি। আজ সেলাম করছি বাদশার দরবারে এসে, কাল ওদের সিংহাসনের পায়ায় লাগাব কুড়ুল। ইতিহাসে তো এই দেখা গেছে।"

অচিরা বললে, "সব বুঝলুম। কিন্তু আমি দিনের পর দিন অপেক্ষা করে আছি দেখতে, এই স্ট্রাইক মেটাতে আপনি নিজে কবে যাবেন। নিশ্চয়ই আপনাকে ডাকও পড়েছিল। কিন্তু কেন যান নি।"

চাপা গলায় বলতে চেষ্টা করলুম, "এখানে কাজ ছিল বিস্তর।"

কিন্তু ফাঁকি দেব কী করে। আমার ব্যবহারে তো আমার কৈফিয়তের প্রমাণ হয় না।

কঠিন হাসি হেসে দ্রুতপদে চলে গেল অচিরা।

আর চলবে না। একটা শেষ নিষ্পত্তি করাই চাই। নইলে অপমানের অন্ত থাকবে না।

সাঁওতালী পার্বণ শেষ হয়েছে। সকালে বেড়াতে বেরিয়েছি। অচিরা সঙ্গে ছিল। উত্তরের দিকে একটা পাহাড় উঠেছে, আকাশের নীলের চেয়ে ঘন নীল। তার গায়ে গায়ে চারা শাল আর বৃদ্ধ শাল গাছে বন অন্ধকার। মাঝখান দিয়ে কাঠুরেদের পায়ে-চলার পথ। অধ্যাপক একটা অর্কিড ফুল বিশেষ করে পর্যবেক্ষণ করছেন, তাঁর পকেটে সর্বদা থাকে আতস কাচ।

গাছগুলোর মধ্যে অন্ধকার যেখানে ভ্রূকুটিল হয়ে উঠেছে আর ঝিঁঝিঁপোকা ডাকছে তীব্র আওয়াজে, অচিরা বসল একটা শেওলাঢাকা পাথরের উপর। পাশে ছিল মোটা জাতের বাঁশগাছ, তারই ছাঁটা কঞ্চির উপর আমি বসলুম। আজ সকাল থেকে অচিরার মুখে বেশি কথা ছিল না। সেই জন্যেই তার সঙ্গে আমার কথা কওয়া বাধা পাচ্ছিল।

সামনের দিকে তাকিয়ে এক সময় সে আস্তে আস্তে বলে উঠল, "সমস্ত বনটা মিলে প্রকাণ্ড একটা বহু-অঙ্গ-ওয়ালা প্রাণী। গুঁড়ি মেরে বসে আছে শিকারি জন্তুর মতো। যেন স্থলচর অক্টোপাশ, কালো চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার নিরন্তর হিপ্‌নটিজমে ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে আমার মনের মধ্যে একটা ভয়ের বোঝা যেন নিরেট হয়ে উঠছে।"

আমি বললুম, "কতকটা এই রকম কথাই এই সেদিন আমার ডায়ারিতে লিখেছি।"

অচিরা বলে চলল, "মনটা যেন পুরোনো ইমারত, সকল কাজের বার। নিষ্ঠুর অরণ্য যেখানে পেয়েছে তার ফাটল, চালিয়ে দিয়েছে শিকড়, সমস্ত ভিতরটাকে টানছে ভাঙনের দিকে। এই বোবা কালা মহাকায় জন্তু মনের ফাটল আবিষ্কার করতে মজবুত—আমার ভয় বেড়ে চলেছে। দাদু বলেছিলেন, 'লোকালয় থেকে একান্ত দূরে থাকলে মানুষের মনঃপ্রকৃতি আসে অবশ হয়ে, প্রবল হয়ে ওঠে তার প্রাণ-প্রকৃতি।' আমি জিগ্‌গেস করলুম, 'এর প্রতিকার কী।' তিনি বললেন, 'মানুষের মনের শক্তিকে আমরা সঙ্গে করে আনতে পারি, এই দেখো-না এনেছি তাকে আমার লাইব্রেরিতে।' দাদুর উপযুক্ত এই উত্তর। কিন্তু আপনি কী বলেন।"

আমি বললুম "আমাদের মন খোঁজে এমন একজন মানুষের সঙ্গ যে আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ জাগিয়ে রাখতে পারে, চেতনার বন্যা বইয়ে দেয় জনশূন্যতার মধ্যে। এ তো লাইব্রেরির সাধ্য নয়।"

অচিরা একটু অবজ্ঞা করে বললে, "আপনি যার খোঁজ করছেন তেমন মানুষ পাওয়া যায় বই-কি, যদি বড্ড দরকার পড়ে। তারা চৈতন্যকে উসকিয়ে তোলে নিজের দিকেই, বন্যা বইয়ে দিয়ে সাধনার বাঁধ ভেঙে ফেলে। এ সমস্তই কবিদের বানানো

কথা, মোহরস দিয়ে জারানো। আপনাদের মতো বুকের-পাটা-ওয়ালা লোকের মুখে মানায় না। প্রথম যখন আপনাকে দেখেছিলুম, তখন দেখেছি আপনি রস খুঁজে বেড়ান নি, পথ খুঁড়ে বেরিয়েছিলেন কড়া মাটি ভেঙে। দেখেছি আপনার নিরাসক্ত পৌরুষের মূর্তি—সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আপনাকে প্রণাম করেছি। আজ আপনি কথার পুতুল দিয়ে নিজেকে ভোলাতে বসেছেন। এ দশা ঘটালে কে। স্পষ্ট করেই জিজ্ঞাসা করি, এর কারণ কি আমি।"

আমি বললুম, "তা হতে পারে। কিন্তু আপনি তো সাধারণ মেয়ে নন। পুরুষকে আপনি শক্তি দেবেন।"

"হাঁ, শক্তি দেব, যদি নিজেকেই মোহ জড়িয়ে না ধরে। আভাসে বুঝেছি আপনি আমার ইতিহাস কিছু কিছু সংগ্রহ করেছেন। আপনার কাছে কিছু ঢাকবার দরকার নেই। আপনি শুনেছেন আমি ভবতোষকে ভালোবেসেছিলুম।"

"হাঁ, শুনেছি।"

"এও জানেন আমার ভালোবাসার অপমান ঘটেছে।"

"হাঁ, জানি।"

"সেই অপমানিত ভালোবাসা অনেক দিন ধরে আমাকে আঁকড়ে ধরে দুর্বল করেছে। আমি জেদ করে বসেছিলুম তারই একনিষ্ঠ স্মৃতিকে জীবনের পুজা-মন্দিরে বসাব। চিরদিন একমনে সেই নিষ্ফল সাধনা করব মেয়েরা যাকে বলে সতীত্ব। নিজের ভালোবাসার অহংকারে সংসারকে ঠেলে ফেলে নির্জনে চলে এসেছি। কর্তব্যকে অবজ্ঞা করেছি, নিজের দুঃখকে সম্মান করব বলে। আমার দাদুকে অনায়াসে সরিয়ে এনেছি তাঁর কাজের ক্ষেত্র থেকে। যেন এই মেয়েটার হৃদয়ের অহমিকা পৃথিবীর সব-কিছুর উপরে। মোহ, মোহ, অন্ধ মোহ!"

খানিক ক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ সে বলে উঠল, 'জানেন? আপনিই সেই মোহ ভাঙিয়ে দিয়েছেন।"

বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

সে বললে, "আপনিই এই আত্মাবমাননা থেকে ছিনিয়ে এনে আমাকে বাঁচালেন।"

স্তব্ধ রইলুম নিরুত্তর প্রশ্ন নিয়ে।

"আপনি তখনও আমাকে দেখেন নি। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখেছি আপনার দুঃসাধ্য প্রয়াসের দিনগুলি—সঙ্গ নেই, আরাম নেই, ক্লান্তি নেই, একটু কোথাও ছিদ্র নেই অধ্যবসায়ে। দেখেছি আপনার প্রশস্ত ললাট, আপনার চাপা ঠোঁটে অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তির লক্ষণ, আর দেখেছি মানুষকে কী রকম অনায়াসে প্রভুত্বের জোরে চালনা করেন। দাদুর কাছে আমি মানুষ—আমি পুরুষের ভক্ত, যে পুরুষ সত্য, যে পুরুষ তপস্বী। সেই পুরুষকেই দেখবার জন্যে আমার ভক্তিপিপাসু নারী ভিতরে ভিতরে অপেক্ষা করে ছিল নিজের অগোচরে। মাঝখানে এসেছিল অপদেবতা প্রবৃত্তির টানে। অবশেষে নিষ্কাম পুরুষের সুদৃঢ় শক্তিরূপ আপনিই আনলেন আমার চোখের সামনে।"

আমি জিগ্গেসা করলুম, "তার পর কি ভাবের পরিবর্তন হয়েছে।"

"হাঁ, হয়েছে। আপনার বেদি থেকে নেমে এসেছেন প্রতিদিন। স্থানীয় কাগজে পড়লুম, দূরে অন্য-এক জায়গায় সন্ধানের কাজে আপনার ডাক পড়েছে। আপনি

নড়লেন না, ভিতরে ভিতরে আত্মগ্লানি ভোগ করলেন। আপনার পথের সামনেকার ঢেলাখানার মতো আমাকে লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন না কেন। কেন নিষ্ঠুর হতে পারলেন না। যদি পারতেন তবে আমি ধন্য হতুম। আমার ব্রতের পারণা হত আমার কান্না দিয়ে।"

মৃদুস্বরে বললুম, "যাবার জন্যেই কাগজপত্তর গুছিয়ে নিচ্ছিলুম।"

"না, না, কখনোই না। মিথ্যে ছুতো করে নিজেকে ভোলাচ্ছিলেন। যতই দেখলুম আপনার দুর্বলতা, ভয় হতে লাগল আমার নিজেকে নিয়ে। ছি, ছি, কী পরাভবের বিষ এনেছি নারীর জীবনে, কেবল অন্যের জন্য নয়, নিজের জন্যেও। ক্রমশই একটা চাঞ্চল্য আমাকে পেয়ে বসল, সে যেন এই বনের বিষনিশ্বাস থেকে। একদিন এখানকার পিশাচী রাত্রি এমন আমাকে আবিষ্ট করে ধরেছিল যে মনে হল যে, এত বড়ো প্রবৃত্তিরাক্ষসীও আছে যে আমার দাদুর কাছ থেকেও আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে। তখনই সেই রাত্রেই ছুটে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ডুব দিয়ে স্নান করে এসেছি।"

এই কথা বলতে বলতে অচিরা ডাক দিল, "দাদু!"

অধ্যাপক গাছতলায় বসে পড়ছিলেন। উঠে এসে স্নেহের স্বরে বললেন, "কী দিদি। দূর থেকে বসে বসে ভাবছিলুম, তোমার উপরে আজ বাণী ভর দিয়েছেন— জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে তোমার চোখ দুটি।"

"আমার কথা থাক্‌, তুমি শোনো। তুমি সেদিন বলেছিলে মানুষের চরম অভিব্যক্তি তপস্যার মধ্যে দিয়ে।"

"হাঁ, আমি তাই তো বলি। বর্বর মানুষ জন্তুর পর্যায়ে। কেবলমাত্র তপস্যার মধ্য দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মানুষ। আরও তপস্যা আছে সামনে, স্থূল আবরণ যুগে যুগে ত্যাগ করতে করতে সে হবে দেবতা। পুরাণে দেবতার কল্পনা আছে— কিন্তু দেবতা ছিলেন না অতীতে, দেবতা আছেন ভবিষ্যতে। মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।"

অচিরা বললে, "দাদু, এইবার এসো, তোমার-আমার কথাটা আপসে চুকিয়ে দিই, কদিন থেকে মনের মধ্যে তোলপাড় করছে।"

আমি উঠে পড়লুম; বললুম, "তা হলে যাই।"

"না, আপনি বসুন।—দাদু, সেই-যে কলেজের অধ্যক্ষপদটা তোমার ছিল, সেটা খালি হয়েছে। তোমাকে ডাক দিয়েছে ওরা।"

অধ্যাপক আশ্চর্য হয়ে বললেন, "কী করে জানলে ভাই।"

"তোমার কাছে চিঠি এসেছে, সে আমি চুরি করেছি।"

"চুরি করেছ!"

"করব না! আমাকে সব চিঠিই দেখাও, কেবল কলেজের ছাপ-মারা ঐ চিঠিটাই দেখালে না! তোমার দুরভিসন্ধি সন্দেহ করে চুরি করে দেখতে হল।"

অধ্যাপক অপরাধীর মতো ব্যস্ত হয়ে বললেন, "আমারই অন্যায় হয়েছে।"

"কিছু অন্যায় হয় নি। আমাকে লুকোতে চেয়েছিলে যে আমার জীবনের অভিসম্পাত এখনও তুমি নিজের উপর টেনে নিয়ে চলবে। তোমার আপন আসন থেকে আমি যে নামিয়ে এনেছি তোমাকে। আমাদের তো ঐ কাজ।"

"কী বলছ দিদি।"

"সত্যি কথাই বলছি। তুমি শিক্ষাদানযজ্ঞের হোতা, এখানে এনে আমি তোমাকে করেছি শুধু গ্রন্থকীট। বিশ্বসৃষ্টি বাদ দিলে কী দশা হয় বিশ্বকর্তার? ছাত্র না থাকলে তোমার হয় ঠিক তেমনি। সত্যি কথা বলো।"

"বরাবর ইস্কুলমাস্টারি করে এসেছি কিনা।"

"তুমি আবার ইস্কুলমাস্টার! কী যে বল তুমি! তুমি যে স্বভাবতই আচার্য। দেখেন নি নবীনবাবু?—ওঁর মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে কি, আর দয়ামায়া থাকে না। অমনি আমাকে নিয়ে পড়েন—বারো-আনাই বুঝতেই পারি নে। নইলে হাতড়িয়ে বের করেন এই নবীনবাবুকে, সে হয় আরও শোচনীয়। দাদু, ছাত্র তোমার নিতান্তই চাই জানি, কিন্তু বাছাই করে নিয়ো, রূপকথার রাজা সকালে ঘুম থেকে উঠেই যার মুখ দেখত তাকেই কন্যা দান করত। তোমার বিদ্যাদান অনেকটা সেই রকম।"

"না দিদি, আমাকে বাছাই করে নেয় যারা তারাই সাহায্য পায় আমার। এখনকার দিনে কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাত্র সংগ্রহ করে, আগেকার দিনে সন্ধান করে শিক্ষক লাভ করত শিক্ষার্থী।"

"আচ্ছা, সে কথা পরে হবে। এখনকার সিদ্ধান্ত এই যে, তোমাকে তোমার সেই কাজটা ফিরিয়ে নিতে হবে।"

অধ্যাপক হতবুদ্ধির মতো নাতনির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

অচিরা বললে, "তুমি ভাবছ, আমার গতি কী হবে। আমার গতি তুমি। আর আমাকে ছাড়লে তোমার কী গতি জানই তো। এখন যে তোমার পনেরোই আশ্বিনে পনেরোই অক্টোবরে এক হয়ে যায়, নিজের নূতন ছাতার সঙ্গে পরের পুরোনো ছাতার স্বত্বাধিকারে ভেদজ্ঞান থাকে না, গাড়ি চ'ড়ে ড্রাইভারকে এমন ঠিকানা বাতলিয়ে দাও সেই ঠিকানায় আজ পর্যন্ত কোনো বাড়ি তৈরি হয় নি, আর চাকরের ঘুম ভাঙবার ভয়ে সাবধানে পা টিপে টিপে কলতলায় নিজে গিয়ে কুঁজোয় জল ভরে নিয়ে আস।"

অধ্যাপক আমার দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি কী বল নবীন?"

কী জানি ওঁর হয়তো মনে হয়েছিল ওঁদের এই পারিবারিক প্রস্তাবে আমার ভোটেরও একটা মূল্য আছে।

আমি খানিক ক্ষণ চুপ করে রইলুম, তার পরে বললুম, "অচিরাদেবীর চেয়ে সত্য পরামর্শ আপনাকে কেউ দিতে পারবে না।"

অচিরা তখনই উঠে দাঁড়িয়ে পা ছুঁয়ে আমাকে প্রণাম করলে। বোধ হল যেন চোখ থেকে জল পড়ল আমার পায়ে। আমি সংকুচিত হয়ে পিছু হটে গেলুম।

অচিরা বললে, "সংকোচ করবেন না। আপনার তুলনায় আমি কিছুই নই, সে কথা নিশ্চয় জানবেন। এই কিন্তু শেষ বিদায়, যাবার আগে আর দেখা হবে না।"

অধ্যাপক বিস্মিত হয়ে বললেন, "সে কী কথা দিদি।"

অচিরা বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠ সামলিয়ে হেসে বললে, "দাদু, তুমি অনেক-কিছু জান, কিন্তু আরও-কিছু সম্বন্ধে আমার বুদ্ধি তোমার চেয়ে অনেক বেশি এ কথাটা মেনে নিয়ো।"

এই বলে চলতে উদ্যত হল। আবার ফিরে এসে বললে, "আমাকে ভুল বুঝবেন না—আজ আমার তীব্র আনন্দ হচ্ছে যে আপনাকে মুক্তি দিলুম, তার থেকে আমারও মুক্তি। আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে—লুকোব না, জল আরও পড়বে। নারীর চোখের জল তাঁরই সম্মানে যিনি সব বন্ধন কাটিয়ে জয়যাত্রায় বেরিয়েছেন।"

দ্রুতপদে অচিরা চলে গেল।

আমি পদধূলি নিয়ে প্রণাম করলুম অধ্যাপককে। তিনি আমাকে বুকে চেপে ধরে বললেন, "আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার সামনে কীর্তির পথ প্রশস্ত।"

ছোটো গল্প ফুরল। পরেকার কথাটা খনি-খোঁড়ার ব্যাপার নিয়ে। তারও পরে আরও বাকি আছে—সে ইতিহাস নিরতিশয় একলার অভিযান, জনতার মাঝখান দিয়ে দুর্গম পথে রুদ্ধদুর্গের দ্বার-অভিমুখে।

বাড়ি ফিরে গিয়ে যত আমার প্ল্যান আর নোট আর রেকর্ড্‌ উলটে-পালটে নাড়াচাড়া করলুম। দেখলুম, সামনে দিগন্তবিস্তৃত কাজের ক্ষেত্র, তাতেই আমার বৃহৎ ছুটি।

সন্ধেবেলায় বারান্দায় এসে বসলুম। খাঁচা ভেঙে গেছে। পাখির পায়ে আটকে রইল ছিন্ন শিকল। সেটা নড়তে চড়তে পায়ে বাজবে।

৪. ১০. ৩৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪৬

পরিশিষ্ট ২

অচলিত পুরাতন রচনার সংকলন

ভিখারিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাশ্মীরের দিগন্তব্যাপী জলদস্পর্শী শৈলমালার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটিরগুলি আঁধার আঁধার ঝোপঝাপের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। এখানে সেখানে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষচ্ছায়ার মধ্য দিয়া একটি-দুইটি শীর্ণকায় চঞ্চল ক্রীড়াশীল নির্ঝর গ্রাম্য কুটিরের চরণ সিক্ত করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলগুলির উপর দ্রুত পদক্ষেপ করিয়া এবং বৃক্ষচ্যুত ফুল ও পত্রগুলিকে তরঙ্গে তরঙ্গে উলটপালট করিয়া, নিকটস্থ সরোবরে লুটাইয়া পড়িতেছে। দূরব্যাপী নিস্তরঙ্গ সরসী—লাজুক উষার রক্ত-রাগে, সূর্যের হেমময় কিরণে, সন্ধ্যার স্তরবিন্যস্ত মেঘমালার প্রতিবিম্বে, পূর্ণিমার বিগলিত জ্যোৎস্নাধারায় বিভাসিত হইয়া শৈললক্ষ্মীর বিমল দর্পণের ন্যায় সমস্ত দিনরাত্রি হাস্য করিতেছে। ঘনবৃক্ষবেষ্টিত অন্ধকার গ্রামটি শৈলমালার বিজন ক্রোড়ে আঁধারের অবগুন্ঠন পরিয়া পৃথিবীর কোলাহল হইতে একাকী লুকাইয়া আছে। দূরে দূরে হরিৎ শস্যময় ক্ষেত্রে গাভী চরিতেছে, গ্রাম্য বালিকারা সরসী হইতে জল তুলিতেছে, গ্রামের আঁধার কুঞ্জে বসিয়া অরণ্যের ম্রিয়মাণ কবি বউকথাকও মর্মের বিষণ্ণ গান গাহিতেছে। সমস্ত গ্রামটি যেন একটি কবির স্বপ্ন।

এই গ্রামে দুইটি বালক বালিকার বড়োই প্রণয় ছিল। দুইটিতে হাত ধরাধরি করিয়া গ্রামশ্রীর ক্রোড়ে খেলিয়া বেড়াইত ; বকুলের কুঞ্জে কুঞ্জে দুইটি অঞ্চল ভরিয়া ফুল তুলিত; শুকতারা আকাশে ডুবিতে না ডুবিতে, উষার জলদমালা লোহিত না হইতে হইতেই সরসীর বক্ষে তরঙ্গ তুলিয়া ছিন্ন কমলদুটির ন্যায় পাশাপাশি সাঁতার দিয়া বেড়াইত। নীরব মধ্যাহ্নে স্নিগ্ধতরুচ্ছায় শৈলের সর্বোচ্চ শিখরে বসিয়া ষোড়শবর্ষীয় অমরসিংহ ধীর মৃদুস্বরে রামায়ণ পাঠ করিত, দুর্দান্ত রাবণ-কর্তৃক সীতাহরণ পাঠ করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিত। দশমবর্ষীয়া কমলদেবী তাহার মুখের পানে স্থির হরিণনেত্র তুলিয়া নীরবে শুনিত, অশোকবনে সীতার বিলাপকাহিনী শুনিয়া পক্ষ্মরেখা অশ্রুসলিলে সিক্ত করিত। ক্রমে গগনের বিশাল প্রাঙ্গণে তারকার দীপ জ্বলিলে, সন্ধ্যার অন্ধকার-অঞ্চলে জোনাকি ফুটিয়া উঠিলে, দুইটিতে হাত ধরাধরি করিয়া কুটিরে ফিরিয়া আসিত। কমলদেবী বড়ো অভিমানিনী ছিল ; কেহ তাহাকে কিছু বলিলে সে অমরসিংহের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিত। অমর তাহাকে সান্ত্বনা দিলে, তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিলে, আদর করিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত কপোল চুম্বন করিলে, বালিকার সকল যন্ত্রণা নিভিয়া যাইত। পৃথিবীর মধ্যে তাহার আর কেহই ছিল না ; কেবল একটি বিধবা মাতা ছিল আর স্নেহময় অমরসিংহ ছিল, তাহারাই বালিকাটির অভিমান সান্ত্বনা ও ক্রীড়ার স্থল।

বালিকার পিতা গ্রামের মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারী বলিয়া সকলেই তাঁহাকে মান্য করিত। সম্পদের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া এবং সম্ভ্রমের সুদূর চন্দ্রলোকে অবস্থান করিয়া কমল গ্রামের বালিকাদের সহিত কখনো মিশে নাই, বাল্যকাল হইতে তাহার সাধের সঙ্গী অমরসিংহের সহিত

খেলিয়া বেড়াইত। অমরসিংহ সেনাপতি অজিতসিংহের পুত্র, অর্থ নাই কিন্তু উচ্চবংশ-জাত—এই নিমিত্ত কমল ও অমরের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে। একবার মোহনলাল নামে একজন ধনীর পুত্রের সহিত কমলের বিবাহের প্রস্তাব হয়, কিন্তু কমলের পিতা তাহার চরিত্র ভালো নয় জানিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই।

কমলের পিতার মৃত্যু হইল। ক্রমে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া গেল। ক্রমে তাঁহার প্রস্তরনির্মিত অট্টালিকাটি আস্তে আস্তে ভাঙিয়া গেল। ক্রমে তাঁহার পারিবারিক সম্ভ্রম অল্পে অল্পে বিনষ্ট হইল এবং ক্রমে তাঁহার রাশি রাশি বন্ধু একে একে সরিয়া পড়িল। অনাথা বিধবা জীর্ণ অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া একটি ক্ষুদ্র কুটিরে বাস করিলেন। সম্পদের সুখময় স্বর্গ হইতে দারুণ দারিদ্র্যে নিপতিত হইয়া বিধবা অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। সম্ভ্রম রক্ষা করিবার উপায় দূরে থাক্, জীবনরক্ষারও কোনো সম্বল নাই—আদরিণী কন্যাটি কী করিয়া দারিদ্র্যদুঃখ সহ্য করিবে? স্নেহময়ী মাতা ভিক্ষা করিয়াও কমলকে কোনোমতে দারিদ্র্যের রৌদ্র ভোগ করিতে দেন নাই।

অমরের সহিত কমলের শীঘ্রই বিবাহ হইবে। বিবাহের আর দুই-এক সপ্তাহ অবশিষ্ট আছে। অমর গ্রামের পথে বেড়াইতে বেড়াইতে কমলকে তাহার ভবিষ্যৎ-জীবনের কত কী সুখের কাহিনী শুনাইত—বড়ো হইলে দুইজনে ঐ শৈলশিখরে কত খেলা খেলিবে, ঐ সরসীর জলে কত সাঁতার দিবে, ঐ বকুলের কুঞ্জে কত ফুল তুলিবে, চুপিচুপি গম্ভীরভাবে তাহারই পরামর্শ করিত। বালিকা অমরের মুখে তাহাদের ভবিষ্যৎ-ক্রীড়ার গল্প শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিহ্বল নেত্রে অমরের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। এইরূপে যখন এই দুইটি বালক-বালিকা কল্পনার অস্ফুট জ্যোৎস্নাময় স্বর্গে খেলা করিতেছিল তখন রাজধানী হইতে সংবাদ আসিল যে, রাজ্যের সীমায় যুদ্ধ বাধিয়াছে। সেনানায়ক অজিতসিংহ যুদ্ধে যাইবেন এবং যুদ্ধশিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার পুত্র অমরসিংহকেও সঙ্গে লইবেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে, শৈলশিখরের বৃক্ষচ্ছায়ায় অমর ও কমল দাঁড়াইয়া আছে। অমর-সিংহ কহিতেছেন, "কমল, আমি তো চলিলাম, এখন রামায়ণ শুনিবি কার কাছে।"

বালিকা ছলছল নেত্রে মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"দেখ্ কমল, এই অস্তমান সূর্য আবার কাল উঠিবে, কিন্তু তোর কুটিরদ্বারে আমি আর আঘাত দিতে যাইব না। তবে বল্ দেখি, আর কাহার সহিত খেলা করিবি।"

কমল কিছুই কহিল না, নীরবে চাহিয়া রহিল।

অমর কহিল, "সখী, যদি তোর অমর যুদ্ধক্ষেত্রে মরিয়া যায়, তাহা হইলে—"

কমল ক্ষুদ্র বাহু দুটিতে অমরের বক্ষ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল ; কহিল, "আমি যে তোমাকে ভালোবাসি অমর, তুমি মরিবে কেন।"

অশ্রুসলিলে বালকের নেত্র ভরিয়া গেল ; তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, "কমল, আয়, অন্ধকার হইয়া আসিতেছে—আজ এই শেষবার তোকে কুটিরে পৌঁছাইয়া দিই।"

দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া কুটিরের অভিমুখে চলিল। গ্রামের বালিকারা জল তুলিয়া গান গাইতে গাইতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে, বনশ্রেণীর মধ্যে অলক্ষিত-

ভাবে একটির পর আর-একটি পাপিয়া গাহিয়া গাহিয়া সারা হইতেছে, আকাশময় তারকা ফুটিয়া উঠিল। অমর কেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে এই অভিমানে কমল কুটিরে গিয়া মাতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অমর অশ্রুসলিলে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

অমর পিতার সহিত সেই রাত্রেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিল। গ্রামের শেষ প্রান্তের শৈলশিখরোপরি উঠিয়া একবার ফিরিয়া চাহিল ; দেখিল— শৈলগ্রাম জ্যোৎস্নালোকে ঘুমাইতেছে, চঞ্চল নির্ঝরিণী নাচিতেছে, ঘুমন্ত গ্রামের সকল কোলাহল স্তব্ধ, মাঝে মাঝে দুই-একটি রাখালের গানের অস্ফুট স্বর গ্রামশৈলের শিখরে গিয়া মিশিতেছে। অমর দেখিল কমলদেবীর লতাপাতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র কুটিরটি অস্ফুট জ্যোৎস্নায় ঘুমাইতেছে। ভাবিল ঐ কুটিরে হয়তো এতক্ষণে শূন্যহৃদয়া মর্মপীড়িতা বালিকাটি উপাধানে ক্ষুদ্র মুখখানি লুকাইয়া নিদ্রাশূন্য নেত্রে আমার জন্য কাঁদিতেছে। অমরের নেত্র অশ্রুতে পুরিয়া গেল।

অজিতসিংহ কহিলেন, "রাজপুত-বালক! যুদ্ধযাত্রার সময় কাঁদিতেছিস!"

অমর অশ্রু মুছিয়া ফেলিল।

শীতকাল। দিবা অবসান হইয়া আসিতেছে। গাঢ় অন্ধকারময় মেঘরাশি উপত্যকা শৈলশিখর কুটির বন নির্ঝর হ্রদ শস্যক্ষেত্র একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, অবিশ্রান্ত বরফ পড়িতেছে, তরল তুষারে সমস্ত শৈল আচ্ছন্ন হইয়াছে, পত্রহীন শীর্ণ বৃক্ষসকল শ্বেত মস্তকে স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান। দারুণ তীব্র শীতে হিমালয়-গিরিও যেন অবসন্ন হইয়া গিয়াছে। এই শীতসন্ধ্যার বিষণ্ণ অন্ধকারের মধ্য দিয়া, গাঢ় বাষ্পময় স্তম্ভিত মেঘরাশি ভেদ করিয়া, একটি ম্লানমুখশ্রী ছিন্নবসনা দরিদ্র-বালিকা অশ্রুময় নেত্রে শৈলের পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে। তুষারে পদতল প্রস্তরের ন্যায় অসাড় হইয়া গিয়াছে, শীতে সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে, মুখ নীলবর্ণ, পার্শ্ব দিয়া দুই-একটি নীরব পান্থ চলিয়া যাইতেছে। হতভাগিনী কমল করুণনেত্রে এক-একবার তাহাদের মুখের দিকে চাহিতেছে। কী বলিতে গিয়া বলিতেছে না, আবার অশ্রুসলিলে অঞ্চল সিক্ত করিয়া তুষারস্তরে পদচিহ্ন অঙ্কিত করিতেছে।

কুটিরে রুগ্ণা মাতা অনাহারে শয্যাগত। সমস্ত দিন বালিকা এক মুষ্টিও আহার করিতে পায় নাই, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে। সাহস করিয়া ভীতিবিহ্বলা বালা কাহারও কাছে ভিক্ষা চাহিতে পারে নাই— বালিকা কখনও ভিক্ষা করে নাই, কী করিয়া ভিক্ষা করিতে হয় জানে না, কাহাকে কী বলিতে হয় জানে না। আলুলিত কুন্তলরাশির মধ্যে সেই ক্ষুদ্র করুণ মুখখানি দেখিলে, দারুণ শীতে কম্পমান তাহার সেই ক্ষুদ্র দেহখানি দেখিলে, পাষাণও বিগলিত হইত।

ক্রমে অন্ধকার ঘনীভূত হইল। নিরাশ বালিকা ভগ্নহৃদয়ে শূন্য অঞ্চলে কুটিরে ফিরিয়া যাইতেছে— কিন্তু অসাড় পা আর উঠে না ; অনাহারে দুর্বল, পথশ্রমে ক্লান্ত, নিরাশায় ম্রিয়মাণ, শীতে অবসন্ন বালিকা আর চলিতে পারে না, অবশ হইয়া পথ-প্রান্তে তুষারশয্যায় শুইয়া পড়িল। শরীর ক্রমে আরও অবসন্ন হইতে লাগিল। বালিকা বুঝিল ক্রমে সে অবসন্ন হইয়া তুষারে চাপা পড়িয়া মরিবে। মাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল ; জোড়হস্তে কহিল, "মা ভগবতী, আমাকে মারিয়া ফেলিয়ো

না, আমাকে রক্ষা করো, আমি মরিলে যে আমার মা কাঁদিবে, আমার অমর কাঁদিবে।"

ক্রমে বালিকা অচেতন হইয়া পড়িল। কমল আলুলিতকুন্তলে শিথিল-অঞ্চলে তুষারে অর্ধমগ্না হইয়া বৃক্ষচ্যুত মলিন ফুলটির মতো পথপ্রান্তে পড়িয়া রহিল। তুষারের উপর তুষার পড়িতে লাগিল, বালিকার বক্ষের উপর তুষারের কণা পড়িতেছে ও গলিতেছে। এবং ক্রমে জমিয়া যাইতেছে। এই আঁধার রাত্রিতে একজন পান্থও পথ দিয়া যাইতেছে না। বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। রাত্রি বাড়িতে লাগিল। বরফ জমিতে লাগিল। বালিকা একাকিনী শৈলপথে পড়িয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কমলের মাতা ভগ্ন কুটিরে রোগশয্যায় শয়ান। জীর্ণ গৃহ ভেদ করিয়া শীতের বাতাস তীব্রবেগে গৃহে প্রবেশ করিতেছে। বিধবা তৃণশয্যায় শুইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছেন। গৃহ অন্ধকার, প্রদীপ জ্বালিবার লোক নাই। কমল প্রাতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই। ব্যাকুল বিধবা প্রত্যেক পদশব্দে কমল আসিতেছে বলিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। কমলকে খুঁজিবার জন্য বিধবা কতবার উঠিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পারেন না। কত কী আশঙ্কায় আকুল হইয়া মাতা দেবতার নিকট কাতর ক্রন্দনে প্রার্থনা করিয়াছেন ; অশ্রুজলে কতবার কহিয়াছেন, "আমি হতভাগিনী, আমার মরণ হইল না কেন। কখনও ভিক্ষা করিতে জানে না যে বালিকা, তাহাকেও আজ অনাথার মতো দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইতে হইল? ক্ষুদ্র বালিকা অধিক দূর চলিতে পারে না— সে এই অন্ধকারে, তুষারে, বৃষ্টিতে কী করিয়া বাঁচিবে।"

উঠিতে পারেন না— অথচ কমলকে দেখিতে পাইতেছেন না, বিধবা বক্ষে করাঘাত করিয়া অধীর ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। দুই-একজন প্রতিবাসী বিধবাকে দেখিতে আসিয়াছিল ; বিধবা তাহাদের চরণ জড়াইয়া ধরিয়া সজল নয়নে কাতরভাবে মিনতি করিলেন, "আমার পথহারা কমল কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একবার তাহাকে খুঁজিতে যাও।"

তাহারা বলিল, "এই তুষারে, অন্ধকারে, আমরা ঘরের বাহিরে যাইতে পারি না।"

বিধবা কাঁদিয়া কহিলেন, "একবার যাও— আমি অনাথ, দরিদ্র, অর্থ নাই, তোমাদের কী দিব বলো। ক্ষুদ্র বালিকা, সে পথ চিনে না, সে আজ সমস্ত দিন কিছু খায় নাই— তাহাকে মাতার ক্রোড়ে আনিয়া দেও— ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করিবেন।"

কেহ শুনিল না। সে বৃষ্টিবজ্রে কে বাহির হইবে। সকলেই নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল।

ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুর্বল বিধবা ক্লান্ত হইয়া গিয়াছেন, নির্জীবভাবে শয্যায় পড়িয়া আছেন, এমন সময়ে বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল। বিধবা চকিত নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "কমল, মা, আইলি?"

একজন বাহির হইতে রূক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরে কে আছে।"

গৃহ হইতে কমলের মাতা উত্তর দিলেন। সে শাখাদীপ হস্তে গৃহে প্রবেশ করিল এবং কমলের মাতাকে কী কহিল, শুনিবামাত্র বিধবা চীৎকার করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এ দিকে তুষারক্লিষ্ট কমল ক্রমে ক্রমে চেতন লাভ করিল, চক্ষু মেলিয়া চাহিল। দেখিল—একটি প্রকাণ্ড গুহা, ইতস্ততঃ বৃহৎ শিলাখণ্ড বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, গাঢ় ধূম্র মেঘে গুহা পূর্ণ, সেই মেঘের অন্ধকার ভেদ করিয়া শাখাদীপের আলোকদীপ্ত কতকগুলি কঠোর শ্মশ্রুপূর্ণ মুখ কমলের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। প্রাচীরে কুঠার কৃপাণ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র লম্বিত আছে, কতকগুলি সামান্য গার্হস্থ্য উপকরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বালিকা সভয়ে চক্ষু নিমীলিত করিল।

আবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল। একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি।"

বালিকা উত্তর দিতে পারিল না, বালিকার বাহু ধরিয়া সবেগে নাড়াইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই।"

কমল ভীতিকম্পিত মৃদুস্বরে কহিল, "আমি কমল।"

সে মনে করিয়াছিল এই উত্তরেই তাহারা তাহার সমস্ত পরিচয় পাইবে।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, "আজ সন্ধ্যার দুর্যোগের সময় পথে ভ্রমণ করিতেছিলে কেন।"

বালিকা আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আজ আমার মা সমস্ত দিন আহার করিতে পান নাই—"

সকলে হাসিয়া উঠিল—তাহাদের নিষ্ঠুর অট্টহাস্যে গুহা প্রতিধ্বনিত হইল, বালিকার মুখের কথা মুখে রহিয়া গেল, কমল সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল। দস্যুদের হাস্য বজ্রধ্বনির ন্যায় বালিকার বক্ষে গিয়া বাজিল; সে সভয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "আমাকে আমার মায়ের কাছে লইয়া যাও।"

আবার সকলে মিলিয়া হাসিয়া উঠিল। ক্রমে তাহারা কমলের নিকট হইতে তাহার বাসস্থান, পিতামাতার নাম, প্রভৃতি জানিয়া লইল। অবশেষে একজন কহিল, "আমরা দস্যু, তুই আমাদের বন্দিনী। তোর মাতার নিকট বলিয়া পাঠাইতেছি, সে যদি নির্ধারিত অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না দেয় তবে তোকে মারিয়া ফেলিব।"

কমল কাঁদিয়া কহিল, "আমার মা অর্থ কোথায় পাইবেন। তিনি অতি দরিদ্র। তাঁহার আর কেহ নাই—আমাকে মারিয়ো না, আমাকে মারিয়ো না, আমি কাহারও কিছু করি নাই।"

আবার সকলে হাসিয়া উঠিল।

কমলের মাতার নিকটে একজন দূত প্রেরিত হইল। সে গিয়া কহিল, "তোমার কন্যা বন্দিনী হইয়াছে—আজ হইতে তৃতীয় দিবসে আমি আসিব—যদি পাঁচশত মুদ্রা দিতে পারো তবে মুক্ত করিয়া দিব, নচেৎ তোমার কন্যা নিশ্চিত হত হইবে।"

এই সংবাদ শুনিয়াই কমলের মাতা মূর্ছিত হইয়া পড়েন।

দরিদ্র বিধবা অর্থ পাইবেন কোথায়। একে একে সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। বিবাহ হইলে কমলকে দিবেন বলিয়া কতকগুলি অলংকার রাখিয়া দিয়াছিলেন, সেগুলি বিক্রয় করিলেন। তথাপি নির্দিষ্ট অর্থের চতুর্থাংশও হইল না। আর কিছুই নাই। অবশেষে বক্ষের বস্ত্র মোচন করিলেন, সেখানে তাঁহার মৃত স্বামীর একটি অঙ্গুরীয়ক রাখিয়া দিয়াছিলেন—মনে করিয়াছিলেন, সুখ হউক, দুঃখ হউক, দারিদ্র্যই বা হউক, কখনো সেটি ত্যাগ করিবেন না, চিরকাল বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবেন—মনে করিয়াছিলেন, এই অঙ্গুরীয়কটি তাঁহার চিতানলের সঙ্গী হইবে—কিন্তু অশ্রুময়নেত্রে তাহাও বাহির করিলেন।

সে অঙ্গুরীটিও যখন তিনি বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার বুকের এক-একখানি অস্থিও ভাঙিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু কেহই কিনিতে চাহিল না।

অবশেষে বিধবা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এক দিন গেল, দুই দিন গেল, তিন দিন যায়, কিন্তু নির্দিষ্ট অর্থের অর্ধেকও সংগৃহীত হয় নাই। আজ সেই দস্যু আসিবে। আজ যদি তাহার হস্তে অর্থ দিতে না পারেন, তবে বিধবার সংসারের যে একমাত্র বন্ধন আছে তাহাও ছিন্ন হইবে।

কিন্তু অর্থ পাইলেন না। ভিক্ষা করিলেন, দ্বারে দ্বারে রোদন করিলেন, সম্পদের সময় যাহারা তাঁহার স্বামীর সামান্য অনুচর ছিল তাহাদের নিকটও অঞ্চল পাতিলেন—কিন্তু নির্দিষ্ট অর্থের অর্ধেকও সংগৃহীত হইল না।

ভয়বিহ্বলা কমল গুহার কারাগারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। সে ভাবিতেছে তাহার অমরসিংহ থাকিলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিত না। অমরসিংহ যদিও বালক, কিন্তু সে জানিত অমরসিংহ সকলই করিতে পারে। দস্যুরা তাহাকে মাঝে মাঝে ভয় দেখাইয়া যায়। দস্যুদের দেখিলেই সে ভয়ে অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ফেলিত। এই অন্ধকার কারাগৃহে, এই নিষ্ঠুর দস্যুদিগের মধ্যে একজন যুবা ছিল। সে কমলের প্রতি তেমন কর্কশভাবে ব্যবহার করিত না। সে ব্যাকুল বালিকাকে স্নেহের সহিত কত কী কথা জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু কমল ভয়ে কোনো কথারই উত্তর দিত না, দস্যু কাছে সরিয়া বসিলে সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাইত। ঐ যুবাটি দস্যুপতির পুত্র। সে একবার কমলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, দস্যুর সহিত বিবাহ করিতে কি তাহার কোনো আপত্তি আছে। এবং মাঝে মাঝে প্রলোভন দেখাইত যে, যদি কমল তাহাকে বিবাহ করে তবে সে তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবে। কিন্তু ভীরু কমল কোনো কথারই উত্তর দিত না। এক দিন গেল ও দুই দিন গেল, বালিকা সভয়ে দেখিল দস্যুরা মদ্যপান করিয়া ছুরিকা শানাইতেছে।

এ দিকে বিধবার গৃহে দস্যুদের দূত প্রবেশ করিল, বিধবাকে জিজ্ঞাসা করিল অর্থ কোথায়? বিধবা ভিক্ষা করিয়া যাহা-কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন সকলই দস্যুর পদতলে রাখিয়া কহিলেন, "আমার আর কিছুই নাই, যাহা কিছু ছিল সকলই দিলাম, এখন তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি আমার কমলকে আনিয়া দেও।"

দস্যু সে মুদ্রাগুলি সক্রোধে ছড়াইয়া ফেলিল। কহিল, "মিথ্যা প্রতারণা করিয়া

পার পাইবি না, নির্দিষ্ট অর্থ না দিলে নিশ্চয় আজি তোর কন্যা হত হইবে। তবে চলিলাম—আমাদের দলপতিকে বলিয়া আসি যে, নির্দিষ্ট অর্থ পাইবে না, তবে এখন নরশোণিতে মহাকালীর পূজা দেও।"

বিধবা কত মিনতি করিলেন, কত কাঁদিলেন, কিছুতেই দস্যুর পাষাণহৃদয় গলাইতে পারিলেন না। দস্যু গমনোদ্যত হইলে কহিলেন, "যাইয়ো না, আর একটু অপেক্ষা করো, আমি আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মোহনলালের সহিত কমলের বিবাহের প্রস্তাব হয়। কিন্তু তাহা সম্পন্ন না হওয়াতে মোহন মনে-মনে কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া আছে। কমলের সমুদয় বৃত্তান্ত মোহনলাল প্রাতেই শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কুলপুরোহিতকে ডাকাইয়া শীঘ্র বিবাহের উত্তম দিন আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন।

গ্রামের মধ্যে মোহনের ন্যায় ধনী আর কেহ ছিল না; আকুল বিধবা অবশেষে তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোহন উপহাসের স্বরে হাসিয়া কহিলেন, "এ কী অপূর্ব ব্যাপার! এত দিনের পর দরিদ্রের কুটিরে যে পদার্পণ হইল?"

বিধবা। উপহাস করিয়ো না। আমি দরিদ্র, তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি।

মোহন। কী হইয়াছে।

বিধবা আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন।

মোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা, আমাকে কী করিতে হইবে।"

বিধবা। কমলের প্রাণরক্ষা করিতে হইবে।

মোহন। কেন, অমরসিংহ এখানে নাই?

বিধবা উপহাস বুঝিতে পারিলেন। কহিলেন, "মোহন, যদি বাসস্থান অভাবে আমাকে বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইত, অনাহারে ক্ষুধার জ্বালায় যদি পাগল হইয়া মরিতাম, তথাপি তোমার কাছে একটি তৃণও প্রার্থনা করিতাম না। কিন্তু আজ যদি বিধবার একমাত্র ভিক্ষা পূর্ণ না করো, তবে তোমার নিষ্ঠুরতা চিরকাল মনে থাকিবে।"

মোহন। আইস, তবে তোমাকে একটি কথা বলি। কমল দেখিতে কিছু মন্দ নহে, আর তাহাকে যে আমার পছন্দ হয় নাই এমনও নহে, তবে তাহার সহিত আমার বিবাহের আর তো কোনো আপত্তি দেখিতেছি না। তোমার কাছে ঢাকিয়া কী করিব, বিনা কারণে ভিক্ষা দিবার মতো আমার অবস্থা নহে।

বিধবা। অগ্রেই যে অমরের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

মোহন কিছু উত্তর না দিয়া হিসাবের খাতা খুলিয়া লিখিতে বসিলেন। যেন কেহই ঘরে নাই, যেন কাহারও সহিত কিছু কথা হয় নাই। এ দিকে সময় বহিয়া যায়, দস্যু আছে কি গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। বিধবা কাঁদিয়া কহিলেন, "মোহন,

আর আমাকে যন্ত্রণা দিয়ো না, সময় অতীত হইতেছে।"

মোহন। রোসো, কাজ সারিয়া ফেলি।

অবশেষে যদি বিধবা বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত না হইতেন, তাহা হইলে সমস্ত দিনে কাজ সারা হইত কি না সন্দেহস্থল। বিধবা মোহনলালের নিকট অর্থ লইয়া দস্যুকে দিলেন, সে চলিয়া গেল। সেই দিনই ভয়ে আশঙ্কায় গ্রস্তা হরিণীটির ন্যায় বিহ্বলা বালিকা মাতার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিল এবং তাঁহার বাহুপাশে মুখখানি প্রচ্ছন্ন করিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনের বেগ শান্ত করিল।

কিন্তু অনাথিনী বালিকা এক দস্যুর হস্ত হইতে আর-এক দস্যুর হস্তে পড়িল।

কত বৎসর গত হইয়া গেল। যুদ্ধের অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে। সৈনিকেরা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে ও অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ভূমি কর্ষণ করিতেছে। বিধবা সংবাদ পাইলেন যে, অজিতসিংহ হত ও অমর কারাবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু কন্যাকে এ সংবাদ শুনান নাই।

মোহনের সহিত বালিকার বিবাহ হইয়া গেল।

মোহনের ক্রোধ কিছুমাত্র নিবৃত্ত হইল না। তাহার প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি বিবাহ করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই। সে নির্দোষী অবলা বালার প্রতি অনর্থক পীড়ন করিত। কমল মাতৃক্রোড়ের স্নিগ্ধ স্নেহচ্ছায়া হইতে এই নিষ্ঠুর কারাগৃহে আসিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে, অভাগিনী কাঁদিতেও পায় না। বিন্দুমাত্র অশ্রু নেত্রে দেখা দিলে মোহনের ভর্ৎসনার ভয়ে গ্রস্ত হইয়া মুছিয়া ফেলিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শৈলশিখরের নিষ্কলঙ্ক তুষারদর্পণের উপর উষার রক্তিম মেঘমালা স্তরে স্তরে সজ্জিত হইল। ঘুমন্ত বিধবা দ্বারে আঘাত শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন। দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, সৈনিকবেশে, অমরসিংহ দাঁড়াইয়া আছেন। বিধবা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অমর তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল, কমল কোথায়।"

শুনিলেন, স্বামীর আলয়ে।

মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তিনি কত কী আশা করিয়াছিলেন— ভাবিয়াছিলেন কত দিনের পর দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন, যুদ্ধের উন্মত্ত ঝটিকা হইতে প্রণয়ের শান্তিময় স্নিগ্ধ নীড়ে ঘুমাইতে যাইতেছেন, তিনি যখন অতর্কিতভাবে দ্বারে গিয়া দাঁড়াইবেন তখন হর্ষবিহ্বলা কমল ছুটিয়া গিয়া তাঁহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। বাল্যকালের সুখময় স্থান সেই শৈলশিখরের উপর বসিয়া কমলকে যুদ্ধ-গৌরবের কথা শুনাইবেন, অবশেষে কমলের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রণয়ের কুসুমকুঞ্জে সমস্ত জীবন সুখের স্বপ্নে কাটাইবেন। এমন সুখের কল্পনায় যে কঠোর বজ্র পড়িল, তাহাতে তিনি দারুণ অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মনে তাঁহার যতই তোলপাড় হইয়াছিল, প্রশান্ত মুখশ্রীতে একটিমাত্র রেখাও পড়ে নাই।

মোহন কমলকে তাহার মাতৃ-আলয়ে রাখিয়া বিদেশে চলিয়া গেলেন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে কমল-পুষ্পকলিকাটি ফুটিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে কমল একদিন বকুলবনে মালা গাঁথিতে গিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই, দূর হইতেই শূন্যমনে ফিরিয়া আসিয়াছিল। আর-একদিন সে বাল্যকালের খেলেনাগুলি বাহির করিয়াছিল— আর খেলিত পারিল না, নিরাশার নিঃশ্বাস ফেলিয়া সেগুলি তুলিয়া রাখিল। অবলা ভাবিয়াছিল যে, যদি অমর ফিরিয়া আসে তবে আবার দুইজনে মালা গাঁথিবে, আবার দুইজনে খেলা করিবে। কতকাল তাহার বাল্যসখা অমরকে দেখিতে পায় নাই, মর্মপীড়িতা কমল এক-একবার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিত। এক-একদিন রাত্রি-কালে গৃহে কমলকে কেহ দেখিতে পাইত না, কমল কোথায় হারাইয়া গিয়াছে— খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবশেষে তাহার বাল্যের ক্রীড়াস্থল সেই শৈলশিখরের উপর গিয়া দেখিত— ম্লানবদনা বালিকা অসংখ্যতারাখচিত অনন্ত আকাশের পানে নেত্র পাতিয়া আলুলিতকেশে শুইয়া আছে।

কমল মাতার জন্য, অমরের জন্য কাঁদিত বলিয়া মোহন বড়োই রুষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাকে মাতৃ-আলয়ে পাঠাইয়া ভাবিয়াছিল যে, 'দিনকতক অর্থাভাবে কষ্ট পাক্, তাহার পরে দেখিব কে কাহার জন্য কাঁদিতে পারে।'

মাতৃভবনে কমল লুকাইয়া কাঁদে। নিশীথবায়ুতে তাহার কত বিষাদের নিঃশ্বাস মিশাইয়া গিয়াছে, বিজন শয্যায় সে যে কত অশ্রুবারি মিশাইয়াছে, তাহা তাহার মাতা একদিনও জানিতে পারেন নাই।

একদিন কমল হঠাৎ শুনিল তাহার অমর দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার কত দিনকার কত কী ভাব উথলিয়া উঠিল। অমরসিংহের বাল্যকালের মুখখানি মনে পড়িল। দারুণ যন্ত্রণায় কমল কতক্ষণ কাঁদিল। অবশেষে অমরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত বাহির হইল।

সেই শৈলশিখরের উপরে সেই বকুলতরুচ্ছায়ায় মর্মাহত অমর বসিয়া আছেন। এক-একটি করিয়া ছেলেবেলাকার সকল কথা মনে পড়িতে লাগিল। কত জ্যোৎস্না-রাত্রি, কত অন্ধকার সন্ধ্যা, কত বিমল উষা, অস্ফুট স্বপ্নের মতো তাঁহার মনে একে একে জাগিতে লাগিল। সেই বাল্যকালের সহিত তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের অন্ধকারময় মরুভূমির তুলনা করিয়া দেখিলেন— সঙ্গী নাই, সহায় নাই, আশ্রয় নাই, কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে না, কেহ তাঁহার মর্মের দুঃখ শুনিয়া মমতা প্রকাশ করিবে না— অনন্ত আকাশে কক্ষচ্ছিন্ন জ্বলন্ত ধূমকেতুর ন্যায়, তরঙ্গাকুল অসীম সমুদ্রের মধ্যে ঝটিকাতাড়িত একটি ভগ্ন ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায়, একাকী নীরব সংসারে উদাস হইয়া বেড়াইবেন।

ক্রমে দূর গ্রামের কোলাহলের অস্ফুট ধ্বনি থামিয়া গেল, নিশীথের বায়ু আঁধার বকুলকুঞ্জের পত্র মর্মরিত করিয়া বিষাদের গম্ভীর গান গাহিল। অমর গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে, শৈলের সমুচ্চ শিখরে একাকী বসিয়া দূর নির্ঝরের মৃদু বিষণ্ণ ধ্বনি, নিরাশ হৃদয়ের দীর্ঘনিঃশ্বাসের ন্যায় সমীরণের হু— হু শব্দ, এবং নিশীথের মর্মভেদী একতানবাহী যে-একটি গম্ভীর ধ্বনি আছে, তাহাই শুনিতেছিলেন। তিনি দেখিতেছিলেন অন্ধকারের সমুদ্রতলে সমস্ত জগৎ ডুবিয়া গিয়াছে, দূরস্থ শ্মশানক্ষেত্রে দুই-একটি চিতানল জ্বলিতেছে, দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত নীরন্ধ্র

স্তম্ভিত মেঘে আকাশ অন্ধকার।

সহসা শুনিলেন উচ্ছ্বসিত স্বরে কে কহিল, "ভাই অমর"—

এই অমৃতময়, স্নেহময়, স্বপ্নময় স্বর শুনিয়া তাঁহার স্মৃতির সমুদ্র আলোড়িত হইয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিলেন—কমল। মুহূর্তের মধ্যে নিকটে আসিয়া বাহুপাশে তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া কহিল, "ভাই অমর"—

অচলহৃদয় অমরও অন্ধকারে অশ্রু বিসর্জন করিলেন, আবার সহসা চকিতের ন্যায় দূরে সরিয়া গেলেন। কমল অমরকে কত কী কথা বলিল, অমর কমলকে দুই-একটি উত্তর দিলেন। সরলা আসিবার সময়ে যেরূপ উৎফুল্লহৃদয়ে হাসিতে হাসিতে আসিয়াছিল, যাইবার সময় সেইরূপ ম্রিয়মাণ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

কমল ভাবিয়াছিল সেই ছেলেবেলাকার অমর ফিরিয়া আসিয়াছে, আর আমি সেই ছেলেবেলাকার কমল কাল হইতে আবার খেলা করিতে আরম্ভ করিব। যদিও অমর মর্মের গভীরতলে সাংঘাতিক আহত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি কমলের উপর কিছুই ক্রুদ্ধ হন নাই বা অভিমান করেন নাই। তাঁহার জন্য বিবাহিতা বালিকার কর্তব্যকর্মে বাধা না পড়ে এই নিমিত্ত তিনি তাহার পরদিন কোথায় যে চলিয়া গেলেন তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না।

বালিকার সুকুমার হৃদয়ে দারুণ বজ্র পড়িল। অভিমানিনী কতদিন ধরিয়া ভাবিয়াছে যে, এত দিনের পর সে বাল্যসখা অমরের কাছে ছুটিয়া গেল, অমর কেন তাহাকে উপেক্ষা করিল। কিছুই ভাবিয়া পায় নাই। একদিন তাহার মাতাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মাতা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, কিছুকাল রাজ-সভার আড়ম্বররাশির মধ্যে থাকিয়া সেনাপতি অমরসিংহ পর্ণকুটিরবাসিনী ভিখারিনী ক্ষুদ্র বালিকাটিকে ভুলিয়া যাইবেন তাহাতে অসম্ভব কী আছে। এই কথায় দরিদ্র বালিকার অন্তরতম দেশে শেল বিঁধিয়াছিল। অমরসিংহ তাহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিল মনে করিয়া কমল কষ্ট পায় নাই। হতভাগিনী ভাবিত, 'আমি দরিদ্র, আমার কিছুই নাই, আমার কেহই নাই, আমি বুদ্ধিহীনা ক্ষুদ্র বালিকা, তাঁহার চরণরেণুরও যোগ্য নহি, তবে তাঁহাকে ভাই বলিব কোন্ অধিকারে! তাঁহাকে ভালোবাসিব কোন্ অধিকারে! আমি দরিদ্র কমল, আমি কে যে তাঁহার স্নেহ প্রার্থনা করিব!'

সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটিয়া যায়, প্রভাত হইলেই সেই শৈলশিখরে উঠিয়া ম্রিয়মাণ বালিকা কত কী ভাবিতে থাকে, তাহার মর্মের নিভৃত তলে যে বাণ বিদ্ধ হইয়াছিল তাহা যদিও সে মর্মেই লুকাইয়া রাখিয়াছিল—পৃথিবীর কাহাকেও দেখায় নাই—তথাপি ঐ মর্মে-লুক্কায়িত বাণ ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ের শোণিত ক্ষয় করিতে লাগিল।

বালিকা আর কাহারও সহিত কথা কহিত না, মৌন হইয়া সমস্তদিন সমস্তরাত্রি ভাবিত। কাহারও সহিত মিশিত না। হাসিত না, কাঁদিত না। এক-একদিন সন্ধ্যা হইলেও দেখা যাইত পথপ্রান্তের বৃক্ষতলে মলিন ছিন্ন অঞ্চলে মুখ ঝাঁপিয়া দীনহীন কমল বসিয়া আছে। বালিকা ক্রমে দুর্বল ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। আর উঠিতে পারে না—বাতায়নে একাকিনী বসিয়া থাকিত, দেখিত দূর শৈলশিখরের উপর বকুলপত্র বায়ুভরে কাঁপিতেছে। দেখিত রাখালেরা সন্ধ্যার সময় উদাস-

ভাবোদ্দীপক সুরে মৃদু মৃদু গান করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে।

বিধবা অনেক চেষ্টা করিয়াও বালিকার কষ্টের কারণ বুঝিতে পারেন নাই এবং তাহার রোগের প্রতিকার করিতেও পারেন নাই। কমল নিজেই বুঝিতে পারিত যে, সে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে। তাহার আর কোনো বাসনা ছিল না, কেবল দেবতার কাছে প্রার্থনা করিত যে 'মরিবার সময় যেন অমরকে দেখিতে পাই।'

কমলের পীড়া গুরুতর হইল। মূর্ছার পর মূর্ছা হইতে লাগিল। শিয়রে বিধবা নীরব, কমলের গ্রাম্য সঙ্গিনী বালিকারা চারি ধার ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দরিদ্র বিধবার অর্থ নাই যে, চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করিতে পারেন। মোহন দেশে নাই এবং দেশে থাকিলেও তাহার নিকট হইতে কিছু আশা করিতে পারিতেন না। তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া কমলের পথ্যাদি যোগাইতেন। চিকিৎসকদের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষা চাহিতেন যে, তাহারা কমলকে একবার দেখিতে আসুক। অনেক মিনতিতে চিকিৎসক কমলকে আজ রাত্রে দেখিতে আসিবে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

অন্ধকার রাত্রের তারাগুলি ঘোর নিবিড় মেঘে ডুবিয়া গিয়াছে, বজ্রের ঘোরতর গর্জন শৈলের প্রত্যেক গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং অবিরল বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ চকিতচ্ছটা শৈলের প্রত্যেক শৃঙ্গে শৃঙ্গে আঘাত করিতেছে। মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। প্রচণ্ড বেগে ঝটিকা বহিতেছে। শৈলবাসীরা অনেক দিন এরূপ ঝড় দেখেন নাই। দরিদ্র বিধবার ক্ষুদ্র কুটির টলমল করিতেছে, জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া বৃষ্টিধারা গৃহে প্রবাহিত হইতেছে এবং গৃহপার্শ্বে নিষ্প্রভ প্রদীপশিখা ইতস্তত কাঁপিতেছে। বিধবা এই ঝড়ে চিকিৎসকের আসিবার আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

হতভাগিনী নিরাশহৃদয়ে নিরাশাব্যঞ্জক স্থির দৃষ্টিতে কমলের মুখের পানে চাহিয়া আছেন ও প্রত্যেক শব্দে চিকিৎসকের আশায় চকিত হইয়া দ্বারের দিকে চাহিতেছেন। একবার কমলের মূর্ছা ভাঙিল, মূর্ছা ভাঙিয়া মাতার মুখের দিকে চাহিল। অনেক দিনের পর কমলের চক্ষে জল দেখা দিল—বিধবা কাঁদিতে লাগিলেন, বালিকারা কাঁদিয়া উঠিল।

সহসা অশ্বের পদধ্বনি শুনা গেল, বিধবা শশব্যস্তে উঠিয়া কহিলেন চিকিৎসক আসিয়াছেন। দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে চিকিৎসক গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আপাদমস্তক বসনে আবৃত, বৃষ্টিধারায় সিক্ত বসন হইতে বারিবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। চিকিৎসক বালিকার তৃণশয্যার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। অবশ বিষাদময় নেত্র চিকিৎসকের মুখের পানে তুলিয়া কমল দেখিল সে চিকিৎসক নয়, সে সেই সৌম্যগম্ভীরমূর্তি অমরসিংহ।

বিহ্বলা বালিকা প্রেমপূর্ণ স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বিশাল নেত্র ভরিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল এবং প্রশান্ত হাস্যে কমলের বিবর্ণ মুখশ্রী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই রুগ্‌ণ শরীরে অত আহ্লাদ সহিল না। ধীরে ধীরে অশ্রুসিক্ত নেত্র নিমীলিত হইয়া গেল, ধীরে ধীরে বক্ষের কম্পন থামিয়া গেল, ধীরে ধীরে প্রদীপ নিভিয়া গেল। শোকবিহ্বলা সঙ্গিনীরা বসনের উপর ফুল ছড়াইয়া দিল। অশ্রুহীন

নেত্রে, দীর্ঘশ্বাসশূন্য বক্ষে, অন্ধকারময় হৃদয়ে, অমরসিংহ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

শোকবিহ্বলা বিধবা সেই দিন অবধি পাগলিনী হইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন এবং সন্ধ্যা হইলে প্রত্যহ সেই ভগ্নাবশিষ্ট কুটিরে একাকিনী বসিয়া কাঁদিতেন।

শ্রাবণ-ভাদ্র ১২৮৪

১ পার্বত্য লোক চীড়বৃক্ষের শাখা জ্বালাইয়া মশালের ন্যায় ব্যবহার করে।

করুণা

ভূমিকা

গ্রামের মধ্যে অনুপকুমারের ন্যায় ধনবান আর কেহই ছিল না। অতিথিশালানির্মাণ, দেবালয়প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণীখনন প্রভৃতি নানা সৎকর্মে তিনি ধনব্যয় করিতেন। তাঁহার সিন্ধুক-পূর্ণ টাকা ছিল, দেশবিখ্যাত যশ ছিল ও রূপবতী কন্যা ছিল। সমস্ত যৌবনকাল ধন উপার্জন করিয়া অনুপ বৃদ্ধ বয়সে বিশ্রাম করিতেছিলেন। এখন কেবল তাঁহার একমাত্র ভাবনা ছিল যে, কন্যার বিবাহ দিবেন কোথায়। সৎপাত্র পান নাই ও বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র আশ্রয়স্থল কন্যাকে পরগৃহে পাঠাইতে ইচ্ছা নাই— তজ্জন্যও আজ কাল করিয়া আর তাঁহার দুহিতার বিবাহ হইতেছে না।

সঙ্গিনী-অভাবে করুণার কিছুমাত্র কষ্ট হইত না। সে এমন কাল্পনিক ছিল, কল্পনার স্বপ্নে সে সমস্ত দিন-রাত্রি এমন সুখে কাটাইয়া দিত যে, মুহূর্তমাত্রও তাহাকে কষ্ট অনুভব করিতে হয় নাই। তাহার একটি পাখি ছিল, সেই পাখিটি হাতে করিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর পাড়ে কল্পনার রাজ্য নির্মাণ করিত। কাঠবিড়ালির পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটাছুটি করিয়া, জলে ফুল ভাসাইয়া, মাটির শিব গড়িয়া, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটাইয়া দিত। এক-একটি গাছকে আপনার সঙ্গিনী ভগ্নী কন্যা বা পুত্র কল্পনা করিয়া তাহাদের সত্য-সত্যই সেইরূপ যত্ন করিত, তাহাদিগকে খাবার আনিয়া দিত, মালা পরাইয়া দিত, নানা প্রকার আদর করিত এবং তাদের পাতা শুকাইলে, ফুল ঝরিয়া পড়িলে, অতিশয় ব্যথিত হইত। সন্ধ্যাবেলা পিতার নিকট যা-কিছু গল্প শুনিত, বাগানে পাখিটিকে তাহাই শুনানো হইত। এইরূপে করুণা তাহার জীবনের প্রত্যুষকাল অতিশয় সুখে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার পিতা ও প্রতিবাসীরা মনে করিতেন যে, চিরকালই বুঝি ইহার এইরূপে কাটিয়া যাইবে।

কিছু দিন পরে করুণার একটি সঙ্গী মিলিল। অনুপের অনুগত কোনো একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মরিবার সময় তাঁহার অনাথ পুত্র নরেন্দ্রকে অনুপকুমারের হস্তে সঁপিয়া যান। নরেন্দ্র অনুপের বাটীতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত, পুত্রহীন অনুপ নরেন্দ্রকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। নরেন্দ্রের মুখশ্রী বড়ো প্রীতিজনক ছিল না কিন্তু সে কাহারও সহিত মিশিত না, খেলিত না ও কথা কহিত না বলিয়া, ভালোমানুষ বলিয়া তাহার বড়োই সুখ্যাতি হইয়াছিল। পল্লীময় রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, নরেন্দ্রের মতো শান্ত শিষ্ট সুবোধ বালক আর নাই এবং পাড়ায় এমন বৃদ্ধ ছিল না যে তাহার বাড়ির ছেলেদের প্রত্যেক কাজেই নরেন্দ্রের উদাহরণ উত্থাপন না করিত।

কিন্তু আমি তখনই বলিয়াছিলাম যে, 'নরেন্দ্র, তুমি বড়ো ভালো ছেলে নও।' কে জানে নরেন্দ্রের মুখশ্রী আমার কোনোমতে ভালো লাগিত না। আসল কথা এই, অমন বাল্যবৃদ্ধ গম্ভীর সুবোধ শান্ত বালক আমার ভালো লাগে না।

অনুপকুমারের স্থাপিত পাঠশালায় রঘুনাথ সার্বভৌম নামে এক গুরুমহাশয় ছিলেন। তিনি নরেন্দ্রকে অপরিমিত ভালোবাসিতেন, নরেন্দ্রকে প্রায় আপনার বাড়িতে লইয়া যাইতেন এবং অনুপের নিকট তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন।

এই নরেন্দ্রই করুণার সঙ্গী। করুণা নরেন্দ্রের সহিত সেই পুষ্করিণীর পাড়ে গিয়া কাদার ঘর নির্মাণ করিত, ফুলের মালা গাঁথিত এবং পিতার কাছে যে-সকল গল্প শুনিয়াছিল তাহাই নরেন্দ্রকে শুনাইত, কাল্পনিক বালিকার যত কল্পনা সব নরেন্দ্রের উপর ন্যস্ত হইল। করুণা নরেন্দ্রকে এত ভালোবাসিত যে কিছুক্ষণ তাহাকে না দেখিতে পাইলে ভালো থাকিত না, নরেন্দ্র পাঠশালে গেলে সে সেই পাখিটি হাতে করিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিত, দূর হইতে নরেন্দ্রকে দেখিলে তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া সেই পুষ্করিণীর পাড়ে সেই নারিকেল গাছের তলায় আসিত, ও তাহার কল্পনারচিত কত কী অদ্ভুত কথা শুনাইত।

নরেন্দ্র ক্রমে কিছু বড়ো হইলে কলিকাতায় ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইল। কলিকাতার বাতাস লাগিয়া পল্লীগ্রামের বালকের কতকগুলি উৎকট রোগ জন্মিল। শুনিয়াছি স্কুলের বেতন ও পুস্তকাদি ক্রয় করিবার ব্যয় যাহাকিছু পাইত তাহাতে নরেন্দ্রের তামাকের খরচটা বেশ চলিত। প্রতি শনিবারে দেশে যাইবার নিয়ম আছে। কিন্তু নরেন্দ্র তাহার সঙ্গীদের মুখে শুনিল যে, শনিবারে যদি কলিকাতা ছাড়িয়া যাওয়া হয় তবে গলায় দড়ি দিয়া মরাটাই বা কী মন্দ! বালক বাটীতে গিয়া অনুপকে বুঝাইয়া দিল যে, সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন বাড়িতে থাকিলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। অনুপ নরেন্দ্রের বিদ্যাভাসে অনুরাগ দেখিয়া মনে-মনে ঠিক দিয়া রাখিলেন যে, বড়ো হইলে সে ডিপুটি মাজিস্টর হইবে।

তখন দুই-এক মাস অন্তর নরেন্দ্র বাড়িতে আসিত। কিন্তু এ আর সে নরেন্দ্র নহে। পানের পিকে ওষ্ঠাধর প্লাবিত করিয়া, মাথায় চাদর বাঁধিয়া, দুই পার্শ্বে দুই সঙ্গীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া, কন্‌স্টেবল্‌দের ভীতিজনক যে নরেন্দ্র প্রদোষে কলিকাতার গলিতে গলিতে মারামারি খুঁজিয়া বেড়াইত, গাড়িতে ভদ্রলোক দেখিলে কদলীর অনুকরণে বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিত, নিরীহ পান্থ বেচারিদিগের দেহে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নির্দোষীর মতো আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিত, এ সে নরেন্দ্র নহে— অতি নিরীহ, আসিয়াই অনুপকে ঢীপ্‌ করিয়া প্রণাম করে। কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে মৃদুস্বরে, নতমুখে, অতি দীনভাবে উত্তর দেয় এবং যে পথে অনুপ সর্বদা যাতায়াত করেন সেইখানে একটি ওয়েব্‌স্টার ডিক্‌সনারী বা তৎসদৃশ অন্য কোনো দীর্ঘকায় পুস্তক খুলিয়া বসিয়া থাকে।

নরেন্দ্র বহুদিনের পর বাড়ি আসিলে করুণা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। নরেন্দ্রকে ডাকিয়া লইয়া কত কী গল্প শুনাইত। বালিকা গল্প শুনাইতে যত উৎসুক শুনিতে তত নহে। কাহারও কাছে কোনো নূতন কথা শুনিলেই যতক্ষণ না নরেন্দ্রকে শুনাইতে পাইত, ততক্ষণ উহা তাহার নিকট বোঝা-স্বরূপ হইয়া থাকিত। কিন্তু করুণার এইরূপ ছেলেমানুষিতে নরেন্দ্রের বড়োই হাসি পাইত, কখনো কখনো সে বিরক্ত হইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিত। নরেন্দ্র সঙ্গীদের নিকটে করুণার কথাপ্রসঙ্গে নানাবিধ উপহাস করিত।

নরেন্দ্র বাড়ি আসিলে পণ্ডিতমহাশয় সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যগ্র হইয়া পড়েন। এমন-কি, সেদিন সন্ধ্যার সময়েও গৃহ হইতে নির্গত হইয়া বাঁশঝাড়ময় পল্লীপথ দিয়া রাম-নাম জপিতে জপিতে নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, নরেন্দ্রকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া নানাবিধ কুশলসংবাদ লইতেন। এই পণ্ডিতের কথা শুনিয়া

দুই-একজন সঙ্গী নরেন্দ্রকে তাঁহার টিকি কাটিতে পরামর্শ দিয়াছিল, এ বিষয় লইয়া গম্ভীর ভাবে অনেক পরামর্শ ও অনেক ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল, কিন্তু দেশে নরেন্দ্রের তেমন দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল না বলিয়া পণ্ডিতমহাশয়ের টিকিটি নির্বিঘ্নে ছিল।

এই রূপে দেশে আদর ও বিদেশে আমোদ পাইয়া নরেন্দ্র বাড়িতে লাগিল। নরেন্দ্রের বাল্যকাল অতীত হইল।

অনুপ এখন অতিশয় বৃদ্ধ, চক্ষে দেখিতে পান না, শয্যা হইতে উঠিতে পারেন না, এক মুহূর্তও করুণাকে কাছ-ছাড়া করিতেন না। অনুপের জীবনের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে; তিনি নরেন্দ্রকে কলিকাতা হইতে ডাকাইয়া আনিয়াছেন, অন্তিম কালে নরেন্দ্র ও পণ্ডিতমহাশয়কে ডাকাইয়া তাঁহাদের হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করিয়া গেলেন।

অনুপের মৃত্যুর পর সার্বভৌম মহাশয় নিজে পৌরোহিত্য করিয়া নরেন্দ্রের সহিত করুণার বিবাহ দিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে। নরেন্দ্র যে কিরূপ লোক তাহা এত দিনে পাড়ার লোকেরা টের পাইল, আর হতভাগিনী করুণাকে যে কষ্ট পাইতে হইবে তাহা এত দিনে তাহারা বুঝিতে পারিল। কিন্তু পণ্ডিতমহাশয় দুয়ের কোনোটাই বুঝিলেন না।

করুণা আজকাল কিছু মনের কষ্টে আছে। মনের উল্লাসে বিজন কাননে সে খেলা করিবে, বক্ষে করিয়া লইয়া পাখির সঙ্গে কত কী কথা কহিবে, কোলের উপর রাশি রাশি ফুল রাখিয়া পা-দুটি ছড়াইয়া আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাইতে গাইতে মালা গাঁথিবে, যাহাকে ভালোবাসে তাহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া অস্ফুট আহ্লাদে বিহ্বল ও অস্ফুট ভাবে ভোর হইয়া যাইবে—সেই বালিকা বড়ো কষ্ট পাইয়াছে। তাহার মনের মতো কিছুই হয় না। অভাগিনী যে নরেন্দ্রকে এত ভালোবাসে—যাহাকে দেখিলে খেলা ভুলিয়া যায়, মালা ফেলিয়া দেয়, পাখি রাখিয়া দিয়া ছুটিয়া আসে, সে কেন করুণাকে দেখিলে যেন বিরক্ত হয়। করুণা হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কী বলিতে আসে, সে কেন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুখ ভার করিয়া থাকে। করুণা তাহাকে কাছে বসিতে কত মিনতি করে, সে কেন কোনো ছল করিয়া চলিয়া যায়। নরেন্দ্র তাহার সহিত এমন নির্জীবভাবে এমন নীরসভাবে কথাবার্তা কয়, সকল কথায় এমন বিরক্তভাবে উত্তর দেয়, সকল কাজে এমন প্রভুভাবে আদেশ করে যে, বালিকার খেলা ঘুরিয়া যায় ও মালা গাঁথা সাঙ্গ হয় বুঝি—বালিকার আর বুঝি পাখির সহিত গান গাওয়া হইয়া উঠে না!

মূল কথাটা এই, নরেন্দ্র ও করুণায় কখনোই বনিতে পারে না। দুইজনে দুই বিভিন্ন উপাদানে নির্মিত। নরেন্দ্র করুণার সেই ভালোবাসার কত কী অসংলগ্ন কথার মধ্যে কিছুই মিষ্টতা পাইত না, তাহার সেই প্রেমে-মাখানো অতৃপ্ত স্থির দৃষ্টি-মধ্যে ঢলঢল লাবণ্য দেখিতে পাইত না, তাহার সেই উচ্ছ্বসিত নির্ঝরিণীর ন্যায় অধীর সৌন্দর্যের মিষ্টতা নরেন্দ্র কিছুই বুঝিত না। কিন্তু সরলা করুণা, সে অত কী বুঝিবে! সে ছেলেবেলা হইতেই নরেন্দ্রের গুণ ছাড়া দোষের কথা কিছুই শুনে

নাই। কিন্তু করুণার একি দায় হইল। তাহার কেমন কিছুতেই আশ মিটে না, সে আশ মিটাইয়া নরেন্দ্রকে দেখিতে পায় না, সে আশ মিটাইয়া মনের সকল কথা নরেন্দ্রকে বলিতে পারে না— সে সকল কথাই বলে অথচ মনে করে যেন কোনো কথাই বলা হইল না।

একদিন নরেন্দ্রকে বেশ পরিবর্তন করিতে দেখিয়া করুণা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছ।"

নরেন্দ্র কহিলেন, "কলিকাতায়।"

করুণা। কলিকাতায় কেন যাইবে।

নরেন্দ্র ভ্রকুঞ্চিত করিয়া দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "কাজ না থাকিলে কখনো যাইতাম না।"

একটা বিড়ালশাবক ছুটিয়া গেল। করুণা তাহাকে ধরিতে গেল, অনেকক্ষণ ছুটাছুটি করিয়া ধরিতে পারিল না। অবশেষে ঘরে ছুটিয়া আসিয়া নরেন্দ্রের কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল, "আজ যদি তোমাকে কলিকাতায় যাইতে না দিই?"

নরেন্দ্র কাঁধ হইতে হাত ফেলিয়া দিয়া কহিল, "সরো, দেখো দেখি, আর একটু হলেই ডিক্যান্টারটি ভাঙিয়া ফেলিতে আর-কি।"

করুণা। দেখো, তুমি কলিকাতায় যাইয়ো না। পণ্ডিতমহাশয় তোমাকে যাইতে দিতে নিষেধ করেন।

নরেন্দ্র কিছুই উত্তর না দিয়া শিস্ দিতে দিতে চুল আঁচড়াইতে লাগিলেন। করুণা ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল ও এক শিশি এসেন্স্ আনিয়া নরেন্দ্রের চাদরে খানিকটা ঢালিয়া দিল।

নরেন্দ্র কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। করুণা দুই একবার বারণ করিল, কিছু হাঁ হুঁ না দিয়া লক্ষ্মৌ ঠুংরি গাইতে গাইতে নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

যতক্ষণ নরেন্দ্রকে দেখা যায় করুণা চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র চলিয়া গেলে পর সে বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিল। কিয়ৎক্ষণ কাঁদিয়া মনের বেগ শান্ত হইতেই চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া পাখিটি হাতে করিয়া লইয়া অন্তঃপুরের বাগানে মালা গাঁথিতে বসিল।

বালিকা স্বভাবতঃ এমন প্রফুল্লহৃদয় যে. বিষাদ অধিকক্ষণ তাহার মনে তিষ্ঠিতে পারে না। হাসির লাবণ্যে তাহার বিশাল নেত্র দুটি এমন মগ্ন যে রোদনের সময়ও অশ্রুর রেখা ভেদ করিয়া হাসির কিরণ জ্বলিতে থাকে। যাহা হউক, করুণার চপল ব্যবহারে পাড়ার মেয়েমহলে বেহায়া বলিয়া তাহার বড়োই অখ্যাতি জন্মিয়াছিল— 'বুড়াধাড়ি মেয়ে'র অতটা বাড়াবাড়ি তাহাদের ভালো লাগিত না। এ-সকল নিন্দার কথা করুণা বাড়ির পুরাতন দাসী ভবির কাছে সব শুনিতে পাইত। কিন্তু তাহাতে তাহার আইল গেল কী? সে তেমনি ছুটাছুটি করিত, সে ভবির গলা ধরিয়া তেমনি করিয়াই হাসিত, সে পাখির কাছে মুখ নাড়িয়া তেমনি করিয়াই গল্প করিত। কিন্তু এই প্রফুল্ল হৃদয় একবার যদি বিষাদের আঘাতে ভাঙিয়া যায়, এই হাস্যময় অজ্ঞান শিশুর মতো চিন্তাশূন্য সরল মুখশ্রী একবার যদি দুঃখের অন্ধকারে মলিন হইয়া যায়, তবে বোধ হয় বালিকা আহত লতাটির ন্যায় জন্মের মতো ম্রিয়মাণ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, বর্ষার সলিলসেকে— বসন্তের বায়ুবীজনে আর বোধ হয় সে মাথা

তুলিতে পারে না।

নরেন্দ্র অনুপের যে অর্থ পাইয়াছিলেন, তাহাতে পল্লিগ্রামে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন। অনুপের জীবদ্দশায় খেতের ধান, পুকুরের মাছ ও বাগানের শাক-সব্‌জি ফলমূলে দৈনিক আহারব্যয় যৎসামান্য ছিল। ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইত, নিয়মিত পূজা-অর্চনা দানধ্যান ও আতিথ্যের ব্যয় ভিন্ন আর কোনো ব্যয়ই ছিল না। অনুপের মৃত্যুর পর অতিথিশালাটি বাবুর্চিখানা হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণ-গুলার জ্বালায় গোটা চারেক দরোয়ান রাখিতে হইল, তাহারা প্রত্যেক ভট্টাচার্যকে রীতিমত অর্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিত এবং প্রত্যেক ভট্টাচার্য বিধিমতে নরেন্দ্রকে উচ্ছন্ন যাইবার ব্যবস্থা করিয়া যাইত। নরেন্দ্র গ্রামে নিজ ব্যয়ে একটি ডিস্‌পেন্‌সরি স্থাপন করিলেন। শুনিয়াছি নহিলে সেখানে ব্রান্ডি কিনিবার অন্য কোনো সুবিধা ছিল না। গবর্নমেন্টের সস্তা দোকান হইতে রায়বাহাদুরের খেলানা কিনিবার জন্য ঘোড়-দৌড়ের চাঁদা-পুস্তকে হাজার টাকা সই করিয়াছিলেন এবং এমন আরও অনেক সৎকার্য করিয়াছিলেন যাহা লইয়া অমৃতবাজারের একজন পত্রপ্রেরক ভারি ধুমধাম করিয়া এক পত্র লেখে। তাহার প্রতিবাদ ও তাহার পুনঃপ্রতিবাদের সময় অমূলক অপবাদ দেওয়া যে ভদ্রলোকের অকর্তব্য ইহা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হয়।

নরেন্দ্রকে পল্লীর লোকেরা জাতিচ্যুত করিল, কিন্তু নরেন্দ্র সে দিকে কটাক্ষপাতও করিলেন না। নরেন্দ্রের একজন সমাজসংস্কারক বন্ধু তাঁহার 'মরাল করেজ' লইয়া সভায় তুমুল আন্দোলন করিলেন।

নরেন্দ্র বাগবাজারে এক বাড়ি ভাড়া করিয়াছেন ও কাশীপুরে এক বাগান ক্রয় করিয়াছেন। একদিন বাগবাজারের বাড়িতে সকালে বসিয়া নরেন্দ্র চা খাইতেছেন। নরেন্দ্রের সকাল ও আমাদের সকালে অনেক তফাত, সেদিন শনিবারে কুঠি যাইবার সময় দেখিয়া আসিলাম, নরেন্দ্রের নাক ডাকিতেছে। দুইটার সময় ফিরিয়া আসিবার কালে দেখি চোখ রগড়াইতেছেন, তখনও আন্তরিক ইচ্ছা আর-এক ঘুম দেন। যাহাই হউক নরেন্দ্র চা খাইতেছেন এমন সময়ে সমাজসংস্কারক গদাধরবাবু, কবিতাকুসুম-মঞ্জরী-প্রণেতা কবিবর স্বরূপচন্দ্রবাবু, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথম অভ্যর্থনা সমাপ্ত হইলে সকলে চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেন।

নানাবিধ কথোপকথনের পর গদাধরবাবু কহিলেন, "দেখুন মশায়, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের দশা বড়ো শোচনীয়।"

এই সময়ে নরেন্দ্র শোচনীয় শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বরূপচন্দ্রবাবু কহিলেন—'deplorable'। নরেন্দ্রের পক্ষে উভয় কথাই সমান ছিল, কিন্তু নরেন্দ্র এই প্রতিশব্দটি শুনিয়া শোচনীয় শব্দের অর্থটা যেন জল বুঝিয়া গেলেন। গদাধর-বাবু কহিলেন, "এখন আমাদিগের উচিত তাহাদের অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙিয়া দেওয়া।"

অমনি নরেন্দ্র গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "কিন্তু এটা কতদূর হতে পারে তাই দেখা যাক। তেমন সুবিধা পাইলে অন্তঃপুরের প্রাচীর অনেক সময় ভাঙিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু পুলিসের লোকেরা তাহাতে বড়োই আপত্তি করিবে। ভাঙিয়া ফেলা দূরে থাক্‌ একবার আমি অন্তঃপুরের প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে গিয়াছিলাম, ম্যাজিস্ট্রেট তাতে আমার উপর বড়ো সন্তুষ্ট হয় নাই।"

অনেক তর্কের পর গদাধর ও স্বরূপে মিলিয়া নরেন্দ্রকে বুঝাইয়া দিল যে, সত্য-সত্যই অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলিবার প্রস্তাব হইতেছে না— তাহার তাৎপর্য এই যে, স্ত্রীলোকদের অন্তঃপুর হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া।

গদাধরবাবু কহিলেন, "কত বিধবা একাদশীর যন্ত্রণায় রোদন করিতেছে, কত কুলীনপত্নী স্বামী জীবিত-সত্ত্বেও বৈধব্যজ্বালা সহ্য করিতেছে।"

স্বরূপবাবু কহিলেন, "এ বিষয়ে আমার অনেক কবিতা আছে, কাগজওয়ালারা তার বড়ো ভালো সমালোচনা করেছে। দেখো নরেন্দ্রবাবু, শরৎকালের জ্যোৎস্নারাত্রে কখনও ছাতে শুয়েছ? চাঁদ যখন ঢলঢল হাসি ঢালতে ঢালতে আকাশে ভেসে যায় তখন তাকে দেখেছ? আবার সেই হাস্যময় চাঁদকে যখন ঘোর অন্ধকারে মেঘে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন মনের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট উপস্থিত হয়, তা কি কখনো সহ্য করেছ। তা যদি করে থাকো তবে বলো দেখি স্ত্রীলোকের কষ্ট দেখলে সেইরূপ কষ্ট হয় কি না।"

নরেন্দ্রের সম্মুখে এতগুলি প্রশ্ন একে একে খাড়া হইল, নরেন্দ্র ভাবিয়া আকুল। অনেক ক্ষণের পর কহিলেন, "আমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

গদাধরবাবু কহিলেন, "এখন কথা হচ্ছে যে, স্ত্রীলোকদের কষ্টমোচনে আমরা যদি দৃষ্টান্ত না দেখাই তবে কে দেখাইবে। এসো, আজ থেকেই এ বিষয়ের চেষ্টা করা যাক।"

নরেন্দ্রের তাহাতে কোনো আপত্তি ছিল না। তিনি মনে-মনে কেবল ভাবিতে লাগিলেন এখন কাহার অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙিতে হইবে। গদাধরবাবু কহিলেন, "স্মরণ থাকতে পারে মোহিনী নামে এক বিধবার কথা সেদিন বলেছিলুম, আমাদের প্রথম পরীক্ষা তাহার উপর দিয়াই চলুক। এ বিষয়ে যা-কিছু বাধা আছে তা আলোচনা করে দেখা যাক। যেমন এক-একটা পোষা পাখি শৃঙ্খলমুক্ত হলেও স্বাধীনতা পেতে চায় না, তেমনি সেই বিধবাটিও স্বাধীনতার সহস্র উপায় থাকিতেও অন্তঃপুরের কারাগার হইতে মুক্ত হইতে চায় না। সুতরাং আমাদের প্রথম কর্তব্য তাহাকে স্বাধীনতার সুমিষ্ট আস্বাদ জানাইয়া দেওয়া।"

নরেন্দ্র কহিলেন সকল দিক ভাবিয়া দেখিলে এ বিষয়ে কাহারও কোনো প্রকার আপত্তি থাকিতে পারে না। সে বিধবার ভরণপোষণ বাসস্থান ইত্যাদি সমুদয় বন্দোবস্তের ভার নরেন্দ্র নিজস্কন্ধে লইতে স্বীকৃত হইলেন। ক্রমে ত্রিভঙ্গচন্দ্র বিশ্বম্ভর ও জন্মেজয়বাবু আসিলেন, ক্রমে সন্ধ্যাও হইল, প্লেট আসিল, বোতল আসিল। গদাধরবাবু স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অনেক বক্তৃতা দিয়া ও স্বরূপবাবু জ্যোৎস্না-রাত্রির বিষয়ে নানাবিধ কবিতাময় উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া শুইয়া পড়িলেন, ত্রিভঙ্গচন্দ্র ও বিশ্বম্ভরবাবু স্খলিত স্বরে গান জুড়িয়া দিলেন, নরেন্দ্র ও জন্মেজয় কাহাকে যে গালাগালি দিতে লাগিলেন বুঝা গেল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র

মহেন্দ্র এত দিন বেশ ভালো ছিল। ইস্কুলে ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছে, কলেজে এলে, বি. এ. পাস করিয়াছে, মেডিকাল কলেজে তিন চার বৎসর পড়িয়াছে, আর কিছু দিন পড়িলেই পাস হইত—কিন্তু বিবাহ হওয়ার পর হইতেই অমন হইয়া গেল কেন। আমাদের সঙ্গে আর দেখা করিতে আসে না, আমরা গেলে ভালো করিয়া কথা কয় না—এ-সব তো ভালো লক্ষণ নয়। সহসা এরূপ পরিবর্তন যে কেন হইল আমরা ভিতরে ভিতরে তাহার সন্ধান লইয়াছি। মূল কথাটা এই, কন্যাকর্তাদিগের নিকট হইতে অর্থ লইয়া মহেন্দ্রের পিতা যে কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন তাহা মহেন্দ্রের বড়ো মনোনীত হয় নাই। মনোনীত না হইবারই কথা বটে। তাহার নাম রজনী ছিল, বর্ণও রজনীর ন্যায় অন্ধকার; তাহার গঠনও যে কিছু উৎকৃষ্ট ছিল তাহা নয়; কিন্তু মুখ দেখিলে তাহাকে অতিশয় ভালো মানুষ বলিয়া বোধ হয়। বেচারি কখনও কাহারও কাছে আদর পায় নাই, পিত্রালয়ে অতিশয় উপেক্ষিত হইয়াছিল। বিশেষত তাহার রূপের দোষে বর পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া যাহার তাহার কাছে তাহাকে নিগ্রহ সহিতে হইত। কখনও কাহারও সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সাহস করে নাই। একদিন আয়না খুলিয়া কপালে টিপ পরিতেছিল বলিয়া কত লোকে কত রকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছিল; সেই অবধি উপহাসের ভয়ে বেচারি কখনও আয়নাও খুলে নাই, কখনও বেশভূষাও করে নাই। স্বামী-আলয়ে আসিল। সেখানে স্বামীর নিকট হইতে এক মুহূর্তের নিমিত্তও আদর পাইল না, বিবাহ-রাত্রের পরদিন হইতে মহেন্দ্র তাহার কাছে শুইত না। এ দিকে মহেন্দ্র এমন বিদ্বান, এমন মৃদুস্বভাব, এমন সদ্‌বন্ধু ছিল, এমন আমোদদায়ক সহচর ছিল, এমন সহৃদয় লোক ছিল যে, সেও সকলকে ভালোবাসিত, তাহাকেও সকলে ভালোবাসিত। রজনীর কপাল-দোষে সে মহেন্দ্রও বিগড়াইয়া গেল। মহেন্দ্র পিতাকে কখনও অভক্তি করে নাই, কিন্তু বিবাহের পরদিনেই পিতাকে যাহা বলিবার নয় তাহাই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছে। পিতা ভাবিলেন—তাঁহারই বুঝিবার ভুল, কলেজে পড়িলেই ছেলেরা যে অবাধ্য হইয়া যাইবে ইহা তো কথাই আছে।

রজনীর সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। আমি মহেন্দ্রকে গিয়া বুঝাইলাম। আমি বলিলাম, 'রজনীর ইহাতে কী দোষ আছে। তাহার কুরূপের জন্য সে কিছু দোষী নহে, দ্বিতীয়তঃ তাহার বিবাহের জন্য তোমার পিতাই দোষী। তবে বিনা অপরাধে বেচারিকে কেন কষ্ট দাও।' মহেন্দ্র কিছুই বুঝিল না বা আমাকেও বুঝাইল না, কেবল বলিল তাহার অবস্থায় যদি পড়িতাম তবে আমিও ঐরূপ ব্যবহার করিতাম। এ কথা যে মহেন্দ্র অতি ভুল বুঝিয়াছিল তাহা বুঝাইবার কোনো প্রয়োজন নাই, কারণ আমার সহিত গল্পের অতি অল্পই সম্বন্ধ আছে।

এ সময়ে মহেন্দ্রের কলেজ ছাড়িয়া দেওয়াটা ভালো হয় নাই। পোড়ো জমিতে কাঁটাগাছ জন্মায়, অব্যবহৃত লৌহে মরিচা পড়ে, মহেন্দ্র এমন অবস্থায় কাজকর্ম

ছাড়িয়া বসিয়া থাকিলে অনেক কুফল ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি আপনি মহেন্দ্রের কাছে গেলাম, সকল কথা বুঝাইয়া বলিলাম, মহেন্দ্র বিরক্ত হইল, আমি আস্তে আস্তে চলিয়া আসিলাম।

একটা কিছু আমোদ নাহিলে কি মানুষে বাঁচিতে পারে। মহেন্দ্র যেরূপ কৃতবিদ্য, লেখাপড়ায় সে তো অনেক আমোদ পাইতে পারে। কিন্তু পরীক্ষা দিয়া দিয়া বইগুলোর উপর মহেন্দ্রের এমন একটা অরুচি জন্মিয়াছে যে, কলেজ হইতে টাট্‌কা বাহির হইয়াই আর-একটা কিছু নূতন আমোদ পাইলেই তাহার পক্ষে ভালো হইত। মহেন্দ্র এখন একটু-আধটু করিয়া শেরী খায়। কিন্তু তাহাতে কী হানি হইল। কিন্তু হইল বৈকি। মহেন্দ্রও তাহা বুঝিত—এক-একবার বড়ো ভয় হইত, এক-একবার অনুতাপ করিত, এক-একবার প্রতিজ্ঞা করিত, আবার এক-একদিন খাইয়াও ফেলিত এবং খাইবার পক্ষে নানাবিধ যুক্তিও ঠিক করিত। ক্রমে ক্রমে মহেন্দ্র অধোগতির গহ্বরে এক-এক সোপান করিয়া নাবিতে লাগিলেন। মদ্যটা মহেন্দ্রের এখন খুব অভ্যস্ত হইয়াছে। আমি কখনও জানিতাম না এমন-সকল সামান্য বিষয় হইতে এমন গুরুতর ব্যাপার ঘটিতে পারে। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে সেই ভালো মানুষ মহেন্দ্র, স্কুলে যে ধীরে ধীরে কথা কহিত, মৃদু মৃদু হাসিত, অতি সন্তর্পণে চলাফিরা করিত, সে আজ মাতাল হইয়া অমন যা-তা বকিতে থাকিবে, সে অমন বৃদ্ধ পিতার মুখের উপর উত্তর-প্রত্যুত্তর করিবে। সর্বাপেক্ষা অসম্ভব মনে করিতাম যে, ছেলেবেলা আমার সঙ্গে মহেন্দ্রের এত ভাব ছিল, সে আজ আমাকে দেখিলেই বিরক্ত হইবে, আমাকে দেখিলেই ভয় করিবে যে 'বুঝি ঐ আবার লেক্‌চার দিতে আসিয়াছে'। কিন্তু আমি আর তাহাকে কিছু বুঝাইতে যাইতাম না। কাজ কী। কথা মানিবে না যখন, কেবল বিরক্ত হইবে মাত্র, তখন তাহাকে বুঝাইয়া আর কী করিব। কিন্তু তাহাও বলি, মহেন্দ্র হাজার মাতাল হউক তাহার অন্য কোনো দোষ ছিল না, আপনার ঘরে বসিয়াই মাতাল হইত, কখনও ঘরের বাহির হইত না। কিন্তু অল্প দিন হইল মহেন্দ্রের চাকর শম্ভু আসিয়া আমাকে কহিল যে, বাবু বিকাল হইলে বাহির হইয়া যান আর অনেক রাত্রি হইলে বাড়ি ফিরিয়া আসেন। এই কথা শুনিয়া আমার বড়ো কষ্ট হইল, খোঁজ লইলাম, দেখিলাম দূষ্য কিছু নয়—মহেন্দ্র তাহাদের বাগানের ঘাটে বসিয়া থাকে। কিন্তু তাহার কারণ কী। এখনও তো বিশেষ কিছু সন্ধান পাই নাই।

সংস্কারক মহাশয় যে বিধবা মোহিনীর কথা বলিতেছিলেন, সে মহেন্দ্রের বাড়ির পাশেই থাকিত। মহেন্দ্রের বাড়িও আসিত, মহেন্দ্রও রোগ বিপদে সাহায্য করিতে তাহাদের বাড়ি যাইত। মোহিনীকে দেখিতে বেশ ভালো ছিল—কেমন উজ্জ্বল চক্ষু, কেমন প্রফুল্ল ওষ্ঠাধর, সমস্ত মুখের মধ্যে কেমন একটি মিষ্ট ভাব ছিল, তাহা বলিবার নয়।

যাহা হউক, মোহিনীকে স্বাধীনতার আলোকে আনিবার জন্য নানাবিধ ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছে। মোহিনীকে একাদশী করিতে হয়, মোহিনী মাছ খাইতে পায় না, মোহিনীর প্রতি সমাজের এই-সকল অন্যায় অত্যাচার দেখিয়া গদাধরবাবু অত্যন্ত কাতর আছেন। স্বরূপবাবু মোহিনীর উদ্দেশে নানা সংবাদ পত্রে ও মাসিক পত্রিকায় নানাবিধ প্রেমের কবিতা লিখিয়া ফেলিলেন, তাহার মধ্যে আমাদের বাংলা সমাজকে

ও দেশাচারকে অনেক গালি দিলেন ও অবশেষে সমস্ত মানবজাতির উপর বিষম ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। তিনি নিজে বড়ো বিষণ্ণ হইয়া গেলেন ও সমস্ত দিন রাত্রি অনেক নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রের কাশীপুরস্থ বাগানের পাশেই মোহিনীর বাড়ি। যে ঘাটে মোহিনী জল আনিতে যাইত, নরেন্দ্র সেখানে দিন কতক আনাগোনা করিতে লাগিলেন। এই-সকল দেখিয়া মোহিনী বড়ো ভালো বুঝিল না, সে আর সে ঘাটে জল আনিতে যাইত না। সে তখন হইতে মহেন্দ্রের বাগানের ঘাটে জল তুলিতে ও স্নান করিতে যাইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোহিনীর ও মহেন্দ্রের মনের কথা

'এমন করিলে পারিয়া উঠা যায় না। মহেন্দ্রের বাড়ি ছাড়িয়া দিলাম— ভাবিলাম দূর হোক্ গে, ও দিকে আর মন দিব না। মহেন্দ্র আমাদের বাড়িতে আসিলে আমি রান্নাঘরে গিয়া লুকাইতাম, কিন্তু আজকাল মহেন্দ্র আবার ঘাটে গিয়া বসিয়া থাকে, কী দায়েই পড়িলাম, তাহার জন্য জল আনা বন্ধ হইবে নাকি। আচ্ছা, নাহয় ঘাটেই বসিয়া থাকিল, কিন্তু অমন করিয়া তাকাইয়া থাকে কেন। লোকে কী বলিবে। আমার বড়ো লজ্জা করে। মনে করি ঘাটে আর যাইব না, কিন্তু না যাইয়া কী করি। আর কেনই বা না যাইব। সত্য কথা বলিতেছি, মহেন্দ্রকে দেখিলে আমার নানান ভাবনা আইসে, কিন্তু সে-সব ভাবনা ভুলিতেও ইচ্ছা করে না। বিকাল বেলা একবার যদি মহেন্দ্রকে দেখিতে পাই তাহাতে হানি কী। হানি হয় হউক গে, আমি তো না দেখিয়া বাঁচিব না। কিন্তু মহেন্দ্রকে জানিতে দিব না যে তাহাকে ভালোবাসি, তাহা হইলে সে আমার প্রতি যাহা খুশি তাহাই করিবে। আর এ-সকল ভালোবাসা-বাসির কথা রাষ্ট্র হওয়াও কিছু নয়'— এই তো গেল মোহিনীর মনের কথা।

মহেন্দ্র ভাবে— 'আমি তো রোজ ঘাটে বসিয়া থাকি, কিন্তু মোহিনী তো একদিনও আমার দিকে ফিরিয়া চায় না। আমি যে দিকে থাকি, সে দিক দিয়াও যায় না, আমাকে দেখিলে শশব্যস্তে ঘোমটা টানিয়া দেয়, পথে আমাকে দেখিলে প্রান্তভাগে সরিয়া যায়, মোহিনীর বাড়িতে গেলে কোথায় পলাইয়া যায়— এমন করিলে বড়ো কষ্ট হয়। আগে জানিতাম মোহিনী আমাকে ভালোবাসে। ভালো না বাসুক, যত্ন করে। কিন্তু আজকাল অমন করে কেন। এ কথা মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। জিজ্ঞাসা করিতে কী দোষ আছে। মোহিনীকে তো আমি কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। মোহিনীর বাড়ির সকলে আমাকে এত ভালোবাসে যে, মোহিনীর সহিত কথাবার্তা কহিলে কেহ তো কিছু মনে করে না।'

একদিন বিকালে মোহিনী জল তুলিতে আসিল। মহেন্দ্র যেমন ঘাটে বসিয়া থাকিত, তেমনি বসিয়া আছে। বাগানে আর কেহ লোক নাই। মোহিনী জল তুলিয়া চলিয়া যায়। মহেন্দ্র কম্পিত স্বরে ধীরে ধীরে ডাকিল, 'মোহিনী!' মোহিনী যেন শুনিতে পাইল না, চলিয়া গেল। মহেন্দ্র ফিরিয়া আর ডাকিতে সাহস করিল না।

আর-একদিন মোহিনী বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছে, মহেন্দ্র সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন ; মোহিনী তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া দিল। মহেন্দ্র ধীরে ধীরে ঘর্মাক্তললাট হইয়া কত কথা কহিল, কত কথা বাধিয়া গেল, কোনো কথাই ভালো করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিল না।

মোহিনী শশব্যস্তে কহিল, "সরিয়া যান, আমি জল লইয়া যাইতেছি।"

সেই দিন মহেন্দ্র বাড়ি গিয়াই একটা কী সামান্য কথা লইয়া পিতার সহিত ঝগড়া করিল, নির্দোষী রজনীকে অকারণ অনেক ক্ষণ ধরিয়া তিরস্কার করিল, শম্ভু চাকরটাকে দুই-তিন বার মারিতে উদ্যত হইল ও মদের মাত্রা আরো খানিকটা বাড়াইল। কিছু দিনের মধ্যে গদাধরের সহিত মহেন্দ্রের আলাপ হইল, তাহার দিন চারেক পরে স্বরূপবাবুর সহিত সখ্যতা জন্মিল, তাহার সপ্তাহ খানেক পরে নরেন্দ্রের সহিত পরিচয় হইল ও মাসেকের মধ্যে মহেন্দ্র নরেন্দ্রের সভায় সন্ধ্যাগমে নিত্য অতিথিরূপে হাজির হইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পণ্ডিতমহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ

পূর্বে রঘুনাথ সার্বভৌম মহাশয়ের একটি টোল ছিল। অর্থাভাবে অল্প দিনেই টোলটি উঠিয়া যায়। গ্রামের বর্ধিষ্ণু জমিদার অনুপকুমার যে পাঠশালা স্থাপন করেন, অল্প বেতনে তিনি তাহার গুরুমহাশয়ের পদে নিযুক্ত হন কিন্তু গুরু-মহাশয়ের পদে আসীন হইয়া তাঁহার শান্তপ্রকৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

পণ্ডিতমহাশয় বলিতেন, তাঁহার বয়স সবে চল্লিশ বৎসর। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া শপথ করিয়া বলা যায় তাঁহার বয়স আটচল্লিশ বৎসরের ন্যূন নয়। সাধারণ পণ্ডিতদের সহিত তাঁহার আর কোনো বিষয় মিল ছিল না—তিনি খুব টস্‌টসে রসিক পুরুষ ছিলেন না বা খট্‌খটে ঘট-পট-বাগীশ ছিলেন না, দলাদলির চক্রান্ত করিতেন না, শাস্ত্রের বিচার লইয়া বিবাদে লিপ্ত থাকিতেন না, বিদায়-আদায়ের কোনো আশাই রাখিতেন না। কেবল মিল ছিল প্রশস্ত উদরটিতে, নস্যের ডিবাটিতে, ক্ষুদ্র টিকিটিতে ও শ্মশ্রুবিহীন মুখে। পাঠশালার বালকেরা প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা তাঁহার বাড়িতেই পড়িয়া থাকিত। এই বালকদের জন্য তাঁহার অনেক সন্দেশ খরচ হইত ; সন্দেশের লোভ পাইয়া বালকেরা ছিনা জোঁকের মতো তাঁহার বাড়ির মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিত। পণ্ডিতমহাশয় বড়োই ভালোমানুষ ছিলেন এবং দুষ্ট বালকেরা তাঁহার উপর বড়োই অত্যাচার করিত। পণ্ডিতমহাশয়ের নিদ্রাটি এমন অভ্যস্ত ছিল যে, তিনি শুইলেই ঘুমাইতেন, বসিলেই ঢুলিতেন ও দাঁড়াইলেই হাই তুলিতেন। এই সুবিধা পাইয়া বালকেরা তাঁহার নস্যের ডিবা, চটিজুতা ও চশমার ঠুঙিটি চুরি করিয়া লইত। একে তো পণ্ডিতমহাশয় অতিশয় আলগা লোক তাহাতে পাঠশালার দুষ্ট বালকেরা তাঁহার বাটীতে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা রাখিত না। পাঠশালায় যাইবার সময় কোনোমতে তাঁহার চটিজুতা খুঁজিয়া পাইতেন না, অবশেষে শূন্যপদেই যাইতেন। একদিন সকালে উঠিয়া দৈবাৎ দেখিতে পাইলেন

তাঁহার শয়নগৃহে বোলতায় চাক করিয়াছে, ভয়ে বিব্রত হইয়া সে ঘরই পরিত্যাগ করিলেন ; সে ঘরে তিন পরিবার বোলতায় তিনটি চাক বাঁধিল, ইঁদুরে গর্ত করিল, মাকড়সা প্রাসাদ নির্মাণ করিল এবং লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র পিপীলিকা সার বাঁধিয়া গৃহময় রাজপথ বসাইয়া দিল। বালীর পক্ষে ঋষ্যমূখ পর্বত যেরূপ, পণ্ডিতমহাশয়ের পক্ষে এই ঘরটি সেইরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। পাঠশালায় গমনে অনিচ্ছুক কোনো বালক যদি সেই গৃহে লুকাইত তবে আর পণ্ডিতমহাশয় তাহাকে ধরিতে পারিতেন না।

গৃহের এইরূপ আলগা অবস্থা দেখিয়া পণ্ডিতমহাশয় অনেক দিন হইতে একটি গৃহিণীর চিন্তায় আছেন। পূর্বকার গৃহিণীটি বড়ো প্রচণ্ড স্ত্রীলোক ছিলেন। নিরীহপ্রকৃতি সার্বভৌম মহাশয় দিল্লীশ্বরের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেন। স্ত্রী নিকটে থাকিলে অন্য স্ত্রীলোক দেখিয়া চক্ষু মুদিয়া থাকিতেন। একবার একটি অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার দিকে চাহিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পত্নী সেই বালিকাটির মৃত পিতৃপিতামহ প্রপিতামহের নামোল্লেখ করিয়া যথেষ্ট গালি বর্ষণ করেন ও সার্বভৌম মহাশয়ের মুখের নিকট হাত নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'তুমি মরো, তুমি মরো, তুমি মরো!' পণ্ডিতমহাশয় মরণকে বড়ো ভয় করিতেন, মরণের কথা শুনিয়া তাঁহার বুক ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করিতে লাগিল।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর দৈনিক গালি না পাইয়া অভ্যাসদোষে দিনকতক বড়ো কষ্ট অনুভব করিতেন।

যাহা হউক, অনেক কারণে পণ্ডিতমহাশয় বিবাহের চেষ্টায় আছেন। পণ্ডিতমহাশয়ের একটা কেমন অভ্যাস ছিল যে, তিনি সহস্র মিষ্টান্নের লোভ পাইলেও কাহারও বিবাহসভায় উপস্থিত থাকিতেন না। কাহারও বিবাহের সংবাদ শুনিলে সমস্ত দিন মন খারাপ হইয়া থাকিত। পণ্ডিতমহাশয়ের এক ভট্টাচার্যবন্ধু ছিলেন ; তাঁহার মনে ধারণা ছিল যে তিনি বড়োই রসিক, যে ব্যক্তি তাঁহার কথা শুনিয়া না হাসিত তাহার উপরে তিনি আন্তরিক চটিয়া যাইতেন। এই রসিক বন্ধু মাঝে মাঝে আসিয়া ভট্টাচার্যীয় ভঙ্গি ও স্বরে সার্বভৌম মহাশয়কে কহিতেন, "ওহে ভায়া, শাস্ত্রে আছে—

যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধোভবেৎ পুমান্‌।
যন্ন বালৈঃ পরিবৃতং শ্মশানমিব তদ্‌গৃহম্‌।

কিন্তু তোমাতে তদ্‌বৈপরীত্যই লক্ষিত হচ্ছে। কারণ কিনা, যখন তোমার ব্রাহ্মণী বিদ্যমান ছিলেন তখন তুমি ভয়ে আশঙ্কায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছিলে, স্ত্রীবিয়োগের পর আবার দেখতে দেখতে শরীর দ্বিগুণ হয়ে উঠল। অপরন্তু শাস্ত্রে যে লিখছে বালকের দ্বারা পরিবৃত না হইলে গৃহ শ্মশানসমান হয়, কিন্তু বালককর্তৃক পরিবৃত হওয়া প্রযুক্তই তোমার গৃহ শ্মশানসমান হয়েছে।"

এই বলিয়া সমীপস্থ সকলকে চোখ টিপিতেন ও সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিলে পর তিনি সন্তোষের সহিত মুহুর্মুহু নস্য লইতেন।

ও পারের একটি মেয়ের সঙ্গে সার্বভৌম মহাশয়ের সম্বন্ধ হইয়াছে। এ কয়দিন পণ্ডিতমহাশয় বড়ো মনের স্ফূর্তিতে আছেন। পাঠশালার ছুটি হইয়াছে। আজ পাত্র দেখিতে আসিবে, পাড়ার কোনো দুষ্ট লোকের পরামর্শ শুনিয়া পণ্ডিতমহাশয়

নরেন্দ্রের নিকট হইতে এক জোড়া ফুল মোজা, জরির পোশাক ও পাগড়ি চাহিয়া আনিলেন। পাড়ার দুষ্ট লোকেরা এই-সকল বেশ পরাইয়া তাঁহাকে সঙ সাজাইয়া দিল। ক্ষুদ্রপরিসর পাগাড়িটি পণ্ডিতমহাশয়ের বিশাল মস্তকের টিকির অংশটুকু অধিকার করিয়া রহিল মাত্র, চার পাঁচটা বোতাম ছিঁড়িয়া কষ্টে-সৃষ্টে পণ্ডিত-মহাশয়ের উদরের বেড়ে চাপকান কুলাইল। অনেক ক্ষণের পর বেশভূষা সমাপ্ত হইলে পর সার্বভৌম মহাশয় দর্পণে একবার মুখ দেখিলেন। জরির পোশাকের চাকচিক্য দেখিয়া তাঁহার মন বড়ো তৃপ্ত হইল। কিন্তু সেই ঢলঢলে জুতা পরিয়া, আঁট সাঁট চাপকান গায়ে দিয়া চলিতেও পারেন না, নড়িতেও পারেন না, জড়ভরতের মতো এক স্থানে বসিয়াই রহিলেন। মাথা একটু নিচু করিলেই মনে হইতেছে পাগড়ি বুঝি খসিয়া পড়িবে। ঘাড়-বেদনা হইয়া উঠিল, তথাপি যথাসাধ্য মাথা উঁচু করিয়া রাখিলেন। ঘণ্টাখানেক এইরূপ বেশে থাকিয়া তাঁহার মাথা ধরিয়া উঠিল, মুখ শুকাইয়া গেল, অনর্গল ঘর্ম প্রবাহিত হইতে লাগিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। পল্লীর ভদ্রলোকেরা আসিয়া অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া তাঁহার বেশ পরিবর্তন করাইল।

ভট্টাচার্যমহাশয় তাঁহার অব্যবস্থিত গৃহ পরিষ্কৃত ও সজ্জিত করিবার নিমিত্ত নানা খোসামোদ করিয়া নিধিরাম ভট্টকে আহ্বান করিয়াছেন। এই নিধিরামের উপর পণ্ডিতমহাশয়ের অতিরিক্ত ভক্তি ছিল। তিনি বলিতেন, গার্হস্থ্য ব্যাপার সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিতে নিধি তাঁহার পুরাতন গৃহিণীর সমান, মকদ্দমার নানাবিধ জটিল তর্কে সে স্বয়ং মেজেস্টোর সায়েবকেও ঘোল পান করাইতে পারে এবং সকল বিষয়ের সংবাদ রাখিতে ও চতুরতাপূর্বক সকল কাজ সম্পন্ন করিতে সে কালেজের ছেলেদের সমানই হউক বা কিছু কমই হউক।

চতুরতাভিমানী লোকেরা আপনার অভাব লইয়া গর্ব করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গার্হস্থ্য ব্যবস্থার চতুরতা জানাইতে চায় সে আপনার দারিদ্র্য লইয়া গর্ব করে, অর্থাৎ 'অর্থের অভাব সত্ত্বেও কেমন সুচারুরূপে সংসারের শৃঙ্খলা সম্পাদন করিতেছি'। নিধি তাঁহার মূর্খতা লইয়া গর্ব করিতেন। গল্পবাগীশ লোক মাত্রেই পণ্ডিত-মহাশয়ের প্রতি বড়ো অনুকূল। কারণ, নীরবে সকল প্রকারের গল্প শুনিয়া যাইতে ও বিশ্বাস করিতে পল্লীতে পণ্ডিতমহাশয়ের মতো আর কেহই ছিল না। এই গুণে বশীভূত হইয়া নিধি মাসের মধ্যে প্রায় দুই শত বার করিয়া তাঁহার এক বিবাহের গল্প শুনাইতেন। গল্পের ডালপালা ছাঁটিয়া-ছুটিয়া দিলে সারমর্ম এইরূপ দাঁড়ায়—নিধিরাম ভট্ট বর্ণপরিচয় পর্যন্ত শিখিয়াই লেখাপড়ায় দাঁড়ি দিয়াছিলেন, কিন্তু চালাকির জোরে বিদ্যার অভাব পূরণ করিতেন। নিধির বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু এমন শ্বশুর পৃথিবীতে নাই যে নিধির মতো গোমূর্খকে জানিয়া শুনিয়া কন্যা সম্প্রদান করে। অনেক কৌশলে ও পরিশ্রমে পাত্রী স্থির হইল। আজ জামাতাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে। অদ্বিতীয় চতুর নিধি দাদার সহিত পরামর্শ করিয়া একটি পালকি আনাইল এবং চাপকান ও শামলা পরিয়া গুটিকতক কাগজের তাড়া হাতে করিয়া কন্যা-কর্তাদিগের সম্মুখেই পালকিতে চড়িলেন। দাদা কহিলেন, 'ও নিধি, আজ যে তোমাকে দেখতে এয়েচেন।' নিধি কহিলেন, 'না দাদা, আজ সাহেব সকাল-সকাল আসবে, ঢের কাজ ঢের লেখাপড়া আছে, আজ আর হচ্ছে না।' কন্যা-

কর্তারা জানিয়া গেল যে, নিধি কাজ কর্ম করে, লেখাপড়াও জানে। তাহার পরদিনেই বিবাহ হইয়া গেল। নিধি ইহার মধ্যে একটি কথা চাপিয়া যায়, আমরা সেটি সন্ধান পাইয়াছি—পাড়ার একটি এন্‌ট্রেন্‌স্‌ ক্লাসের ছাত্র তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, 'যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কোন্‌ কলেজে পড়, তবে বলিয়ো বিশপ্‌স্‌ কলেজে।' দৈবক্রমে বিবাহসভায় ঐ প্রশ্ন করায় নিধি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিয়াছিল বিষাক্ত কালেজে। ভাগ্যে কন্যাকর্তারা নিধির মূর্খতাকে রসিকতা মনে করে, তাই সে যাত্রায় সে মানে মানে রক্ষা পায়।

নিধি আসিয়াই মহা গোলযোগ বাধাইয়া দিলেন। 'ওরে ও'—'ওরে তা'—এ ঘরে একবার, ও ঘরে একবার—এটা ওল্‌টাইয়া, ওটা পাল্‌টাইয়া—দুই-একটা বাসন ভাঙিয়া, দুই-একটা পুঁথি ছিঁড়িয়া—পাড়া-সুদ্ধ তোলপাড় করিয়া তুলিলেন। কোনো কাজই করিতেছেন না অথচ মহা গোল, মহা ব্যস্ত। চটিজুতা চট্‌ চট্‌ করিয়া এ ঘর ও ঘর, এ বাড়ি ও বাড়ি, এ পাড়া ও পাড়া করিতেছেন—কোনোখানেই দাঁড়াইতেছেন না, ঊর্ধ্বশ্বাসে ইহাকে দু-একটি উহাকে দুই-একটি কথা বলিয়া আবার সট্‌ সট্‌ করিয়া গুরুমহাশয়ের বাড়ি প্রবেশ করিতেছেন। ফলটা এই সন্ধ্যার সময় গিয়া দেখিব—সার্বভৌমমহাশয়ের বাড়ি যে-কে-সেই, তবে পূর্বে এক দিনে যাহা পরিষ্কৃত হইত এখন এক সপ্তাহেও তাহা হইবে না। যাহা হউক, গৃহ পরিষ্কার করিতে গিয়া একটি গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছিল—ঝাঁটার আঘাতে, লোকজনের কোলাহলে, তিন-ঘর বোলতা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। নিধিরামের নাক মুখ ফুলিয়া উঠিল—চটি জুতা ফেলিয়া, টিকি উড়াইয়া, কোঁচার কাপড়ে পা জড়াইতে জড়াইতে, চৌকাটে হুঁচুট খাইতে খাইতে, পণ্ডিতমহাশয়কে গালি দিতে দিতে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। এক সপ্তাহ ধরিয়া বাড়ির ঘরে ঘরে বিশৃঙ্খল বোলতার দল উড়িয়া বেড়াইত। বেচারি পণ্ডিতমহাশয় দশ দিন আর অরক্ষিত গৃহে বোলতার ভয়ে প্রবেশ করেন নাই, প্রতিবাসীর বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন ও যাইবার সময় ঘটি ঘড়া ইত্যাদি যে-সকল দ্রব্য বাড়িতে দেখিয়া গিয়াছিলেন. আসিবার সময় তাহা আর দেখিতে পাইলেন না।

অদ্য বিবাহ হইবে। পণ্ডিতমহাশয় কাল সমস্ত রাত স্বপ্ন দেখিয়াছেন। বহু-কালের পুরানো সেই ঝাঁটাগাছটি স্বপ্নে দেখিতে পাইয়াছিলেন, এটি তাঁহার শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে হইল। হাসিতে হাসিতে প্রত্যুষেই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছেন। চেলীর জোড় পরিয়া চন্দনচর্চিত কলেবরে ভাবে ভোর হইয়া বসিয়া আছেন। থাকিয়া থাকিয়া সহসা পণ্ডিতমহাশয়ের মনে একটি দুর্ভাবনার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, সকলই তো হইল, এখন নৌকায় উঠিবেন কী করিয়া। অনেক ক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিলেন ; বিশ-বাইশ ছিলিম তাম্রকূট ভস্ম হইলে ও দুই-এক ডিবা নস্য ফুরাইয়া গেলে পর একটা সদুপায় নির্ধারিত হইল। তিনি ঠিক করিলেন যে নিধি-রামকে সঙ্গে লইবেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল নিধিরাম সঙ্গে থাকিলে নৌকা ডুবিবার কোনো সম্ভাবনাই নাই। নিধির অন্বেষণে চলিলেন। সেদিনকার দুর্ঘটনার পরে নিধি 'আর পণ্ডিতমহাশয়ের বাড়িমুখা হইব না' বলিয়া স্থির করিয়াছিল, অনেক খোশা-মোদে স্বীকৃত হইল। এইবার নৌকায় উঠিতে হইবে। সার্বভৌমমহাশয় তীরে দাঁড়াইয়া নস্য লইতে লাগিলেন। আমাদের নিধিরামও নৌকাকে বড়ো কম ভয়

করিতেন না, যদি কন্যাকর্তাদের বাড়িতে আহারের প্রলোভন না থাকিত তাহা হইলে প্রাণান্তেও নৌকায় উঠিতেন না। অনেক কষ্টে পাঁচ-ছয়-জন মাঝিতে ধরাধরি করিয়া তাঁহাদিগকে কোনোক্রমে তো নৌকায় তুলিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা যতই নড়েচড়ে পণ্ডিতমহাশয় ততই ছট্‌ফট্‌ করেন, পণ্ডিতমহাশয় যতই ছট্‌ফট্‌ করেন নৌকা ততই টল্‌মল্‌ করে; মহা হাঙ্গাম, মাঝিরা বিব্রত, পণ্ডিতমহাশয় চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন ও মাঝিদিগকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, যদিই পাড়ি দিতে হইল তবে যেন ধার-ধার দিয়া দেওয়া হয়। নিধিরামের মুখে কথাটি নাই। তিনি এমন অবস্থায় আছেন যে, একটু বাতাস উঠিলে বা একটু মেঘ দেখা দিলেই নৌকার মাস্তুলটা লইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন। পণ্ডিতমহাশয় আকুল ভাবে নিধির মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। দুই-এক জায়গায় তরঙ্গবেগে নৌকা একটু টলমল করিল, নিধি লাফাইয়া উঠিল, পণ্ডিতমহাশয় নিধিকে জড়াইয়া ধরিলেন। তখনও তাঁহার বিশ্বাস ছিল নিধিকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে প্রাণহানির কোনো সম্ভাবনা নাই। নিধি সার্বভৌমমহাশয়ের বাহুপাশ ছাড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পণ্ডিতমহাশয় ততই প্রাণপণে আঁটিয়া ধরিতে লাগিলেন। শীর্ণ-কায় নিধি দারুণ নিষ্পেষণে রুদ্ধশ্বাস হইয়া যায় আর-কি, রোষে বিরক্তিতে যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিল। এইরূপ গোলযোগ করিতে করিতে নৌকা তীরে লাগিল। মাঝিরা এরূপ নৌকাযাত্রা আর কখনও দেখে নাই। তাহারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, কণ্ঠাগতপ্রাণ নিধি নিশ্বাস লইয়া বাঁচিলেন, পণ্ডিতমহাশয় এক ঘটি জল খাইয়া বাঁচিলেন।

বিবাহের সন্ধ্যা উপস্থিত। পণ্ডিতমহাশয় টিকিযুক্ত শিরে টোপর পরিয়া গদির উপর বসিয়া আছেন। অনাহারে, নৌকার পরিশ্রমে ও অভ্যাসদোষে দারুণ ঢুলিতেছেন। মাথার উপর হইতে মাঝে মাঝে টোপর খসিয়া পড়িতেছে। পার্শ্ববর্তী নিধি মাঝে মাঝে এক-একটি গুঁতা মারিতেছে; সে এমন গুঁতা যে তাহাতে মৃত ব্যক্তিরও চৈতন্য হয়, সেই গুঁতা খাইয়া পণ্ডিতমহাশয় আবার ধড়্‌ফড়িয়া উঠিতেছেন ও শিরচ্যুত টোপরটি মাথায় পরিয়া মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে চারি দিক অবলোকন করিতেছেন, সভাময় চোখ-টেপাটেপি করিয়া হাসি চলিতেছে। লগ্ন উপস্থিত হইল, বিবাহের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। পণ্ডিতমহাশয় দেখিলেন, পুরোহিতটি তাঁহারই টোল-আউট শিষ্য। শিষ্য মহা লজ্জায় পড়িয়া গেল। পণ্ডিতমহাশয় কানে কানে কহিলেন, তাহাতে আর লজ্জা কী! এবং লজ্জা করিবার যে কোনো প্রয়োজন নাই এ কথা তিনি স্কন্দ ও কল্কিপুরাণ হইতে উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া প্রমাণ করিলেন। সার্বভৌম-মহাশয় বিবাহ-আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পুরোহিত মন্ত্র বলিবার সময় একটা ভুল করিল। সংস্কৃতে ভুল পণ্ডিতমহাশয়ের সহ্য হইল না, অমনি মুগ্ধবোধ ও পাণিনি হইতে গণ্ডা আষ্টেক সূত্র আওড়াইয়া ও তাহা ব্যাখ্যা করিয়া পুরোহিতের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলেন। পুরোহিত অপ্রস্তুত হইয়া ও ভেবাচেকা খাইয়া আরও কতকগুলি ভুল করিল। পণ্ডিতমহাশয় দেখিলেন যে, তিনি টোলে তাহাকে যাহা শিখাইয়াছিলেন পুরোহিত বাবাজি চাল-কলার সহিত তাহা নিঃশেষে হজম করিয়াছেন। বিবাহ হইয়া গেল। উঠিবার সময় সার্বভৌমমহাশয় কিরূপ বেগতিকে পায়ে পা জড়াইয়া তাঁহার শ্বশুরের ঘাড়ে পড়িয়া গেলেন, উভয়ে বিবাহসভায় ভূমিসাৎ হইলেন

বরের কাপড় ছিঁড়িয়া গেল, টোপর ভাঙিয়া গেল। শ্বশুরের শূলবেদনা ছিল, স্থূলকায় ভট্টাচার্যমহাশয় তাঁহার উদর চাপিয়া পড়াতে তিনি বিষম চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সাত-আট জন ধরাধরি করিয়া উভয়কে তুলিল, সভাসুদ্ধ লোক হাসিতে লাগিল, পণ্ডিতমহাশয় মর্মান্তিক অপ্রস্তুত হইলেন ও দুই-একটি কী কথা বলিলেন তাহার অর্থ বুঝা গেল না। একবার দৈবাৎ অপ্রস্তুত হইলে পদে পদে অপ্রস্তুত হইতেই হইবে। অন্তঃপুরে গিয়া গোলেমালে পণ্ডিতমহাশয় তাঁহার শাশুড়ির পা মাড়াইয়া দিলেন, তাঁহার শাশুড়ি 'নাঃ— কিছু হয় নাই' বলিলেন ও অন্দরে গিয়া সিক্ত বস্ত্র-খণ্ড তাঁহার পায়ের আঙুলে বাঁধিয়া আসিলেন। আহার করিবার সময় দৈবক্রমে গলায় জল বাধিয়া গেল, আধঘণ্টা ধরিয়া কাশিতে কাশিতে নেত্র অশ্রুজলে ভরিয়া গেল। বাসর-ঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটা আরসুলা আসিয়া তাঁহার গায়ে উড়িয়া বসিল। অমনি লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া, হাত পা ছড়াইয়া, মুখ বিকটাকার করিয়া তাঁহার শালীদের ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িলেন। আবার দুইটি-চারিটি কান-মলা খাইয়া ঠিক স্থানে আসিয়া বসিলেন। একটা কথা ভুলিয়া গিয়াছি, স্ত্রী-আচার করিবার সময় পণ্ডিতমহাশয় এমন উপর্যুপরি হাঁচিতে লাগিলেন যে চারি দিকের মেয়েরা বিব্রত হইয়া পড়িল। বাসর-ঘরের বিপদ হইতে কী করিয়া উদ্ধার হইবেন এ বিষয়ে পণ্ডিতমহাশয় অনেক ভাবিয়াছিলেন; সহসা নিধিকে মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু নিধির বাসর-ঘরে যাইবার কোনো উপায় ছিল না। যাহা হউক, ভালোমানুষ বেচারি অতিশয় গোলে পড়িয়াছিলেন। শুনিয়াছি দুটি-একটি কী কথার উত্তর দিতে গিয়া স্মৃতি ও বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এবং যখন তাঁহাকে গান করিতে অনুরোধ করে, অনেক পীড়াপীড়ির পর গাহিয়াছিলেন 'কোথায় তারিণী মা গো বিপদে তারহ সুতে'। এই তিনি মনের সঙ্গে গাহিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভট্টাচার্যমহাশয় রাগিণীর দিকে বড়ো একটা নজর করেন নাই, যে সুরে তিনি পুঁথি পড়িতেন সেই সুরেই গানটি গাহিয়াছিলেন। যাহা হউক, অনেক কষ্টে বিবাহ-রাত্রি অতিবাহিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র নরেন্দ্রদের দলে মিশিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও মহেন্দ্রের আচার-ব্যবহারে এমন একটি মহত্ত্ব জড়িত ছিল যে, নরেন্দ্র তাহার সহিত ভালো করিয়া কথা কহিতে সাহস করিত না। এমন-কি সে থাকিলে নরেন্দ্র কেমন একটা অসুখ অনুভব করিত, সে চলিয়া গেলে কেমন একটু শান্তিলাভ করিত। অলক্ষিতভাবে নরেন্দ্রের মন মহেন্দ্রের মোহিনীশক্তির পদানত হইয়াছিল।

মহেন্দ্র বড়ো মৃদুস্বভাব লোক— হাসিবার সময় মুচকিয়া হাসে, কথা কহিবার সময় মৃদুস্বরে কথা কহে, আবার অধিক লোকজন থাকিলে মূলেই কথা কহে না। সে কাহারও কথায় সায় দিতে হইলে 'হাঁ' বলিত বটে, কিন্তু সায় দিবার ইচ্ছা না থাকিলে 'হাঁ'ও বলিত না, 'না'ও বলিত না। এ মহেন্দ্র নরেন্দ্রের মনের উপর যে অমন আধিপত্য স্থাপন করিবে তাহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় বটে।

মহেন্দ্রের সহিত গদাধরের বড়ো ভাব হইয়াছিল। ঘরে বসিয়া উভয়ে মিলিয়া

দেশাচারের বিরুদ্ধে নিদারুণ কাল্পনিক সংগ্রাম করিতেন। স্বাধীনবিবাহ বিধবাবিবাহ প্রভৃতি প্রসঙ্গে মহেন্দ্র সংস্কারকমহাশয়ের সহিত উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন, কিন্তু বহুবিবাহনিবারণ-প্রসঙ্গে তাঁহার তেমন উৎসাহ থাকিত না। এ ভাবের তাৎপর্য যদিও গদাধরবাবু বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু আমরা এক রকম বুঝিয়া লইয়াছি।

গদাধর ও স্বরূপের সঙ্গে মহেন্দ্রের যেমন বনিয়া গিয়াছিল, এমন নরেন্দ্র ও তাহার দলবলের সহিত হয় নাই। মহেন্দ্র ইহাদের নিকট ক্রমে তাহার দুই-একটি করিয়া মনের কথা বলিতে লাগিল, অবশেষে মোহিনীর সহিত প্রণয়ের কথাটাও অবশিষ্ট রহিল না। এই প্রণয়ের কথাটা শুনিয়া স্বরূপবাবু অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন মহেন্দ্র তাঁহার প্রণয়ের অন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছেন; অনেক দুঃখ করিয়া অনেক কবিতা লিখিলেন এবং আপনাকে একজন উপন্যাস-নাটকের নায়ক কল্পনা করিয়া মনে-মনে একটু তৃপ্ত হইলেন।

গদাধর কোনো প্রকারে মোহিনীর পারিবারিক অধীনতাশৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া তাহাকে মুক্ত বায়ুতে আনয়ন করিবার জন্য মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন। তিনি কহেন, গৃহ হইতে আমাদের স্বাধীনতা শিক্ষা করা উচিত, প্রথমে পারিবারিক অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে শিখিলে ক্রমশ আমরা স্বাধীনতাপথে অগ্রসর হইতে পারিব। ইংরাজি শাস্ত্রে লেখে : Charity begins at home । তেমনি গৃহ হইতে স্বাধীনতার শুরু। সংস্কারকমহাশয় নিজে বাল্যকাল হইতেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আসিতেছেন। বারো বৎসর বয়সে পিতার সহিত বিবাদ করিয়া তিনি গৃহ হইতে নিরুদ্দেশ হন, ষোলো বৎসর বয়সে শিক্ষকের সহিত বিবাদ করিয়া ক্লাস ছাড়িয়া চলিয়া আসেন, কুড়ি বৎসর বয়সে তাঁহার স্ত্রীর সহিত মনান্তর হয় এবং তাঁহাকে তাঁহার বাপের বাড়ি পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হন এবং এইরূপে স্বাধীনতার সোপানে সোপানে উঠিয়া সম্প্রতি ত্রিশ বৎসর বয়সে নিজে সমস্ত কুসংস্কার ও প্রেজুডিসের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া অসভ্য বঙ্গদেশের নির্দয় দেশাচারসমূহকে বক্তৃতার ঝটিকায় ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু গদাধরের সহিত মহেন্দ্রের মতের ঐক্য হইল না, এমন-কি মহেন্দ্র মনে-মনে একটু অসন্তুষ্ট হইল। গদাধর আর অধিক কিছু বলিল না ; ভাবিল, 'আরও দিনকতক যাক, তাহার পরে পুনরায় এই কথা তুলিব।'

আরও দিনকতক গেল, মহেন্দ্র এখন নরেন্দ্রদের দলে সম্পূর্ণরূপে যোগ দিয়াছে। মহেন্দ্রের মনে আর মনুষ্যত্বের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। গদাধর আর-একবার পূর্ব-কার কথা পাড়িল, মহেন্দ্রের তাহাতে কোনো আপত্তি হইল না।

মহেন্দ্রের নামে কলঙ্ক ক্রমে রাষ্ট্র হইতে লাগিল। কিন্তু মহেন্দ্রের হৃদয়ে এতটুকু লোকলজ্জা অবশিষ্ট ছিল না যে, এই অপবাদে তাহার মন তিলমাত্র ব্যথিত হইতে পারে।

মহেন্দ্রের ভগিনী পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা ইহাতে কিছু কষ্ট পাইল বটে, কিন্তু হতভাগিনী রজনীর হৃদয়ে যেমন আঘাত লাগিল এমন আর কাহারও নয়। যখন মহেন্দ্র মদ খাইয়া এলোমেলো বকিতে থাকে তখন রজনীর কী মর্মান্তিক ইচ্ছা হয় যে, আর কেহ সেখানে না আসে। যখন মহেন্দ্র মাতাল অবস্থায় টলিতে টলিতে

আইসে রজনী তাহাকে কোনো ক্রমে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়, তখন তাহার কতই-না ভয় হয় পাছে আর কেহ দেখিতে পায়। অভাগিনী মহেন্দ্রকে কোনো কথা বলিতে, পরামর্শ দিতে বা বারণ করিতে সাহস করিত না, তাহার যতদূর সাধ্য কোনোমতে মহেন্দ্রের দোষ আর কাহাকেও দেখিতে দিত না। মহেন্দ্রের অসম্বৃত অবস্থায় রজনীর ইচ্ছা করিত তাহাকে বুক দিয়া ঢাকিয়া রাখে, যেন আর কেহ দেখিতে না পায়। কেহ তাহার সাক্ষাতে মহেন্দ্রের নিন্দা করিলে সে তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না, অন্তরালে গিয়া ক্রন্দন করা ভিন্ন তাহার আর কোনো উপায় ছিল না। সে তাহার মহেন্দ্রের জন্য দেবতার কাছে কত প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু মহেন্দ্র তাহার মত্ত অবস্থায় রজনীর মরণ ভিন্ন কিছুই প্রার্থনা করে নাই। রজনী মনে-মনে কহিত, 'রজনীর মরিতে কতক্ষণ, কিন্তু রজনী মরিলে তোমাকে কে দেখিবে।'

একদিন রাত্রি দুইটার সময় টলিতে টলিতে মহেন্দ্র ঘরে আসিয়া ভূমিতলে শুইয়া পড়িল। রজনী জাগিয়া জানালায় বসিয়া ছিল, সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বসিল। মহেন্দ্র তখন অচৈতন্য। রজনী ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে কতক্ষণের পর মহেন্দ্রের মাথা কোলে তুলিয়া লইল। আর কখনো সে মহেন্দ্রের মাথা কোলে রাখে নাই; সাহসে বুক বাঁধিয়া আজ রাখিল। একটি পাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল। ভোরের সময় মহেন্দ্র জাগিয়া উঠিল; পাখা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কহিল, 'এখানে কী করিতেছ। ঘুমাও গে না!' রজনী ভয়ে থতমত খাইয়া উঠিয়া গেল। মহেন্দ্র আবার ঘুমাইয়া পড়িল। প্রভাতের রৌদ্র মুক্ত বাতায়ন দিয়া মহেন্দ্রের মুখের উপর পড়িল, রজনী আস্তে আস্তে জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

রজনী মহেন্দ্রকে যত্ন করিত, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে করিতে সাহস করিত না। সে গোপনে মহেন্দ্রের খাবার গুছাইয়া দিত, বিছানা বিছাইয়া দিত এবং সে অল্পস্বল্প যাহা-কিছু মাসহারা পাইত তাহা মহেন্দ্রের খাদ্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য কিনিতেই ব্যয় করিত, কিন্তু এ-সকল কথা কেহ জানিতে পাইত না। গ্রামের বালিকারা, প্রতিবেশিনীরা, এত লোক থাকিতে নির্দোষী রজনীরই প্রতি কার্যে দোষারোপ করিত, এমন-কি বাড়ির দাসীরাও মাঝে মাঝে তাহাকে দুই-এক কথা শুনাইতে ত্রুটি করিত না, কিন্তু রজনী তাহাতে একটি কথাও কহিত না— যদি কহিতে পারিত তবে অত কথা শুনিতেও হইত না।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইবে। মেঘ করিয়াছে, একটু বাতাস নাই, গাছে গাছে পাতায় পাতায় হাজার হাজার জোনাকি পোকা মিট্ মিট্ করিতেছে। মোহিনীদের বাড়িতে একটি মানুষ আর জাগিয়া নাই, এমন সময়ে তাহাদের খিড়কির দরজা খুলিয়া দুই-জন তাহাদের বাগানে প্রবেশ করিল। একজন বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিল আর একজন গৃহে প্রবেশ করিল। যিনি বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিলেন তিনি গদাধর, যিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন তিনি মহেন্দ্র। দুই জনেরই অবস্থা বড়ো ভালো নহে, গদাধরের এমন বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা হইতেছে যে তাহা বলিবার নহে, এবং মহেন্দ্রের পথের মধ্যে এমন শয়ন করিবার ইচ্ছা হইতেছে যে কী বলিব। ঘোরতর বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, গদাধর দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিলেন। পরোপকারের জন্য কী কষ্ট না

সহ্য করা যায়, এমন-কি, এখনই যদি বজ্র পড়ে গদাধর তাহা মাথায় করিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু এই কথাটা অনেক ক্ষণ ভাবিয়া দেখিলেন যে, এখনই তাহাতে তিনি প্রস্তুত নহেন; বাঁচিয়া থাকিলে পৃথিবীর অনেক উপকার করিতে পারিবেন। বৃষ্টিবজ্রের সময় বৃক্ষতলে দাঁড়ানো ভালো নয় জানিয়া একটি ফাঁকা জায়গায় গিয়া বসিলেন, বৃষ্টি দ্বিগুণ বেগে পড়িতে লাগিল।

এদিকে মহেন্দ্র পা টিপিয়া টিপিয়া মোহিনীর ঘরের দিকে চলিল, যতই সাবধান হইয়া চলে ততই খস্ খস্ শব্দ হয়। ঘরের সম্মুখে গিয়া আস্তে আস্তে দরজায় ধাক্কা মারিল, ভিতর হইতে দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, "মোহিনী! দেখ্ তো বিড়াল বুঝি!"

দিদিমার গলা শুনিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি সরিবার চেষ্টা দেখিলেন। সরিতে গিয়া একরাশি হাঁড়ি-কলসীর উপর গিয়া পড়িলেন। হাঁড়ির উপর কলসী পড়িল, কলসীর উপর হাঁড়ি পড়িল এবং কলসী হাঁড়ি উভয়ের উপর মহেন্দ্র পড়িল। হাঁড়িতে কলসীতে, থালায় ঘটিতে দারুণ ঝন্ ঝন্ শব্দ বাধাইয়া দিল এবং কলসী হইতে ঘড় ঘড় শব্দে জল গড়াইতে লাগিল। বাড়ির ঘরে ঘরে 'কী হইল' 'কী হইল' শব্দ উপস্থিত হইল। মা উঠিলেন, পিসি উঠিলেন, দিদি উঠিলেন, খোকা কাঁদিয়া উঠিল, দিদিমা বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে পোড়ারমুখা বিড়ালের মরণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন— মোহিনী প্রদীপ হস্তে বাহিরে আসিল। দেখিল মহেন্দ্র; তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া কহিল, "পালাও! পালাও!"

মহেন্দ্র পলাইবার উদ্যোগ করিল ও মোহিনী তাড়াতাড়ি প্রদীপ নিভাইয়া ফেলিল। দিদিমা চক্ষে কম দেখিতেন বটে, কিন্তু কানে বড়ো ঠিক ছিলেন। মোহিনীর কথা শুনিতে পাইলেন, তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, "কাহাকে পলাইতে বলিতেছিস মোহিনী।"

দিদিমা অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু পলায়নের ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ শুনিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে বাড়িসুদ্ধ লোক জমা হইল।

মহেন্দ্র তো অন্য পথ দিয়া পলায়ন করিল। এ দিকে গদাধর বাগানে বসিয়া ভিজিতেছেন, অনেক ক্ষণ বসিয়া বসিয়া একটু তন্দ্রা আসিতেই শুইয়া পড়িলেন। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন যেন তিনি বক্তৃতা করিতেছেন, আর হাততালির ধ্বনিতে সভা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, সভায় গবর্নর জেনেরাল উপস্থিত ছিলেন, তিনি বক্তৃতা-অন্তে পরম তুষ্ট হইয়া আপনি উঠিয়া শেক্‌হ্যান্ড্ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার পৃষ্ঠে দারুণ এক লাঠির আঘাত লাগিল। ধড়্ফড়িয়া উঠিলেন; একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কী করিতেছিস।. কে তুই।"

গদাধর জড়িত স্বরে কহিলেন, "দেশ ও সমাজ -সংস্কারের জন্য প্রাণ দেওয়া সকল মনুষ্যেরই কর্তব্য। ডাল ও ভাত সঞ্চয় করাই যাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাহারা গলায় দড়ি দিয়া মরিলেও পৃথিবীর কোনো অনিষ্ট হয় না। দেশ-সংস্কারের জন্য রাত্রি নাই, দিবা নাই, আপনার বাড়ি নাই, পরের বাড়ি নাই, সকল সময়ে সর্বত্রই কোনো বাধা মানিবে না, কোনো বিঘ্ন মানিবে না— কেবল ঐ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। যে না করে সে পশু, সে পশু, সে পশু!

অতএব"—

আর অধিক অগ্রসর হইতে হইল না; প্রহারের চোটে তাঁহার এমন অবস্থা হইল যে, আর অল্পক্ষণ থাকিলে শরীর-সংস্কারের আবশ্যকতা হইত। অতিশয় বাড়াবাড়ি দেখিয়া গদাধর বক্তৃতা-ছন্দ পরিত্যাগ করিয়া গোঙানিচ্ছন্দে তাঁহার মৃত পিতা, মাতা, কনেস্টেবল, পুলিস ও দেশের লোককে ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন। তাহারা বুঝিল যে, অধিক গোলযোগ করিলে তাহাদেরই বাড়ির নিন্দা হইবে, এইজন্য আস্তে আস্তে তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিল।

মোহিনীর উপরে তাহার বাড়িসুদ্ধ লোকের বড়োই সন্দেহ হইল। রাত্রে কে আসিয়াছিল এবং কাহাকে সে পলাইতে কহিল, এই কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য তাহার প্রতি দারুণ নিগ্রহ আরম্ভ হইল, কিন্তু সে কোনোমতে কহিল না। কিন্তু এ কথা চাপা থাকিবার নহে। মহেন্দ্র পলাইবার সময় তাহার চাদর ও জুতা ফেলিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে সকলে বুঝিতে পারিল যে মহেন্দ্রেরই এই কাজ। এই তো পাড়াময় ঢী ঢী পড়িয়া গেল। পুকুরের ঘাটে, গ্রামের পথে, ঘরের দাওয়ায়, বৃদ্ধদের চণ্ডীমণ্ডপে এই এক কথারই আলোচনা হইতে লাগিল। মোহিনীর ঘর হইতে বাহির হওয়া দায় হইল, সকলেই তাহার পানে কটাক্ষ করিয়া কথা কয়। না কহিলেও মনে হয় তাহারই কথা হইতেছে। পথে কাহারও হাস্যমুখ দেখিলে তাহার মনে হইত তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই হাসি তামাসা চলিতেছে। অথচ মোহিনীর ইহাতে কোনো দোষ ছিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র যখন বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলেন তখনও অনেক রাত আছে। নেশা অনেক ক্ষণ ছুটিয়া গেছে। মহেন্দ্রের মনে এক্ষণে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। ঘৃণায় লজ্জায় বিরক্তিতে ম্রিয়মাণ হইয়া শুইয়া পড়িল। একে একে কত কী কথা মনে পড়িতে লাগিল; শৈশবের এক-একটি স্মৃতি বজ্রের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে লাগিল। যৌবনের নবোন্মেষের সময় ভবিষ্যৎ-জীবনের কী মধুময় চিত্র তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল—কত মহান আশা, কত উদার কল্পনা তাঁহার উদ্দীপ্ত হৃদয়ের শিরায় শিরায় জড়িত বিজড়িত ছিল। যৌবনের সুখস্বপ্নে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নাম মাতৃভূমির ইতিহাসে গৌরবের অক্ষয় অক্ষরে লিখিত থাকিবে, তাঁহার জীবন তাঁহার স্বদেশীয় ভ্রাতাদের আদর্শস্বরূপ হইবে এবং ভবিষ্যৎকাল আদরে তাঁহার যশ বক্ষে পোষণ করিতে থাকিবে। কিন্তু সে হৃদয়ের, সে আশার, সে কল্পনার আজ কী পরিণাম হইল। তাঁহার যশ কলঙ্কিত হইয়াছে, চরিত্র সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে, হৃদয় দারুণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কালি হইতে তাঁহাকে দেখিলে গ্রামের কুলবধূগণ সংকোচে সরিয়া যাইবে, বন্ধুরা লজ্জায় নতশির হইবে, শত্রুদের অধর ঘৃণার হাস্যে কুটিল হইবে, বৃদ্ধেরা তাঁহার শৈশবের এই অনপেক্ষিত পরিণামে দুঃখ করিবে, যুবকেরা অন্তরালে তাঁহার নামে তীব্র উপহাস বিদ্রূপ করিবে—সর্বাপেক্ষা, তিনি যে নিরপরাধিনী বিধবার পবিত্র নামে কলঙ্ক আরোপ করিলেন তাহার আর মুখ রাখিবার স্থান থাকিবে না। মহেন্দ্র মর্মভেদী কষ্টে শয্যায় পড়িয়া

বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

মহেন্দ্রের রোদন দেখিয়া রজনীর কী কষ্ট হইতে লাগিল, রজনীই তাহা জানে। মনে-মনে কহিল, 'তোমার কী হইয়াছে বলো, যদি আমার প্রাণ দিলেও তাহার প্রতিকার হয় তবে আমি তাহাও দিব।' রজনী আর থাকিতে পারিল না, ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে মহেন্দ্রের কাছে আসিয়া বসিল। কত বার মনে করিল যে, পায়ে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিবে যে, কী হইয়াছে। কিন্তু সাহস করিয়া পারিল না, মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

মহেন্দ্র মনের আবেগে তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া গেল। রজনী ভাবিল সে কাছে আসাতেই বুঝি মহেন্দ্র চলিয়া গেল। আর থাকিতে পারিল না; কাতর স্বরে কহিল, "আমি চলিয়া যাইতেছি, তুমি শোও!"

মহেন্দ্র তাহার কিছুই উত্তর না দিয়া অন্যমনে চলিয়া গেল।

ধীরে ধীরে বাতায়নে গিয়া বসিল। তখন মেঘমুক্ত চতুর্থীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছেন। বাতায়নের নিম্নে পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর ধারের পরস্পর-সংলগ্ন অন্ধকার নারিকেলকুঞ্জের মস্তকে অস্ফুট জ্যোৎস্নার রজতরেখা পড়িয়াছে। অস্ফুট জ্যোৎস্নায় পুষ্করিণীতীরের ছায়াময় অন্ধকার গম্ভীরতর দেখাইতেছে। জ্যোৎস্নাময় গ্রাম যতদূর দেখা যাইতেছে, এমন শান্ত, এমন পবিত্র, এমন ঘুমন্ত যে মনে হয় এখানে পাপ তাপ নাই, দুঃখ যন্ত্রণা নাই— এক স্নেহহাস্যময় জননীর কোলে যেন কতকগুলি শিশু এক সঙ্গে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। মহেন্দ্রের মন ঘোর উদাস হইয়া গিয়াছে। সে ভাবিল, 'সকলেই কেমন ঘুমাইতেছে, কাহারও কোনো দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। কাল সকালে আবার নিশ্চিন্তভাবে উঠিবে, আপনার আপনার কাজকর্ম করিবে। কেহ এমন কাজ করে নাই যাহাতে পৃথিবী বিদীর্ণ হইলে সে মুখ লুকাইয়া বাঁচে, এমন কাজ করে নাই যাহাতে প্রতি মুহূর্তে তীব্রতম অনুতাপে তাহার মর্মে মর্মে শেল বিদ্ধ হয়। আমিও যদি এইরূপ নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতে পারিতাম, নিশ্চিন্তভাবে জাগিতে পারিতাম! আমার যদি মনের মতো বিবাহ হইত, গৃহস্থের মতো বিনা দুঃখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিতাম, স্ত্রীকে কত ভালোবাসিতাম, সংসারের কত উপকার করিতাম! কেমন সহজে দিনের পর রাত্রি, রাত্রের পর দিন কাটিয়া যাইত, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ও সমস্ত দিন ঘুমাইয়া এই বিরক্তিময় জীবন বহন করিতে হইত না। আহা— কেমন জ্যোৎস্না, কেমন রাত্রি, কেমন পৃথিবী! আঁধার নারিকেলবৃক্ষগুলি মাথায় একটু একটু জ্যোৎস্না মাখিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিয়া আছে; যেন তাহাদের বুকের ভিতর কী একটি কথা লুকানো রহিয়াছে। তাহাদের আঁধার ছায়া আঁধার পুষ্করিণীর জলের মধ্যে নিদ্রিত।'

মহেন্দ্র কতক্ষণ দেখিতে লাগিল, দেখিয়া দেখিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল— 'আমার ভাগ্যে পৃথিবী ভালো করিয়া ভোগ করা হইল না।'

মহেন্দ্র সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করিতে মনস্থ করিল, ভাবিল পৃথিবীতে যাহাকে ভালোবাসিয়াছে সকলকেই ভুলিয়া যাইবে। ভাবিল সে এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো উপকার করিতে পারে নাই, কিন্তু এখন হইতে পরোপকারের জন্য তাহার স্বাধীন জীবন উৎসর্গ করিবে। কিন্তু গৃহে রজনীকে একাকিনী ফেলিয়া গেলে সে

নিরপরাধিনী যে কষ্ট পাইবে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে। এ কথা ভাবিলে অনেক ক্ষণ ভাবা যাইত, কিন্তু মহেন্দ্রের ভাবিতে ইচ্ছা হইল না—ভাবিল না।

মহেন্দ্র তাহার নিজ দোষের যত-কিছু অপবাদ-যন্ত্রণা সমুদয় অভাগিনী রজনীকে সহিতে দিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। বায়ু স্তম্ভিত, গ্রামপথ আঁধার করিয়া দুই ধারে বৃক্ষশ্রেণী স্তব্ধ-গম্ভীর-বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সেই আঁধার পথ দিয়া ঝটিকাময়ী নিশীথিনীতে বায়ুতাড়িত ক্ষুদ্র একখানি মেঘখণ্ডের ন্যায় মহেন্দ্র যে দিকে ইচ্ছা চলিতে লাগিলেন।

রজনী ভাবিল যে, সে কাছে আসাতেই বুঝি মহেন্দ্র অন্যত্র চলিয়া গেল। বাতায়নে বসিয়া জ্যোৎস্নাসুপ্ত পুষ্করিণীর জলের পানে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

করুণা ভাবে এ কী দায় হইল, নরেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসে না কেন। অধীর হইয়া বাড়ির পুরাতন চাকরানি ভবির কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, নরেন্দ্র কেন আসিতেছেন না। সে হাসিয়া কহিল, সে তাহার কী জানে।

করুণা কহিল "না, তুই জানিস।"

ভবি কহিল, "ওমা, আমি কী করিয়া বলিব।"

করুণা কোনো কথায় কর্ণপাত করিল না। ভবির বলিতেই হইবে নরেন্দ্র কেন আসিতেছে না। কিন্তু অনেক পীড়াপীড়িতেও ভবির কাছে বিশেষ কোনো উত্তর পাইল না। করুণা অতিশয় বিরক্ত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল ও প্রতিজ্ঞা করিল যে, যদি মঙ্গলবারের মধ্যে নরেন্দ্র না আসেন তবে তাহার যতগুলি পুতুল আছে সব জলে ফেলিয়া দিবে। ভবি বুঝাইয়া দিল যে, পুতুল ভাঙিয়া ফেলিলেই যে নরেন্দ্রের আসিবার বিশেষ কোনো সুবিধা হইবে তাহা নহে, কিন্তু তাহার কথা শুনে কে। না আসিলে ভাঙিয়া ফেলিবেই ফেলিবে।

বাস্তবিক নরেন্দ্র অনেক দিন দেশে আসে নাই। কিন্তু পাড়ার লোকেরা বাঁচিয়াছে, কারণ আজকাল নরেন্দ্র যখনই দেশে আসে তখনই গোটা দুই-তিন কুকুর এবং তদপেক্ষা বিরক্তিজনক গোটা দুই-চার সঙ্গী তাহার সঙ্গে থাকে। তাহারা দুই-তিন দিনের মধ্যে পাড়াসুদ্ধ বিব্রত করিয়া তুলে। আমাদের পণ্ডিতমহাশয় এই কুকুরগুলা দেখিলে বড়োই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

যাহা হউক, পণ্ডিতমহাশয়ের বিবাহের কথাটা লইয়া পাড়ায় বড়ো হাসিতামাসা চলিতেছে। কিন্তু ভট্টাচার্য মহাশয় বিশ বাইশ ছিলিম তামাকের ধুঁয়ায়, গোটাকতক নস্যের টিপে এবং নবগৃহিণীর অভিমানকুঞ্চিত ভ্রূমেঘনিক্ষিপ্ত দুই-একটি বিদ্যুতালোকের আঘাতে সকল কথা তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দেন। নিধিরাম ব্যতীত পণ্ডিতমহাশয়কে বাটী হইতে কেহ বাহির করিতে পারিত না। পণ্ডিতমহাশয় আজকাল একখানি দর্পণ ক্রয় করিয়াছেন, চশমাটি সোনা দিয়া বাঁধাইয়াছেন, দূরদেশ হইতে সূক্ষ্মশুভ্র উপবীত আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী কাত্যায়নী পাড়ার মেয়েদের কাছে গল্প করিয়াছে যে, মিন্‌সা নাকি আজকাল মৃদু হাসি হাসিয়া উদরে হাত

বুলাইতে বুলাইতে রসিকতা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন। কিন্তু পণ্ডিতমহাশয়ের নামে পূর্বে কখনও এরূপ কথা উঠে নাই। আমরা পণ্ডিতমহাশয়ের রসিকতার যে দুই-একটা নিদর্শন পাইয়াছি তাহার মর্মার্থ বুঝা আমাদের সাধ্য নহে। তাহার মধ্যে প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহংকার, প্রমা, অবিদ্যা, রজ্জুতে সর্পভ্রম, পর্বতোবহ্নিমান ধূমাৎ ইত্যাদি নানাবিধ দার্শনিক হাঙ্গামা আছে। পণ্ডিতমহাশয়ের বেদান্তসূত্র ও সাংখ্যের উপর মাকড়সায় জাল বিস্তার করিয়াছে, আজকাল জয়দেবের গীতগোবিন্দ লইয়া পণ্ডিতমহাশয় ভাবে ভরপুর হইয়া আছেন। এই তো গেল পণ্ডিতমহাশয়ের অবস্থা।

আর আমাদের কাত্যায়নী ঠাকুরানীটি দিন কতক আসিয়াই পাড়ার মেয়েমহল একেবারে সরগরম করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার মতো গল্পগুজব করিতে পাড়ায় আর কাহারও সামর্থ্য নাই। হাত-পা নাড়িয়া চোখ-মুখ ঘুরাইয়া চতুর্দশ ভুবনের সংবাদ দিতেন। একজন তাঁহার নিকট কলিকাতা শহরটা কী প্রকার তাহারই সংবাদ লইতে গিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে বুঝাইয়া দেন যে, সেখানে বড়ো বড়ো মাঠ, সায়েবরা চাষ করে, রাস্তার দু ধার সিপাহি শাস্তিরি গোরার পাহারা, ঘরে ঘরে গোরু কাটে ইত্যাদি। আরও অনেক সংবাদ দিয়াছিলেন, সকল কথা আবার মনেও নাই। কাত্যায়নীর পতিভক্তি অতিরিক্ত ছিল এবং এই পতিভক্তি-সংক্রান্ত নিন্দার কথা তাঁহার কাছে যত শুনিতে পাইব এমন আর কাহারও কাছে নয়। পাড়ার সকল মেয়ের নাড়ী-নক্ষত্র পর্যন্ত অবগত ছিলেন। তাঁহার আর-একটি স্বভাব ছিল যে, তিনি ঘণ্টায় ঘণ্টায় সকলকে মনে করাইয়া দিতেন যে, মিছামিছি পরের চর্চা তাঁর কোনোমতে ভালো লাগে না আর বিন্দু, হারার মা ও বোসেদের বাড়ির বড়োবউ যেমন বিশ্ব-নিন্দুক এমন আর কেহ নয়। কিন্তু তাহাও বলি, কাত্যায়নী ঠাকুরানীকে দেখিতে মন্দ ছিল না— তবে চলিবার, বলিবার, চাহিবার ভাবগুলি কেমন এক প্রকারের। তা হউক গে, অমন এক-একজনের স্বাভাবিক হইয়া থাকে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রের অনেকগুলি দোষ জুটিয়াছে সত্য, কিন্তু করুণাকে সে-সকল কথা কে বলে বলো দেখি। সে বেচারি কেমন বিশ্বস্তচিত্তে স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহার সে স্বপ্ন ভাঙাইবার প্রয়োজন কী। কিন্তু সে অত শত বুঝেও না, অত কথায় কানও দেয় না। কিন্তু রাত দিন শুনিতে শুনিতে দুই-একটা কথা মনে লাগিয়া যায় বৈকি। করুণার অমন প্রফুল্ল মুখ, সেও দুই-একবার মলিন হইয়া যায়— নয় তো কী! কিন্তু নরেন্দ্রকে পাইলেই সে সকল কথা ভুলিয়া যায়, জিজ্ঞাসা করিতে মনেই থাকে না, অবসরই পায় না। তাহার অন্যান্য এত কথা কহিবার আছে যে, তাহাই ফুরাইয়া উঠিতে পারে না, তো, অন্য কথা! কিন্তু করুণার এ ভাব আর অধিক দিন থাকিবে না তাহা বলিয়া রাখিতেছি। নরেন্দ্র যেরূপ অন্যায় আরম্ভ করিয়াছে তাহা আর বলিবার নহে। নরেন্দ্র এখন আর কলিকাতায় বড়ো একটা যাতায়াত করে না। করুণাকে ভালোবাসিয়া যে যায় না, সে ভ্রম যেন কাহারও না হয়। কলিকাতায় সে যথেষ্ট ঋণ করিয়াছে, পাওনাদারদের ভয়ে সে কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইয়াছে।

দিনে দিনে করুণার মুখ মলিন হইয়া আসিতেছে। নরেন্দ্র যখন কলিকাতায় থাকিত ছিল ভালো। চব্বিশ ঘণ্টা চোখের সামনে থাকিলে কাহাকেই বা না চিনা যায়? নরেন্দ্রের স্বভাব করুণার নিকট ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। করুণার কিছুই তাহার ভালো লাগিত না। সর্বদাই খিট্‌খিট্‌, সর্বদাই বিরক্ত। এক মুহূর্তও ভালো মুখে কথা কহিতে জানে না—অধীরা করুণা যখন হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া তাহার নিকট আসে, তখন সে সহসা এমন বিরক্ত হইয়া উঠে যে করুণার মন একেবারে দমিয়া যায়। নরেন্দ্র সর্বদাই এমন রুষ্ট থাকে যে করুণা তাহাকে সকল কথা বলিতে সাহস করে না, সকল সময় তাহার কাছে যাইতে ভয় করে, পাছে সে বিরক্ত হইয়া তিরস্কার করিয়া উঠে। তদ্‌ভিন্ন সন্ধ্যাবেলা তাহার নিকট কাহারও ঘেঁষিবার জো ছিল না, সে মাতাল হইয়া যাহা ইচ্ছা তাই করিত। যাহা হউক, করুণার মুখ দিনে দিনে মলিন হইয়া আসিতে লাগিল। অলীক কল্পনা বা সামান্য অভিমান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে করুণার চক্ষে প্রায় জল দেখি নাই—এইবার ঐ অভাগিনী আন্তরিক মনের কষ্টে কাঁদিল। ছেলেবেলা হইতেই সে কখনও অনাদর উপেক্ষা সহ্য করে নাই, আজ আদর করিয়া তাহার অভিমানের অশ্রু মুছাইবার আর কেহই নাই। অভিমানের প্রতিদানে তাহাকে এখন বিরক্তি সহ্য করিতে হয়। যাহা হউক, করুণা আর বড়ো একটা খেলা করে না, বেড়ায় না, সেই পাখিটি লইয়া অন্তঃপুরের বাগানে বসিয়া থাকে। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে কলিকাতায় গেলে দেখিয়াছি এক-একদিন করুণা সমস্ত জ্যোৎস্নারাত্রি বাগানের সেই বাঁধা ঘাটটির উপরে শুইয়া আছে, কত কী ভাবিতেছে জানি না—ক্রমে তাহার নিদ্রাহীন নেত্রের সম্মুখ দিয়া সমস্ত রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র যেমন অর্থ ব্যয় করিতে লাগিল, তেমনি ঋণও সঞ্চয় করিতে লাগিল। সে নিজে এক পয়সাও সঞ্চয় করিতে পারে নাই, টাকার উপর তাহার তেমন মায়াও জন্মে নাই, তবে এক—পরিবারের মুখ চাহিয়া লোকে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে, তা নরেন্দ্রের সে-সকল খেয়ালই আসে নাই। একটু-আধটু করিয়া যথেষ্ট ঋণ সঞ্চিত হইল। অবশেষে এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ঘর হইতে দুটা-একটা জিনিস বন্ধক রাখিবার প্রয়োজন হইল।

করুণার শরীর অসুস্থ হইয়াছে। অনর্থক কতকগুলা অনিয়ম করিয়া তাহার পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। নরেন্দ্র কহিল সে দিবারাত্র এক পীড়া লইয়া লাগিয়া থাকিতে পারে না ; তাই বিরক্ত হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। এ দিকে করুণার তত্ত্বাবধান করে কে তাহার ঠিক নাই ; পণ্ডিতমহাশয় যথাসাধ্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেই বা কী হইবে। করুণা কোনো প্রকার ঔষধ খাইতে চায় না, কোনো নিয়ম পালন করে না। করুণার পীড়া বিলক্ষণ বাড়িয়া উঠিল পণ্ডিতমহাশয় মহা বিব্রত হইয়া নরেন্দ্রকে আসিবার জন্য এক চিঠি লিখিলেন। নরেন্দ্র আসিল, কিন্তু করুণার পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া নয়, কলিকাতায় গিয়া তাহার এত ঋণবৃদ্ধি হইয়াছে যে চারি দিক হইতে পাওনাদারেরা তাহার নামে নালিশ আরম্ভ করিয়াছে,

গতিক ভালো নয় দেখিয়া নরেন্দ্র সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

নরেন্দ্রের এবার কিছু ভয় হইয়াছে, দেশে ফিরিয়া আসিয়া ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে। এবং মদের পাত্রের মধ্যে মনের সমুদয় আশঙ্কা ডুবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। আর কাহার সঙ্গে দেখা করে নাই, কথা কহে নাই, তাহার সে ঘরটিতে কাহারও প্রবেশ করিবার জো নাই। নরেন্দ্র যেরূপ রুষ্ট ও যেরূপ কথায় কথায় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, চাকর-বাকরেরা তাহার কাছে ঘেঁষিতেও সাহস করে না। পীড়িতা করুণা খাদ্যাদি গুছাইয়া ধীরে ধীরে সে ঘরে প্রবেশ করিল ; নরেন্দ্র মহা রুষ্ট হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, কে তাহাকে সে ঘরে আসিতে কহিল। এ কথার উত্তর আর কী হইতে পারে। তাহার পরে পিশাচ যাহা করিল তাহা কল্পনা করিতেও কষ্ট বোধ হয়—পীড়িতা করুণাকে এমন নিষ্ঠুর পদাঘাত করে যে, সে সেইখানেই মূর্ছিত হইয়া পড়িল। নরেন্দ্র সে ঘর হইতে অন্যত্র চলিয়া গেল।

অল্প দিনের মধ্যে করুণার এমন আকার পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে দেখিলে সহসা চিনিতে পারা যায় না। তাহার সে শীর্ণ বিবর্ণ বিষণ্ণ মুখখানি দেখিলে এমন মায়া হয় যে, কী বলিব! নরেন্দ্র এবার তাহার উপর যত দূর অত্যাচার করিবার তাহা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সরলা সমস্তই নীরবে সহ্য করিতেছে, একটি কথা কহে নাই, নরেন্দ্রের নিকটে এক মুহূর্তের জন্য রোদনও করে নাই। একদিন কেবল অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া অনেক ক্ষণ নরেন্দ্রের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আমি তোমার কী করিয়াছি।"

নরেন্দ্র তাহার উত্তর না দিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়।

দশম পরিচ্ছেদ

একবার ঋণের আবর্ত-মধ্যে পড়িলে আর রক্ষা নাই। যখনই কেহ নালিশের ভয় দেখাইত, নরেন্দ্র তখনই তাড়াতাড়ি অন্যের নিকট হইতে অপরিমিত সুদে ঋণ করিয়া পরিশোধ করিত। এইরূপে আসল অপেক্ষা সুদ বাড়িয়া উঠিল। নরেন্দ্র এবার অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। নালিশ দায়ের হইল, সমনও বাহির হইল। একদিন প্রাতঃকালে শুভ মুহূর্তে নরেন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ হইল ও ধীরে ধীরে শ্রীঘরে বাস করিতে চলিলেন।

বেচারি করুণা না খাওয়া, না দাওয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া একাকার করিয়া দিল। কী করিতে হয় কিছুই জানে না, অধীর হইয়া বেড়াইতে লাগিল। পণ্ডিতমহাশয় এ কুসংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কী করিতে হইবে সে বিষয়ে তাঁর করুণা অপেক্ষা অধিক জানিবার কথা নহে। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া নিধিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ; নিধি জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া ধার শুধিতে পরামর্শ দিল। এখন বিক্রয় করে কে। সে স্বয়ং তাহার ভার লইল। করুণার অলংকার অল্পই ছিল—পূর্বেই নরেন্দ্র তাহার অধিকাংশ বন্ধক দিয়াছে ও বিক্রয় করিয়াছে, যাহা-কিছু অবশিষ্ট ছিল সমস্ত আনিয়া দিল। নিধি সেই সমুদয় অলংকার ও অন্যান্য গার্হস্থ্য দ্রব্য অধিকাংশ নিজে যৎসামান্য মূল্যে, কোনো কোনোটা বা বিনা মূল্যেই গ্রহণ করিল ও অবশিষ্ট বিক্রয় করিল। পণ্ডিতমহাশয় তো কাঁদিতে বসিলেন, ভয়ে কষ্টে

করুণা অধীর হইয়া উঠিল। বিক্রয় করিয়া যাহা-কিছু পাওয়া গেল তাহাতে পণ্ডিত-মহাশয় নিজের সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ দিয়া দেয়-অর্থ কোনো প্রকারে পূরণ করিয়া দিলেন। নরেন্দ্র কারাগার হইতে মুক্ত হইল, কিন্তু ঋণ হইতে মুক্ত হইল না। তদ্‌ভিন্ন এই ঘটনায় তাহার কিছুমাত্র শিক্ষাও হইল না। যে রকম করিয়াই হউক-না কেন, এখন মদ নহিলে তাহার আর চলে না। করুণার প্রতি কিছুমাত্র সদয় হয় নাই, করুণা গার্হস্থ্য দ্রব্যাদি কেন অমন করিয়া বিক্রয় করিল তাহাই লইয়া নরেন্দ্র করুণাকে যথেষ্ট পীড়ন করিয়াছে।

গদাধর ও স্বরূপ এখানে আসিয়াও জুটিয়াছে। সেবারকার প্রহারের পরও গদাধরের অন্তঃপুরসংস্কার-প্রিয়তা কিছুমাত্র কমে নাই, বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেখানেই যাউক-না কেন সেখানেই তাহার ঐ চিন্তা, নরেন্দ্রের দেশেও তাঁহার সেই উদ্দেশ্যেই আগমন। ইচ্ছা আছে এখানেও দুই-একটি সৎ উদাহরণ রাখিয়া যাইবেন। পূর্ব-পরিচিত বন্ধুদের পাইয়া নরেন্দ্র বিলক্ষণ আমোদ করিতে লাগিলেন। স্বরূপ ও গদাধরের নিকট আরও অনেক ঋণ করিলেন। তাহারা জানিত না যে নরেন্দ্র লক্ষ্মী-ভ্রষ্ট হইয়াছে, সুতরাং বিশ্বস্তচিত্তে কিঞ্চিৎ সুদের আশা করিয়া ধার দিল।

গদাধরের হস্তে এইবার একটি কাজ পড়িয়াছে। নরেন্দ্রের মুখে সে কাত্যায়নী ঠাকুরানীর সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়াছে, শুনিয়া সে মহা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এত বয়সের তারতম্য কোনো হৃদয়সম্পন্ন মনুষ্য সহ্য করিতে পারে না—বিশেষতঃ সমাজসংস্কারই যাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, হৃদয়ের প্রধান আশা, অবকাশের প্রধান ভাবনা, কার্যক্ষেত্রের প্রধান কার্য, তাহারা সমাজের এ-সকল অন্যায় অবিচার কোনো মতেই সহ্য করিতে পারে না। ইহা সংশোধনের জন্য, এ প্রকার অন্যায়রূপে বিবাহিত স্ত্রীলোকদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য সংস্কারকদিগের সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করা কর্তব্য, এবং আমাদের কাত্যায়নী দেবীর উদ্ধারের জন্য গদাধর সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতেই প্রস্তুত আছেন। আর, যখন স্বরূপবাবু তাঁহার ক্ষুদ্র কবিতাবলী পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন, তাহার মধ্যে 'রাহুগ্রাসে চন্দ্র' নামে একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে, যে বিধাতা কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, কোকিলে কুরূপ দিয়াছেন, তাঁহাকে যথেষ্ট নিন্দা করিয়া একটি বিবাহবর্ণনা লিখিত ছিল; আমরা গোপনে সন্ধান লইয়া শুনিয়াছিলাম যে, তাহা কাত্যায়নী ঠাকুরানীকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয়। অনেক সমালোচক নাকি তাহাতে অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত দিন মেঘ-মেঘ করিয়া আছে, বিন্দু-বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে, বাদলার আর্দ্র বাতাস বহিতেছে। আজ করুণা মন্দিরে মহাদেবের পূজা করিতে গিয়াছে। কাঁদিয়া-কাটিয়া প্রার্থনা করিল—যেন তাহাকে আর অধিক দিন এরূপ কষ্টভোগ করিতে না হয়; এবার তাহার যে সন্তান হইবে সে যেন পুত্র হয়, কন্যা না হয়; নারীজন্মের যন্ত্রণা যেন আর কেহ ভোগ না করে। করুণা প্রার্থনা করিল—তাহার মরণ হউক, তাহা হইলে নরেন্দ্র স্বেচ্ছামতে অকণ্টকে সুখ ভোগ করিতে পাইবে।

এই দুঃখের সময় নরেন্দ্রের এক পুত্র জন্মিল। অর্থের অনটনে সমস্ত খরচপত্র চলিবে কী করিয়া তাহার ঠিক নাই। নরেন্দ্রের পূর্বকার চাল কিছুমাত্র বিগড়ায় নাই। সেই সন্ধ্যাকালে গদাধর ও স্বরূপের সহিত বসিয়া তেমনি মদটি খাওয়া আছে—তেমনি ঘড়িটি, ঘড়ির চেনটি, ফিন্‌ফিনে ধুতিটি, এসেন্‌স্‌টুকু, আতরটুকু, সমস্তই আছে—কেবল নাই অর্থ। করুণার গার্হস্থ্যপটুতা কিছুমাত্র নাই; তাহার সকলই উল্‌টাপালটা, গোলমাল। গুছাইয়া কী করিয়া খরচপত্র করিতে হয় তাহার কিছুই জানে না, হিসাবপত্রের কোনো সম্পর্কই নাই, কী করিতে যে কী করে তাহার ঠিক নাই। করুণা যে কী গোলে পড়িয়াছে তাহা সেই জানে। নরেন্দ্র তাহাকে কোনো সাহায্য করে না, কেবল মাঝে মাঝে গালাগালি দেয় মাত্র—নিজে যে কী দরকার, কী অদরকার, কী করিতে হইবে, কী না করিতে হইবে, তাহার কিছুই ভাবিয়া পায় না। করুণা রাত দিন ছেলেটি লইয়া থাকে বটে, কিন্তু কী করিয়া সন্তান পালন করিতে হয় তাহার কিছু যদি জানে!

ভবি বলিয়া বাড়ির যে পুরাতন দাসী ছিল সে করুণার এই দুর্দশায় বড়ো কষ্ট পাইতেছে। করুণাকে সে নিজহস্তে মানুষ করিয়াছে. এইজন্য তাহাকে সে অত্যন্ত ভালোবাসে। নরেন্দ্রের অন্যায়াচরণ দেখিয়া সে মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে খুব মুখনাড়া দিয়া আসিত, হাত মুখ নাড়িয়া যাহা না বলিবার তাহা বলিয়া আসিত। নরেন্দ্র মহা রুষ্ট হইয়া কহিত, "তুই বাড়ি হইতে দূর হইয়া যা!"

সে কহিত, "তোমার মতো পিশাচের হস্তে করুণাকে সমর্পণ করিয়া কোন্‌ প্রাণে চলিয়া যাই?"

অবশেষে নরেন্দ্র উঠিয়া দুই-চারিটি পদাঘাত করিলে পরে সে গর্‌ গর্‌ করিয়া বকিতে বকিতে কখনও বা কাঁদিতে কাঁদিতে সেখান হইতে চলিয়া যাইত।

ভবিই বাড়ির গিন্নি, সেই বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম করিত, করুণাকে কোনো কাজ করিতে দিত না। করুণার এই অসময়ে সে যাহা করিবার তাহা করিয়াছে। ভবির আর কেহ ছিল না। যাহা-কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, সমস্ত করুণার জন্য ব্যয় করিত। করুণা যখন একলা পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিত তখন সে তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। করুণাও ভবিকে বড়ো ভালোবাসিত; যখন মনের কষ্টের উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিতে পারিত না, তখন দুই হস্তে ভবির গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া এমন কাঁদিয়া উঠিত যে, ভবিও আর অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিত না; সে শিশুর মতো কাঁদিয়া একাকার করিয়া দিত। ভবি না থাকিলে করুণা ও নরেন্দ্রের কী হইত বলিতে পারি না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

স্বরূপবাবু কহেন যে, পৃথিবী তাঁহাকে ক্রমাগতই জ্বালাতন করিয়া আসিয়াছে, এই নিমিত্ত মানুষকে তিনি পিশাচ জ্ঞান করেন। কিন্তু আমরা যতদূর জানি তাহাতে তিনিই দেশের লোককে জ্বালাতন করিয়া আসিতেছেন। তিনি যাহার সহিত কোনো সংস্রবে আসিয়াছেন তাহাকেই অবশেষে এমন গোলে ফেলিয়াছেন যে, কী বলিব।

স্বরূপবাবু সর্বদা এমন কবিত্বচিন্তায় মগ্ন থাকেন যে, অনেক ডাকাডাকিতেও

তাঁহার উত্তর পাওয়া যায় না ও সহসা 'অ্যাঁ' বলিয়া চমকিয়া উঠেন। হয়তো অনেক সময়ে কোনো পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন, অথচ যে সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে মানুষ আছে তাহা টেরও পান নাই, অথবা যাহারা দাঁড়াইয়া আছে তাহারা টের পায় নাই যে তিনি টের পাইতেছেন। ঘরে বসিয়া আছেন এমন সময়ে হয়তো থাকিয়া থাকিয়া বাহিরে চলিয়া যান। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, জানালার ভিতর দিয়া তিনি এক খণ্ড মেঘ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তেমন সুন্দর মেঘ কখনও দেখেন নাই। কখনও কখনও তিনি যেখানে বসিয়া থাকেন, ভুলিয়া দুই-এক খণ্ড তাঁহার কবিতা-লিখা কাগজ ফেলিয়া যান, নিকটস্থ কেহ সে কাগজ তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলে তিনি 'ও! এ কিছুই নহে' বলিয়া টুকুরা টুকুরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলেন। বোধ হয় তাঁহার কাছে তাহার আর একখানা নকল থাকে। কিন্তু লোকে বলে যে, না, অনেক বড়ো বড়ো কবির ঐরূপ অভ্যাস আছে। মনের ভুল এমন আর কাহারও দেখি নাই। কাগজপত্র কোথায় যে কী ফেলেন তাহার ঠিক নাই, এইরূপ কাগজপত্র যে কত হারাইয়া ফেলিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে! কিন্তু সুখের বিষয়, ঘড়ি টাকা বা অন্য কোনো বহুমূল্য দ্রব্য কখনও হারান নাই। স্বরূপবাবুর আর-একটি রোগ আছে, তিনি যে-কোনো কবিতা লিখেন তাহার উপরে বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে 'বিজন কাননে' বা 'গভীর নিশীথে লিখিত' বলিয়া লিখা থাকে। কিন্তু আমি বেশ জানি যে, তাহা তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্তানগণ-দ্বারা পরিবৃত গৃহে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, আমাদের স্বরূপবাবু বড়ো প্রেমিক ব্যক্তি। তিনি যত শীঘ্র প্রেমে বাঁধা পড়েন এত আর কেহ নয় ; ইহাতে তিনিও কষ্ট পান আর অনেককেই কষ্ট দেন।

স্বরূপবাবু দিবারাত্রি নরেন্দ্রের বাড়িতে আছেন। মাঝে মাঝে আড়ালে আবডালে করুণাকে দেখিতে পান, কিন্তু তাহাতে বড়ো গোলযোগ বাধিয়াছে। তাঁহার মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে ও রাত্রে ঘুম হইতেছে না। তিনি ঘোর ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মিয়াছেন— সুতরাং এখন তাঁহাকে কোকিলেও ঠোকরায় না, চন্দ্রকিরণও দগ্ধ করে না বটে, কিন্তু হইলে হয় কী— পৃথিবী তাঁহার চক্ষে অরণ্য, শ্মশান হইয়া গিয়াছে। ফুল শুকাইতেছে আবার ফুটিতেছে, সূর্য অস্ত যাইতেছে আবার উঠিতেছে, দিবস আসিতেছে ও যাইতেছে, মানুষ শুইতেছে ও খাইতেছে, সকলই যেমন ছিল তেমনি আছে, কিন্তু হায়! তাঁহার হৃদয়ে আর শান্তি নাই, দেহে বল নাই, নয়নে নিদ্রা নাই, হৃদয়ে সুখ নাই— এক কথায়, যাহাতে যাহা ছিল তাহাতে আর তাহা নাই! স্বরূপ কতকগুলি কবিতা লিখিয়া ফেলিল, তাহাতে যাহা লিখিবার সমস্তই লিখিল। তাহাতে ইঙ্গিতে করুণার নাম পর্যন্ত গাঁথিয়া দিল। এবং সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্‌ করিয়া মধ্যস্থ-নামক কাগজে পাঠাইয়া দিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নিধি নরেন্দ্রের বাড়িতে মাঝে মাঝে আইসে। কিন্তু আমরা যে ঘটনার সূত্র অবলম্বন করিয়া আসিতেছি সে সূত্রের মধ্যে কখনও পড়ে নাই, এইবার পড়িয়াছে। স্বরূপবাবু

তাহার অভ্যাসানুসারে ইচ্ছাপূর্বক বা দৈবক্রমেই হউক, এক খণ্ড কাগজ ঘরে ফেলিয়া গিয়াছেন, নিধি সে কাগজটি কুড়াইয়া পাইয়াছে। সে কাগজটিতে গুটিদুয়েক কবিতা লিখা আছে। অন্য লোক হইলে সে কবিতাগুলির সরল অর্থটি বুঝিয়া পড়িত ও নিশ্চিন্ত থাকিত, কিন্তু বুদ্ধিমান নিধি সেরূপ লোকই নহে। যদি বা তাহার কোনো গূঢ় অর্থ না থাকিত তথাপি নিধি তাহা বাহির করিতে পারিত। তবু ইহাতে তো কিছু ছিল। নিধির সে কবিতাগুলি বড়ো ভালো ঠেকিল না। ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখিল ও ভাবিল ইহার নিগূঢ় তাহাকে জানিতে হইবে। অমন বুদ্ধিমান লোকের কাছে কিছুই ঢাকা থাকে না, ইঙ্গিতে সকলই বুঝিয়া লইল। চতুরতাভিমানী লোকেরা নিজবুদ্ধির উপর অসন্দিগ্ধরূপে নির্ভর করিয়া এক-এক সময়ে যেমন সর্বনাশ ঘটায়, এমন আর কেহই নহে।

'দিদি, কেমন আছ দেখিতে আসিয়াছি' বলিয়া নিধি করুণার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। নিধি ছেলেবেলা হইতেই অনুপের অন্তঃপুরে যাইত ও করুণার মাকে মা বলিয়া ডাকিত। নিধি এখন মাঝে মাঝে প্রায়ই করুণা কেমন আছে দেখিতে আইসে। একদিন নরেন্দ্র কলিকাতায় গিয়াছে। নরেন্দ্র কবে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিবে, করুণা স্বরূপবাবুর নিকট ভবিকে জানিয়া আসিতে কহিল। নিধি আড়াল হইতে শুনিতে পাইল, মনে মনে কহিল, 'হুঁহুঁ—বুঝিয়াছি, এত লোক থাকিতে স্বরূপবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে পাঠানো কেন! গদাধরবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেও তো চলিত।'

একদিন করুণা ভবিকে কী কথা বলিতেছিল, দূর হইতে নিধি শুনিতে পাইল না, কিন্তু মনে হইল করুণা যেন একবার 'স্বরূপবাবু' বলিয়াছিল—আর-একটি প্রমাণ জুটিল। আর একদিন নরেন্দ্র স্বরূপ ও গদাধর বাগানে বসিয়াছিল, করুণা সহসা জানালা দিয়া সেই দিক পানে চাহিয়া গেল, নিধি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, করুণা স্বরূপেরই দিকে চাহিয়াছিল। নিধি এই তো তিনটি অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছে, ইহা অন্য লোকের নিকট যাহাই হউক কিন্তু নিধির নিকট ইহা সমস্তই পরিষ্কার প্রমাণ। শুদ্ধ ইহাই যথেষ্ট নহে, করুণা যে দিনে দিনে শীর্ণ বিষণ্ণ রুগ্‌ণ হইয়া যাইতেছে, নিধি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহার কারণ আর কিছুই নয়—স্বরূপের ভাবনা।

এখন স্বরূপের নিকট কথা আদায় করিতে হইবে, এই ভাবিয়া নিধি ধীরে ধীরে তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। হঠাৎ গিয়া কহিল, "করুণা তো, ভাই, তোমার জন্য একেবারে পাগল।"

স্বরূপ একেবারে চমকিয়া উঠিল। আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কী করিয়া জানিলে।"

নিধি মনে-মনে কহিল, 'হুঁ-হুঁ, আমি তোমাদের ভিতরকার কথা কী করিয়া সন্ধান পাইলাম ভাবিয়া ভয় পাইতেছ? পাইবে বৈকি, কিন্তু নিধিরামের কাছে কিছুই এড়াইতে পার না।' কহিল, "জানিলাম, এক রকম করিয়া।"

বলিয়া চোখ টিপিতে টিপিতে চলিয়া গেল। তাহার পরদিন গিয়া আবার স্বরূপকে কহিল, "করুণার সহিত তুমি যে গোপনে গোপনে দেখা সাক্ষাৎ করিতেছ ইহা নরেন্দ্র যেন টের না পায়।"

স্বরূপ কহিল, "সেকি! করুণার সহিত একবারও তো আমার দেখাসাক্ষাৎ কথা-বার্তা হয় নাই।"

নিধি মনে-মনে কহিল, 'নিশ্চয় দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল, নহিলে এত করিয়া ভাঁড়াইবার চেষ্টা করিবে কেন।' ইহাও একটি প্রমাণ হইল, কিন্তু আবার স্বরূপ যদি বলিত যে 'হাঁ দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল' তবে তাহাও একটি প্রমাণ হইত।

যাহা হউক, নিধির মনে আর সন্দেহ রহিল না। এমন একটি নিগূঢ় বার্তা নিধি আপনার বুদ্ধিকৌশলে জানিতে পারিয়াছে, এ কথা কি সে আর গোপনে রাখে। তাহার বুদ্ধির পরিচয় লোকে না পাইলে আর হইল কী। 'তুমি যাহা মনে করিতেছ তাহা নয়, আমি ভিতরকার কথা সকল জানি'—চতুরতাভিমানী লোকেরা ইহা বুঝাইতে পারিলে বড়োই সন্তুষ্ট হয়। নিধির কাছে যদি বল যে, 'রামহরিবাবু বড়ো সৎলোক' অমনি নিধি চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, 'কী বলিতেছ। কে সৎ-লোক। রামহরি বাবু? ও'—এমন করিয়া বলিবে যে তুমি মনে করিবে, এ বুঝি রামহরিবাবুর ভিতরকার কী একটা দোষ জানে। পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কহিবে, 'সে অনেক কথা।' নিধি সম্প্রতি যে গুপ্ত খবর পাইয়াছে তাহা পরামর্শ দিবার ছলে নরেন্দ্রকে বলিবে, এইরূপ মনে-মনে স্থির করিল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

কয় দিন ধরিয়া ছোটো ছেলেটির পীড়া হইয়াছে। তাহা হইবে না তো কী। কিছুরই তো নিয়ম নাই। করুণা ডাক্তার ডাকাইয়া আনিল, ডাক্তার আসিয়া কহিল পীড়া শক্ত হইয়াছে। করুণা তো দিন রাত্রি তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিল। পীড়া বাড়িতে লাগিল, করুণা কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। গ্রামের নেটিব ডাক্তার কপালীচরণবাবু পীড়ার তত্ত্বাবধান করিতেছেন, তাঁহাকে ফি দিবার সময় তিনি কহিলেন, 'থাক্, থাক্, পীড়া অগ্রে সারুক।' পণ্ডিতমহাশয় বুঝিলেন, নরেন্দ্রদের দুরবস্থা শুনিয়া দয়ার্দ্র ডাক্তারটি বুঝি ফি লইতে রাজি নহেন। দুই বেলা তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন, তিনিও অম্লানবদনে আসিলেন।

নরেন্দ্র এক্ষণে বাড়িতে নাই। ও পাড়ার পিতৃমাতৃহীন নাবালক জমিদারটি সম্প্রতি সাবালক হইয়া উঠিয়া জমিদারি হাতে লইয়াছেন, নরেন্দ্র তাঁহাকেই পাইয়া বসিয়াছেন। তাঁহারই স্কন্ধে চাপিয়া নরেন্দ্র দিব্য আরামে আমোদ করিতেছেন এবং গদাধর ও স্বরূপকে তাঁহারই হস্তে গচ্ছিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু গদাধর ও স্বরূপকে যে শীঘ্র তাঁহার স্কন্ধ হইতে নড়াইবেন, তাহার জো নাই—গদাধরের একটি উদ্দেশ্য আছে, স্বরূপেরও এক উদ্দেশ্য আছে।

ছেলেটির পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার ডাকিতে একজন লোক পাঠানো হইল। ডাক্তারটি তাহার হস্ত দিয়া, তাঁহার দু বেলার যাতায়াতের দরুন যাহা পাওনা আছে সমস্ত হিসাব সমেত এক বিল পাঠাইয়া দিলেন। ছেলেটি অবশ হইয়া পড়িয়াছে, করুণা তাহাকে কোলে করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। সকল কর্মে নিপুণ নিধি মাঝে মাঝে তাহার নাড়ি দেখিতেছে, কহিল নাড়ি অতিশয় ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। আকুলহৃদয়ে সকলেই ডাক্তারের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে,

এমন সময় বিল লইয়া সেই লোকটি ফিরিয়া আসিল। সকলেই সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'ডাক্তার কই?' সে সেই বিল হাজির করিল। সকলেই তো অবাক। মুখ চোখ শুকাইয়া পণ্ডিতমহাশয় তো ঘামিতে লাগিলেন; নিধির হাত ধরিয়া কহিলেন, "এখন উপায় কী।"

নিধি কহিল, "টাকার জোগাড় করা হউক।"

সহসা টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে। এ দিকে পীড়ার অবস্থা ভালো নহে, যত কালবিলম্ব হয় ততই খারাপ হইবে। মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল, করুণা বেচারি কাঁদিতে লাগিল। পণ্ডিতমহাশয় বিব্রত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন, হাতে যাহা-কিছু ছিল আনিলেন। কাত্যায়নী ঠাকুরানীটি টাকা বাহির করিয়া দিবার সময় অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন। পণ্ডিতমহাশয় বিস্তর কাকুতি মিনতি করিয়া তবে টাকা বাহির করেন। ভাবি তাহার শেষ সম্বল বাহির করিয়া দিল।

অনেক কষ্টে অবশেষে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা। ডাক্তারটি অম্লান বদনে কহিলেন, "ছেলে বাঁচিবে না।"

এমন সময় টলিতে টলিতে নরেন্দ্র ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ঘরে ঢুকিয়া ঘরে যে কিসের গোলমাল কিছুই ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ শূন্যনেত্রে পণ্ডিতমহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিল, অবশেষে কী বিড় বিড় করিয়া বকিয়া পণ্ডিতমহাশয়কে জড়াইয়া ধরিয়া মারিতে আরম্ভ করিল— পণ্ডিতমহাশয়ও মহা গোলযোগে পড়িয়া গেলেন। ডাক্তার ছাড়াইতে গেলেন, তাঁহার হাতে এমন একটি কামড় দিল যে রক্ত পড়িতে লাগিল। এইরূপ গোলযোগ করিয়া সেইখানে শুইয়া পড়িল।

ক্রমে শিশুর মুখ নীল হইয়া আসিল। করুণা সমস্ত গোলমালে অর্ধ-হতজ্ঞান হইয়া বালিশে ঠেস দিয়া পড়িয়াছে। ক্রমে শিশুর মৃত্যু হইল, কিন্তু দুর্বল করুণা তখন একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আহা, বিষণ্ণ করুণাকে দেখিলে এমন কষ্ট হয় যে, ইচ্ছা করে প্রাণ দিয়াও তাহার মনের যন্ত্রণা দূর করি। কতদিন তাহাকে আর হাসিতে দেখি নাই। ভালো করিয়া আহার করে না, স্নান করে না, ঘুমায় না; মলিন, বিবর্ণ, ম্রিয়মাণ, শীর্ণ; জ্যোতি-হীন চক্ষু বসিয়া গিয়াছে; মুখশ্রী এমন দীন করুণ হইয়া গিয়াছে যে, দেখিলে মনে হয় না যে এ বালিকা কখনও হাসিতে জানিত। ভাবির হস্তে যাহা-কিছু অর্থ ছিল সমস্ত প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে, কী করিয়া সংসার চলিবে তাহার কিছুই ঠিক নাই। পণ্ডিতমহাশয়ের সাহায্যে কোনোমতে দিন চলিতেছে।

নিধি স্বরূপের উল্লেখ করিয়া নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "সে বাবুটি কী করে বলিতে পারো।"

নরেন্দ্র। কেন বলো দেখি।

নিধি। ও লোকটিকে আমার তো বড়ো ভালো ঠেকে না।

নরেন্দ্র। কেন, কী হইয়াছে।

নিধি। না, কিছুই হয় নাই, তবে কিনা-- সে কথা থাক্‌--বাবুটির বাড়ি কোথায়।

নরেন্দ্র। কলিকাতা।

নিধি। আমিও তাহাই ঠাওরাইয়াছিলাম, নহিলে এমন স্বভাব হইবে কেন।

নরেন্দ্র। কেন, কী হইয়াছে, বলোই-না।

নিধি। আমি সে কথা বলিতে চাহি না। কিন্তু উহাকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দেও।

নরেন্দ্র অধীর হইয়া উঠিয়া কহিল, কী কথা বলিতেই হইবে।

নিধি কহিল, "যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার আর চারা নাই, কিন্তু সাবধান থাকিয়ো, ও লোকটি আর যেন বাড়ির ভিতরের দিকে না যায়।"

নরেন্দ্র। সেকি কথা, স্বরূপ তো বাড়ির ভিতরে যায় নাই।

নিধি। সে কি তোমাকে বলিয়া গিয়াছে।

নরেন্দ্র অবাক হইয়া নিধির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নিধি কহিল, "আমি তো ভাই, আমার কাজ করিলাম, এখন তোমার যাহা কর্তব্য হয় করো।"

নরেন্দ্র ভাবিল, এ-সকল তো বড়ো ভালো লক্ষণ নয়।

স্বরূপ কয়দিন ধরিয়া ভাবিয়াছে যে, করুণা তাহার জন্য একেবারে পাগল এ কথা নিধি সহসা তাহাকে কেন কহিল। বুঝিল, নিশ্চয় করুণা তাহাকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছে। স্বরূপ ভাবিল, 'তবে আমিও তাহার প্রেমে পাগল এ কথাও তো তাহাকে জানানো উচিত।' স্থির করিল, সুবিধা পাইলে নিজে গিয়া জানাইবে।

জ্যোৎস্না রাত্রি। ছেলেবেলা করুণা যেখানে দিন-রাত্রি খেলা করিয়া বেড়াইত সেই বাগানের ঘাটের উপর সে শুইয়া আছে, অতি ধীরে ধীরে বাতাসটি গায়ে লাগিতেছে। সেই জ্যোৎস্নারাত্রির সঙ্গে, সেই মৃদু বাতাসটির সঙ্গে, সেই নারিকেল-বনটির সঙ্গে তাহার ছেলেবেলাকার কথা এমন জড়িত ছিল, যেন তাহারা তার ছেলে-বেলাকারই একটি অংশ। সেই দিনকার কথাগুলি, শ্মশানে বায়ু-উচ্ছ্বাসের ন্যায় করুণার প্রাণের ভিতর গিয়া হু হু করিতে লাগিল। যন্ত্রণায় করুণার বুক ফাটিয়া, বুকের বাঁধন যেন ছিঁড়িয়া অশ্রুর স্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

বাগানের আর দুইজন লোক লুকাইয়া আছে, নরেন্দ্র ও স্বরূপ। নরেন্দ্র চুপিচুপি স্বরূপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছে, দেখিবে স্বরূপ কী করে।

করুণা সহসা দেখিল একজন লোক আসিতেছে। চমকিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কেও।"

স্বরূপ কহিল, "আমি স্বরূপচন্দ্র। নিধিকে দিয়া যে কথা বলিয়া পাঠানো হইয়াছিল তাহা কি স্মরণ নাই।"

করুণা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া চলিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে নরেন্দ্র আর না থাকিতে পারিয়া বাহির হইয়া পড়িল। করুণা তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্র ভাবিল তাহাকে দেখিতে পাইয়াই করুণা ভয়ে পলাইয়া গেল বুঝি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র কহিল, "হতভাগিনি, বাহির হইয়া যা!"

করুণা কিছুই কহিল না।

"এখনই দূর হইয়া যা!"

করুণা নরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র মহা রুষ্ট হইল, অগ্রসর হইয়া কঠোর ভাবে করুণার হস্ত ধরিল। করুণা কহিল, "কোথায় যাইব।"

নরেন্দ্র করুণার কেশগুচ্ছ ধরিয়া নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করিতে লাগিল; কহিল, এখনই দূর হইয়া যা।"

ভবি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "কোথায় দূরে হইয়া যাইবে।"

এবং স্মরণ করাইয়া দিল যে, ইহা তাহার পিতার বাটী নহে।

নরেন্দ্র তাহাকে উচ্চতম স্বরে কহিল, "তুই কী করিতে আইলি।"

ভবি মাঝে পড়িয়া করুণাকে ছাড়াইয়া লইল ও কহিল, "আমার প্রাণ থাকিতে কেমন তুমি করুণাকে অন্যপের বাটী হইতে বাহির করিতে পারো দেখি!"

নরেন্দ্র ভবিকে যতদূর প্রহার করিবার করিল ও অবশেষে শাসাইয়া গেল যে, "পুলিসে খবর পাঠাইয়া দিই গে।"

ভবি কহিল, "ইহা তো আর মগের মুলুক নহে।"

নরেন্দ্র চলিয়া গেলে পর করুণা ভবির গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "ভবি, আমাকে রাস্তা দেখাইয়া দে, আমি চলিয়া যাই।"

ভবি করুণাকে বুকে টানিয়া লইয়া কহিল, "সেকি মা, কোথায় যাইবে। আমি যতদিন বাঁচিয়া আছি ততদিন আর তোমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতে হইবে না।"

বলিতে বলিতে ভবি কাঁদিয়া ফেলিল। করুণা আর একটি কথা বলিতে পারিল না, তাহার বিছানার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, বাহুতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। সমস্ত দিন করুণা কিছু খাইল না, ভবি আসিয়া কত সাধ্যসাধনা করিল, কিন্তু কোনোমতে তাহাকে খাওয়াইতে পারিল না।

সমস্ত দিন তো কোনো প্রকারে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা হইল, পল্লীর কুটীরে কুটীরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালা হইয়াছে, পূজার বাড়িতে শংখ ঘণ্টা বাজিতেছে। সমস্ত দিন করুণা তাহার সেই শয্যাতেই পড়িয়া আছে, রাত্রি হইলে পর সে ধীরে ধীরে উঠিয়া অন্তঃপুরের সেই বাগানটিতে চলিয়া গেল। সেখানে কতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া রহিল, রাত্রি আরও গভীরতর হইয়া আসিয়াছে। পৃথিবীকে ঘুম পাড়াইয়া নিশীথের বায়ু অতি ধীর পদক্ষেপে চলিয়া যাইতেছে: এমন শান্ত ঘুমন্ত গ্রাম যে মনে হয় না, এ গ্রামে এমন কেহ আছে যে এমন রাত্রে মর্মভেদী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া মরণকে আহ্বান করিতেছে!

করুণার বিজন ভাবনায় সহসা ব্যাঘাত পড়িল। করুণা সহসা দেখিল নরেন্দ্র আসিতেছে। বেচারি ভয়ে থতমত খাইয়া উঠিয়া বসিল। নরেন্দ্র আসিয়া অতি কর্কশ স্বরে কহিল, "আমি উহাঁকে প্রতি ঘরে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, উনি কিনা বাগানে আসিয়া বসিয়া আছেন! আজ রাত্রে যে বড়ো বাগানে আসিয়া বসা হইয়াছে? স্বরূপ তো এখানে নাই।"

করুণা মনে করিল এইবার উত্তর দিবে, নিরপরাধিনীর উপর কেন নরেন্দ্রের এইরূপ সংশয় হইল—জিজ্ঞাসা করিবে—কিন্তু কী কথা বলিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। নরেন্দ্রের ভাব দেখিয়া সে ভয়ে আকুল হইয়া একটি কথাও বলিতে পারিল না।

নরেন্দ্র কহিল, "আয়, বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকিতে পাইবি না।"

করুণা একটি কথাও কহিল না, কিসের অলক্ষিত আকর্ষণে যেন সে অগ্রসর হইতে লাগিল। একবার সে মনে করিল বলিবে 'ভবির সহিত দেখা করিয়া যাই', কিন্তু একটি কথাও বলিতে পারিল না। গৃহের দ্বার পর্যন্ত গিয়া পোঁছিল, ব্যাকুল হৃদয়ে দেখিল সম্মুখে দিগন্তপ্রসারিত মাঠে জনপ্রাণী নাই। মনে করিল—সে নরেন্দ্রের পায়ে ধরিয়া বলিবে তাহার বড়ো ভয় হইতেছে, সে যাইতে পারিবে না, সে পথ ঘাট কিছুই চিনে না। কিন্তু মুখে কথা সরিল না। ধীরে ধীরে দ্বারের বাহিরে গেল। নরেন্দ্র কহিল, "কালি সকালে তোকে যদি গ্রামের মধ্যে দেখিতে পাই তবে পুলিসের লোক ডাকাইয়া বাহির করিয়া দিব।"

দ্বার রুদ্ধ হইল, ভিতর হইতে নরেন্দ্র তালা বন্ধ করিল। করুণার মাথা ঘুরিতে লাগিল, করুণা আর দাঁড়াইতে পারিল না, অবসন্ন হইয়া প্রাচীরের উপর পড়িয়া গেল।

কত ক্ষণের পর উঠিল। মনে করিল, ভবির সহিত একবার দেখা হইল না? কতক্ষণ পর্যন্ত শূন্য নয়নে বাড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। প্রাচীরের বাহির হইয়া দেখিল—তাহার সেই বাগানের গাছপালা নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। দেখিল—দ্বিতীয় তলের যে গৃহে তাহার পিতা থাকিতেন, যে গৃহে সে তাহার পিতার সহিত কত-দিন খেলা করিয়াছে, সে গৃহের দ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, ভিতরে একটি ভগ্ন খাট পড়িয়া আছে, তাহার সম্মুখে নিস্তেজ একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। কত ক্ষণের পর নিশ্বাস ফেলিয়া করুণা ফিরিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের পথে চলিতে আরম্ভ করিল। কতক দূর গিয়া আর একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল সেই বিজন কক্ষে একটিমাত্র মুমূর্ষু প্রদীপ জ্বলিতেছে। ছেলেবেলা যাহারা করুণাকে সুখে খেলা করিতে দেখিয়াছে তাহারা সকলেই আপন কুটীরে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। তাহাদের সেই কুটীরের সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে করুণা চলিয়া গেল। আর একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল তাহার পিতার কক্ষে এখনও সেই প্রদীপটি জ্বলিতেছে।

সেই গভীর নীরব নিশীথে অসংখ্য তারকা নিমেষহীন স্থির নেত্রে নিম্নে চাহিয়া দেখিল—দিগন্তপ্রসারিত জনশূন্য অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়া একটি রমণী একাকিনী চলিয়া যাইতেছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পণ্ডিতমহাশয় সকালে উঠিয়া দেখিলেন কাত্যায়নী ঠাকুরানী গৃহে নাই। ভাবিলেন গৃহিণী বুঝি পাড়ার কোনো মেয়েমহলে গল্প ফাঁদিতে গিয়াছেন। অনেক বেলা হইল, তথাপি তাঁহার দেখা নাই। তা, মাঝে মাঝে প্রায়ই তিনি এরূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু পণ্ডিতমহাশয় আর বেশিক্ষণ স্থির থাকিতে পারিলেন না, যেখানে

যেখানে ঠাকুরানীর যাইবার সম্ভাবনা ছিল খোঁজ লইতে গেলেন। মেয়েরা চোখ-টেপাটিপি করিয়া হাসিতে লাগিল; কহিল, 'মিনসা এক দণ্ড আর কাত্যায়নী-পিসিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না! কোথায় গিয়াছে বুঝি, তাই খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। কিন্তু পুরুষ মানুষের অতটা ভালো দেখায় না।' তাহার মানে, তাঁহাদের স্বামীরা অতটা করেন না, কিন্তু যদি করিতেন তবে বড়ো সুখের হইত।

যেখানে কাত্যায়নীর যাইবার সম্ভাবনা ছিল সেখানে তো পণ্ডিতমহাশয় খুঁজিয়া পাইলেন না, যেখানে সম্ভাবনা ছিল না সেখানেও খুঁজিতে গেলেন— সেখানেও পাইলেন না। এই তো পণ্ডিতমহাশয় ব্যাকুল হইয়া মুহুর্মুহু নস্য লইতে লাগিলেন। ঊর্ধ্বশ্বাসে নিধিদের বাড়ি গিয়া পড়িলেন।

নিধি জিজ্ঞাসা করিল, ঘোষেদের বাড়ি দেখিয়াছেন? মিত্রদের বাড়ি দেখিয়াছেন? দত্তদের বাড়ি খোঁজ লইয়াছেন? এইরূপে মুখুজ্জে চাটুজ্জে বাঁড়ুজ্জে ইত্যাদি যত বাড়ি জানিত প্রায় সকলগুলিরই উল্লেখ করিল, কিন্তু সকল-তাতেই অমঙ্গল উত্তর পাইয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য ভাবিতে লাগিল। অবশেষে নিধি নিজে নরেন্দ্রের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল। শূন্য গৃহ যেন হাঁ-হাঁ করিতেছে। বিষণ্ণ বাড়ির চারি দিক যেন কেমন অন্ধকার হইয়া আছে. একটা কথা কহিলে দশটা প্রতিধ্বনি যেন ধমক দিয়া উঠিতেছে। একটা চাকর রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে সোপানের উপর পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছিল, নিধি তাহাকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গদাধরবাবু কোথায়।"

সে কহিল, "কাল রাত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন. আজও আসেন নাই— বোধ-হয় কলিকাতায় গিয়া থাকিবেন।"

নিধি ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতমহাশয়কে কহিল. "যদি খুঁজিতে হয় তো কলকাতায় গিয়া খোঁজো গে।"

পণ্ডিতমহাশয় তো এ কথার ভাবই বুঝিতে পারিলেন না। নিধি কহিল, "গদাধর নামে একটি বাবু আসিয়াছেন, দেখিয়াছ?"

পণ্ডিতমহাশয় শূন্যগর্ভ একটি হাঁ দিয়া গেলেন। নিধি কহিল. "সেই ভদ্র-লোকটির সঙ্গে কাত্যায়নীপিসি কলিকাতা ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন।"

পণ্ডিতমহাশয়ের মুখ শুকাইয়া গেল, কিন্তু তিনি এ কথা কোনোক্রমেই বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। তিনি কহিলেন, তিনি নন্দীদের বাড়ি ভালো করিয়া দেখেন নাই, সেখানেই নিশ্চয় আছেন। এই বলিয়া নন্দী আদি করিয়া আর-একবার সমস্ত বাড়ি অন্বেষণ করিয়া আসিলেন, কোথাও সন্ধান পাইলেন না। ম্লানবদনে বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন।

নিধি কহিল, "আমি তো পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে, এরূপ ঘটিবে।"

কিন্তু তিনি পূর্বে কোনোদিন এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলেন নাই।

সিন্দুক খুলিতে গিয়া পণ্ডিতমহাশয় দেখিলেন, কাত্যায়নী ঠাকুরানী শুদ্ধ যে নিজে গিয়াছেন এমন নহে. যত-কিছু গহনাপত্র টাকাকড়ি ছিল তাহার সমস্ত লইয়া গিয়াছেন। দ্বার রুদ্ধ করিয়া পণ্ডিতমহাশয় সমস্ত দিন কাঁদিলেন।

নিধি কহিল, "এ সমস্তই নরেন্দ্রের ষড়যন্ত্রে ঘটিয়াছে, তাহার নামে নালিশ করা হউক, আমি সাক্ষী তৈয়ার করিয়া দিব।"

নিধি এরূপ একটা কাজ হাতে পাইলেই বাঁচিয়া যায়। পণ্ডিতমহাশয় কহিলেন,

যাহা তাঁহার ভাগ্যে ছিল হইয়াছে, তাই বলিয়া তিনি নরেন্দ্রের নামে নালিশ করিতে পারেন না।

নিধিকে লইয়া পণ্ডিতমহাশয় কলিকাতায় আসিলেন। একদিন দুই প্রহরের রৌদ্রে পণ্ডিতমহাশয়ের শ্রান্ত স্থূল দেহ কালীঘাটের ভিড়ের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে, এমন সময়ে সম্মুখে একটি সেকেন্ড্ ক্লাসের গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিতমহাশয়ের মন্দির দেখা হইয়াছে, কালীঘাট হইতে চলিয়া যাইবেন তাহার চেষ্টা করিতেছেন। গাড়ি দেখিয়া তাহা অধিকার করিবার আশয়ে কোনো প্রকারে ভিড় ঠেলিয়া-ঠুলিয়া সেই দিকে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন গাড়ি হইতে প্রথমে একটি বাবু ও তাঁহার পরে একটি রমণী হাসিতে হাসিতে, পান চিবাইতে চিবাইতে, গাড়ি হইতে নামিলেন ও হেলিতে-দুলিতে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। পণ্ডিতমহাশয় সে রমণীকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। সে রমণীটি তাঁহারই কাত্যায়নী ঠাকুরানী!

তাড়াতাড়ি ছুটিয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—কাত্যায়নী তাঁহার উচ্চতম স্বরে কহিলেন, "কে রে মিন্‌সে। গায়ের উপর আসিয়া পড়িস যে! মরণ আর-কি!"

এইরূপ অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা গালাগালি বর্ষণ করিয়া অবশেষে পণ্ডিতমহাশয় তাঁহার 'চোখের মাতা' খাইয়াছেন কি না ও বুড়া বয়সে এরূপ অসদাচরণ করিতে লজ্জা করেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিতমহাশয় দুইটি প্রশ্নের কোনোটির উত্তর না দিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, মনে হইল যেন এখনি মূর্ছিত হইয়া পড়িবেন। কাত্যায়নীর সঙ্গে যে বাবু ছিলেন তিনি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার স্টীকের বাড়ি পণ্ডিতমহাশয়কে দুই একটা গোঁজামারিয়া ও বিজাতীয় ভাষায় যথেষ্ট মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া, ইংরাজি অর্ধস্ফুট স্বরে 'পাহারা-ওয়ালা পাহারাওয়ালা' করিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

পাহারাওয়ালা আসিল ও পণ্ডিতমহাশয়কে ঘিরিয়া দশ সহস্র লোক জমা হইল। বাবু কহিলেন, এই লোকটি তাঁহার পকেট হইতে টাকা তুলিয়া লইয়াছে।

পণ্ডিতমহাশয় ভয়ে আকুল হইলেন ও কাঁদো-কাঁদো স্বরে কহিলেন, "না বাবা, আমি লই নাই। তবে তোমার ভ্রম হইয়া থাকিবে, আর কেহ লইয়া থাকিবে।"

'চোর চোর' বলিয়া একটা ভারি কলরব উঠিল, চারি দিকে কতকগুলা ছোঁড়া জমিল, কেহ তাঁহার টিকি ধরিয়া টানিতে লাগিল, কেহ তাঁহাকে চিমটি কাটিতে লাগিল—পণ্ডিতমহাশয় থতমত খাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার ট্যাঁকে যত টাকা ছিল সমস্ত লইয়া বাবুটিকে কহিলেন, "বাবা, তোমার টাকা হারাইয়া থাকে যদি, তবে এই লও। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তোমার পায়ে পড়িতেছি—আমাকে রক্ষা করো।"

ইহাতে তাঁহার দোষ অধিকতর সপ্রমাণ হইল, পাহারাওয়ালা তাঁহার হাত ধরিল। এমন সময়ে নিধি চোখ মুখ রাঙাইয়া ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। নিধির এক-সুট চাপকান পেন্টুলুন ছিল, কলিকাতায় সে চাপকান-পেন্টুলুন ব্যতীত ঘর হইতে বাহির হইত না। চাপকান-পেন্টুলুন-পরা নিধি আসিয়া যখন গম্ভীর স্বরে কহিল 'কোন্ হ্যায় রে!' তখন অমনি চারি দিক স্তব্ধ হইয়া গেল। নিধি পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ ও পেন্‌সিল বাহির করিয়া পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা

করিল তাহার নম্বর কত ও সে কোন্ থানায় থাকে, এবং উত্তর না পাইতে পাইতে সম্মুখস্থ ছ্যাকরা গাড়ির কোচম্যানকে জিজ্ঞাসা করিল, "লালদিঘির এণ্ড্রুসাহেবের বাড়ি জানো?"

পাহারাওয়ালা ভাবিল না জানি এণ্ড্রুসাহেব কে হইবে ও দাড়ি চুলকাইতে চুলকাইতে 'বাবু বাবু' করিতে লাগিল। নিধি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সেই বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনার বাড়ি কোথায়। নাম কী।"

বাবুটি গোলমালে সট্ করিয়া সরিয়া পড়িলেন এবং সে পাহারাওয়ালাটিও অধিক উচ্চবাচ্য না করিয়া ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া পড়িল।

ভিড় চুকিয়া গেল, নিধি ধরাধরি করিয়া পণ্ডিতমহাশয়কে একটি গাড়িতে লইয়া গিয়া তুলিল এবং সেই রাত্রেই দেশে যাত্রা করিল। বেচারি পণ্ডিতমহাশয় লজ্জায় দুঃখে কষ্টে বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন।

নিধি কহিল, কাত্যায়নীর নামে গহনা ও টাকা-চুরির নালিশ করা যাক। পণ্ডিত-মহাশয় কোনোমতে সম্মত হইলেন না।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতমহাশয় করুণার সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিলেন। তিনি কহিলেন, "এ গ্রামে থাকিয়া আর কী করিব। শূন্য গৃহ ত্যাগ করে কাশী চলিলাম। বিশ্বেশ্বরের চরণে এ প্রাণ বিসর্জন করিব।"

এই বলিয়া পণ্ডিতমহাশয় ঘর দুয়ার সমস্ত বিক্রয় করিয়া কাশী চলিলেন। পাড়ার সমস্ত বালকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, অশ্রুপূর্ণনয়নে তিনি সকলকে আদর করিলেন। এমন একটি বালক ছিল না যে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলে নাই।

এইরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে পণ্ডিতমহাশয় গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অনেক লোক দেখিয়াছি কিন্তু তেমন ভালোমানুষ আর দেখিলাম না।

নরেন্দ্রের বাড়িঘর সমস্ত নিলামে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। নরেন্দ্র গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। কোথায় আছে কে জানে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র চলিয়া গেলে রজনী মনে করিল, 'আমিই বুঝি মহেন্দ্রের চলিয়া যাইবার কারণ!'

মহেন্দ্রের মাতা মনে করিলেন যে, রজনী বুঝি মহেন্দ্রের উপর কোনো কর্কশ ব্যবহার করিয়াছে; আসিয়া কহিলেন, "পোড়ারমুখী ভালো এক ডাকিনীকে ঘরে আনিয়াছিলাম!"

রজনীর শ্বশুর আসিয়া কহিলেন, "রাক্ষসী, তুই এ সংসার ছারখার করিয়া দিলি!"

রজনীর ননদ আসিয়া কহিলেন, "হতভাগিনীর সহিত দাদার কী কুক্ষণেই বিবাহ হইয়াছিল!"

রজনী একটি কথাও বলিল না। রজনীর নিজেরই যে আপনার প্রতি দারুণ ঘৃণা জন্মিয়াছিল, সেই ঘৃণার যন্ত্রণায় সে মনে করিল—বুঝি ইহার একটি কথাও

অন্যায় নহে। সে মনে করিল, যে তিরস্কার তাহাকে করা হইতেছে সে তিরস্কার বুঝি তাহার যথার্থই পাওয়া উচিত। রজনী কাহাকেও কিছু বলিল না, একবার কাঁদিলও না। এ কয়দিন তাহার মুখশ্রী অতিশয় গম্ভীর—অতিশয় শান্ত—যেন মনে-মনে কী একটি সংকল্প করিয়াছে, মনে-মনে কী একটি প্রতিজ্ঞা বাঁধিয়াছে।

এই দুই মাস হইল মহেন্দ্র বিদেশে গিয়াছে—এই দুই মাস ধরিয়া রজনী যেন কী একটা ভাবিতেছিল, এত দিনে সে ভাবনা যেন শেষ হইল, তাই রজনীর মুখ অতি গম্ভীর অতি শান্ত দেখাইতেছে।

সন্ধ্যা হইলে ধীরে ধীরে সে মোহিনীর বাড়িতে গেল। মোহিনীর সহিত দেখা হইল, থতমত খাইয়া দাঁড়াইল। যেন কী কথা বলিতে গিয়াছিল, বলিতে পারিল না, বলিতে সাহস করিল না। মোহিনী অতি স্নেহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কী রজনী। কি বলিতে আসিয়াছিস।"

রজনী ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে কহিল, "দিদি, আমার একটি কথা রাখতে হবে।"

মোহিনী আগ্রহের সঙ্গে কহিল, "কী কথা বলো।"

রজনী কতবার 'না বলি' 'না বলি' করিয়া অনেক পীড়াপীড়ির পর আস্তে আস্তে কহিল মোহিনীকে একটি চিঠি লিখিতে হইবে। কাহাকে লিখিতে হইবে। মহেন্দ্রকে। কী লিখিতে হইবে। না, তিনি বাড়িতে ফিরিয়া আসুন, তাঁহাকে আর অধিক দিন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হবে না। রজনী তাহার দিদির বাড়িতে থাকিবে। বলিতে বলিতে রজনী কাঁদিয়া ফেলিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্ন। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। রাশি রাশি ধূলি উড়াইয়া গ্রামের পথ দিয়া মাঝে মাঝে দুই-একটা গোরুর গাড়ি মন্থর গমনে যাইতেছে। দুই-একজন মাত্র পথিক নিভৃত পথে হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছে। স্তব্ধ মধ্যাহ্নে কেবল একটি গ্রাম্য বাঁশির স্বর শুনা যাইতেছে, বোধ হয় কোনো রাখাল মাঠে গোরু ছাড়িয়া দিয়া গাছের ছায়ায় বসিয়া বাজাইতেছে।

করুণা সমস্ত রাত চলিয়া চলিয়া শ্রান্ত হইয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে। করুণা-যে কোনো কুটীরে আতিথ্য লইবে, কাহারও কাছে কোনো প্রার্থনা করিবে, সে স্বভাবেরই নয়। কী করিলে কি হইবে, কী বলিতে হয়, কী কহিতে হয়, তাহার কিছু যদি ভাবিয়া পায়। লোক দেখিলে সে ভয়ে আকুল হইয়া পড়ে। এক-একজন করিয়া পথিক চলিয়া যাইতেছে, করুণার ভয় হইতেছে—'এইবার এই বুঝি আমার কাছে আসিবে, ইহার বুঝি কোনো দুরভিসন্ধি আছে!' বেলা প্রায় তিন প্রহর হইবে, এখনও পর্যন্ত করুণা কিছু আহার করে নাই। পথশ্রমে, ধুলায়, অনিদ্রায়, অনাহারে, ভাবনায় করুণা এক দিনের মধ্যে এমন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, এমন বিষম বিবর্ণ মলিন শীর্ণ হইয়া গিয়াছে যে দেখিলে সহসা চিনা যায় না।

ঐ একজন পথিক আসিতেছে। দেখিয়া ভালো মনে হইল না। করুণার দিকে তার ভারি নজর—বিদ্যাসুন্দরের মালিনী-মাসীর সম্পর্কের একটা গান ধরিল—কিন্তু এই জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিপ্রহর রসিকতা করিবার ভালো অবসর নয় বুঝিয়া সে

তো গান গাইতে গাইতে পিছন ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল। আর-একজন, আর-একজন, আর-একজন—এইরূপ এক এক করিয়া কত পথিক চলিয়া গেল। এ পর্যন্ত করুণা ভদ্র পথিক একজনও দেখিতে পায় নাই। কিন্তু কী সর্বনাশ। ওই একজন প্যান্টলুন-চাপকান-ধারী আসিতেছে। অনেক সময়ে ভদ্রলোকদের (ভদ্র কথা সাধারণ অর্থে যেরূপে ব্যবহৃত হয়) যত ভয় হয় এত আর কাহাদেরও নয়। ঐ দেখো, করুণা যে গাছের তলায় বসিয়াছিল সেই দিকেই আসিতেছে। করুণা তো ভয়ে আকুল, মাটির দিকে চাহিয়া থরথর কাঁপিতে লাগিল। পথিকটি তো, বলা নয় কহা নয়, অতি শান্ত ভাবে আসিয়া, সেই গাছের তলাটিতে আসিয়া বসিল কেন। বসিতে কি আর জায়গা ছিল না। পথের ধারে কি আর গাছ ছিল না।

পথিকটি স্বরূপবাবু। স্বরূপবাবুর স্ত্রীলোকদিগের প্রতি যে একটা স্বাভাবিক টান ছিল তাহারই আকর্ষণ এড়াইতে না পারিয়া গাছের তলায় আসিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না যে করুণাকে সেখানে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু যখন করুণাকে দেখিলেন, চিনিলেন। তখন তাঁহার বিস্ময়ের ও আনন্দের অবধি রহিল না। করুণা দেখে নাই পথিকটি কে। সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে সেখান হইতে উঠিয়া যাইবে-যাইবে মনে করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। কিছুক্ষণ তো বিস্ময় ও আনন্দের তোড় সামলাইতে গেল, তার পর স্বরূপ অতি মধুর গদগদ স্বরে কহিলেন, "করুণা!"

করুণা এই সম্বোধন শুনিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিল, পথিকের দিকে চাহিল, দেখিল স্বরূপবাবু! তাহার চেয়ে একটা সাপ যদি দেখিত করুণা কম ভয় পাইত।

করুণা কিছুই উত্তর দিল না। স্বরূপ অনেক কথা বলিতে লাগিল, এ কয় রাত্রি সে করুণার জন্যে কত কষ্ট পাইয়াছিল তাহার সমস্ত বর্ণনা করিল। সেই সুখরাত্রে তাহাদের প্রেমালাপের যখন সবে সূত্রপাত হইয়াছিল, এমন সময়ে ভঙ্গ হওয়াতে অনেক দুঃখ করিল। সে অতি হতভাগ্য, বিধাতা তাহাকে চিরজীবন দুঃখী করিবার জন্যই বুঝি সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহার কোনো আশাই সফল হয় না। অবশেষে, করুণা নরেন্দ্রের বাড়ি হইতে যে বাহির হইয়া আসিয়াছে, ইহা লইয়া অনেক আনন্দ প্রকাশ করিল। কহিল—আরও ভালোই হইয়াছে, তাহাদের দুইজনের যে প্রেম, যে স্বর্গীয় প্রেম, তাহা নিষ্কণ্টকে ভোগ করিতে পারিবে। আরও এমন অনেক কথা বলিল, তাহা যদি লিখিয়া লওয়া যাইত তাহা হইলে অনেক বড়ো বড়ো নভেলের রাজপুত ক্ষত্রিয় বা অন্যান্য মহা মহা নায়কের মুখে স্বচ্ছন্দে বসানো যাইত। কিন্তু করুণা তাহার রসাস্বাদন করিতে পারে নাই।

স্বরূপ এলাহাবাদে যাইবে, তাই স্টেশনে যাইতেছিল। পথের মধ্যে এই সকল ঘটনা। স্বরূপ প্রস্তাব করিল করুণা তাহার সঙ্গে পশ্চিমে চলুক, তাহা হইলে আর কোনো ভাবনা ভাবিতে হবে না।

করুণা কাল রাত্রি হইতে ভাবিতেছিল কোথায় যাইবে, কী করিবে। কিছুই ভাবিয়া পায় নাই। আজিকার দিন তো প্রায় যায়-যায়—রাত্রি আসিবে, তখন কী করিবে, কত প্রকার লোক পথ দিয়া যাওয়া-আসা করিতেছে, এই-সকল নানান ভাবনার সময় এ প্রস্তাবটা করুণার মন্দ লাগিল না। ছেলেবেলা হইতে যে চিরকাল গৃহের বাহিরে কখনও যায় নাই, সে এই অনাবৃত পৃথিবীর দৃষ্টি কী করিয়া সহিবে

বলো। সে একটা আশ্রয় পাইলে, লোকের চোখের আড়াল হইতে পারিলে বাঁচে। তার মনে হইতেছে, যেন সকলেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাহা ছাড়া করুণা এমন শ্রান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে যে আর সে সহিতে পারে না। একবার মনে করিল স্বরূপের প্রস্তাবে সায় দিয়া যাইবে। কিন্তু স্বরূপের উপর তাহার এমন একটা ভয় আছে যে পা আর উঠিতে চায় না। করুণা ভাবিল, 'এই গাছের তলায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকি, না খাইয়া না দাইয়া মরিয়া যাইব।' কিন্তু রক্ত মাংসের শরীরে কত সহিবে বলো—এ ভাবনা আর বেশিক্ষণ স্থান পাইল না। স্বরূপের প্রস্তাবে সম্মত হইল। সন্ধ্যা হইল।

করুণা ও স্বরূপ এখন ট্রেনের মধ্যে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

স্বরূপ ও করুণা কাশীতে আছে। করুণার দুরবস্থা বলিবার নহে। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিয়া সে যে কী অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে তাহা সেই জানে। স্বরূপের ভ্রম অনেক দিন হইল ভাঙিয়াছে, এখন বুঝিয়াছে করুণা তাহাকে ভালোবাসে না। সে ভাবিতেছে, 'একি উৎপাত! এত করিয়া আনিলাম, গাড়িভাড়া দিলাম—সকলই ব্যর্থ হইল!' সে যে বিরক্ত হইয়াছে তাহা আর বলিবার নহে। সে মনে করিয়াছিল এতদিন কবিতায় যাহা লিখিয়া আসিয়াছে, কল্পনায় চিত্র করিয়াছে, আজ সেই প্রেমের সুখ উপভোগ করিবে। কিন্তু সে কাছে আসিলে করুণা ভয়ে জড়োসড়ো আড়ষ্ট হইয়া মরিয়া যায়, তাহার সঙ্গে কথাই কহে না। স্বরূপ ভাবিল, 'একি উৎপাত! এ গলগ্রহ বিদায় করিতে পারিলে যে বাঁচি।' ভাবিল দিন-কতক কাছে থাকিতে থাকিতেই ভালোবাসা হইবে। স্বরূপ তো তাহার যথাসাধ্য করিল, কিন্তু করুণার ভালোবাসার কোনো চিহ্ন দেখিল না।

করুণা বেচারির তো আরাম বিশ্রাম নাই। এক তো সর্বক্ষণ পরের বাড়িতে অচেনা পুরুষের সঙ্গে আছে বলিয়া সর্বদাই আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতেছে। তাহা ছাড়া স্বরূপের ভাব-গতিক দেখিয়া সে তো ভয়ে আকুল—সে কাছে বসিয়া গান গায়, কবিতা শুনাইতে থাকে, মনের দুঃখ নিবেদন করে, অবশেষে মহা রুক্ষভাবে গাড়িভাড়ার টাকার জন্য নালিশ করিবে বলিয়া শাসাইতে আরম্ভ করিয়াছে। করুণা যে কী করিবে কিছুই ভাবিয়া পায় না, ভয়ে বেচারি সারা হইতেছে। স্বরূপ রাত দিন খিট্ খিট্ করে, এমন-কি করুণাকে মাঝে মাঝে ধম্‌কাইতে আরম্ভ করিয়াছে। করুণার কিছু বলিবার মুখ নাই, সে শুধু কাঁদিতে থাকে।

এইরূপে কত দিন যায়, স্বরূপের এলাহাবাদে যাইবার সময় হইয়াছে। সে ভাবিতেছে, 'এখন করুণাকে লইয়া কী করি। এইখানে কি ফেলিয়া যাইব। না, এত করিয়া আনিলাম, গাড়িভাড়া দিলাম, এতদিন রাখিলাম, অবশেষে কি ফেলিয়া যাইব। আরও দিন-কতক দেখা যাক।'

অনেক ভাবিয়া-সাবিয়া করুণাকে তো ডাকিল। করুণা ভাবিল, 'যাইব কি না। কিন্তু না যাইয়াই বা কী করি। এখানে কোথায় থাকিব। এত দূর দেশে অচেনা জায়গায় কার কাছে যাইব। দেশে থাকিতাম তবু কথা থাকিত।'

করুণা চলিল। উভয়ে স্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ি ছাড়িতে এখনও দেরি আছে। জিনিসপত্র পুঁটুলি-বোঁচকা লইয়া যাত্রিগণ মহা কোলাহল করিতেছে। কানে-কলম-গোঁজা রেলওয়ে ক্লার্ক্‌গণ ভারি উঁচু চালে ব্যস্তভাবে ইতস্তত: ফর্‌ ফর্‌ করিয়া বেড়াইতেছেন। পান সোডাওয়াটার নানাপ্রকার মিষ্টান্নের বোঝা লইয়া ফেরিওয়ালারা আগামী গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এইরূপ তো অবস্থা। এমন সময়ে একজন পুরুষ করুণার পাশে সেই বেঞ্চে আসিয়া বসিল।

করুণা উঠিয়া যাইবে-যাইবে করিতেছে, এমন সময়ে তাহার পার্শ্বস্থ পুরুষ বিস্ময়ের স্বরে কহিয়া উঠিল, "মা, তুমি যে এখানে!"

করুণা পণ্ডিতমহাশয়ের স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ কিছু বলিতে পারিল না। অনেকক্ষণ নির্জল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া, কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "সার্বভৌমমহাশয়, আমার ভাগ্যে কী ছিল!"

পণ্ডিতমহাশয় তো আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, "মা, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, তাহার জন্য আর ভাবিয়ো না। আমি প্রয়াগে যাইতেছি, আমার সঙ্গে আইস। পৃথিবীতে আর আমার কেহই নাই—যে কয়টা দিন বাঁচিয়া আছি ততদিন আমার কাছে থাকো, ততদিন আর তোমার কোনো ভাবনা নাই।"

করুণা অধীর উচ্ছ্বাসে কাঁদিতে লাগিল। এমন সময়ে নিধি আসিয়া উপস্থিত হইল। নিধি পণ্ডিতমহাশয়ের খরচে কাশী দর্শন করিতে আসিয়াছেন। পণ্ডিত-মহাশয় তজ্জন্য নিধির কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আছেন। তিনি বলেন, নিধির ঋণ তিনি এ জন্মে শোধ করিতে পারিবেন না। করুণাকে দেখিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিল ; কহিল, "ভট্টাচার্যমহাশয়, একটা কথা আছে।"

পণ্ডিতমহাশয় শশব্যস্তে উঠিয়া গেলেন। নিধি কহিল, "ঐ বাবুটিকে দেখিতেছেন?"

পণ্ডিতমহাশয় চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন—স্বরূপ। নিধি কহিল, "দেখিলেন! করুণার ব্যবহারটা একবার দেখিলেন! ছি-ছি, স্বর্গীয় কর্তার নামটা একেবারে ডুবাইল!"

পণ্ডিতমহাশয় অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, অবশেষে হাত উল্‌টাইয়া আস্তে আস্তে কহিলেন—

"স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা না জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

নিধি কহিল, "আহা, নরেন্দ্র এমন ভালো লোক ছিল। ওই রাক্ষসীই তো তাহাকে নষ্ট করিয়াছে।"

নরেন্দ্র যে ভালো লোক ছিল সে বিষয়ে পণ্ডিতমহাশয়ের সংশয় ছিল না, এখন যে খারাপ হইয়া গিয়াছে তাহারও প্রমাণ পাইয়াছেন, কিন্তু এতক্ষণে কেন যে খারাপ হইয়া গিয়াছে তাহার কারণটা জানিতে পারিলেন। পণ্ডিতমহাশয়ের স্ত্রীজাতির উপর দারুণ ঘৃণা জন্মাইল। পণ্ডিতমহাশয় ভাবিলেন, আর না—স্ত্রীলোকেই তাঁহার সর্বনাশ করিয়াছে, স্ত্রীজাতিকে আর বিশ্বাস করিবেন না।

নিধি লাল হইয়া কহিল, "দেখুন দেখি, মহাশয়, পাপাচরণ করিবার আর কি স্থান নাই। এই কাশীতে!"

এ কথা পণ্ডিতমহাশয় এতক্ষণ ভাবেন নাই। শুনিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে অবাক হইয়া নিধির মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন ; ভাবিলেন, 'সত্যই তো!'

একটা ঘণ্টা বাজিল, মহা ছুটাছুটি চেঁচামেচি পড়িয়া গেল। পণ্ডিতমহাশয় বেঞ্চের কাছে বোঁচকা ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি লইতে গেলেন। এমন সময় স্বরূপ তাড়াতাড়ি করুণাকে ডাকিতে আসিল— পণ্ডিতমহাশয়কে দেখিয়া সট্ করিয়া সরিয়া পড়িল। করুণা কাতরস্বরে পণ্ডিতমহাশয়কে কহিল, "সার্বভৌম-মহাশয়, আমাকে ফেলিয়া যাইবেন না।"

পণ্ডিতমহাশয় কহিলেন, "মা, অনেক প্রতারণা সহিয়াছি— মনে করিয়াছি বৃদ্ধবয়সে আর কোনো দিকে মন দিব না— দেবসেবায় কয়েকটি দিন কাটাইয়া দিব।"

করুণা কাঁদিতে কাঁদিতে পণ্ডিতমহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিল; কহিল, "আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না— আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না।"

পণ্ডিতমহাশয়ের নেত্রে অশ্রু পুরিয়া আসিল ; ভাবিলেন, 'যাহা অদৃষ্টে আছে হইবে— ইহাকে তো ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।'

নিধি ছুটিয়া আসিয়া মহা একটা ধমক দিয়া কহিল, "এখানে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে কী হইবে। গাড়ি যে চলিয়া যায়!"

এই বলিয়া পণ্ডিতমহাশয়ের হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিয়া একটা গাড়ির মধ্যে পুরিয়া দিল।

করুণা অন্ধকার দেখিতে লাগিল। মাথা ঘুরিয়া মুখচক্ষু বিবর্ণ হইয়া সেইখানে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। স্বরূপের দেখাসাক্ষাৎ নাই, সে গোলেমালে অনেক ক্ষণ হইল গাড়িতে উঠিয়া পড়িয়াছে। অগ্নিময় অঙ্কুশের তাপে আর্তনাদ করিয়া লৌহময় গজ হন্ হন্ করিয়া অগ্রসর হইল। স্টেশনে আর বড়ো লোক নাই।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

এই সময়ে মহেন্দ্রের নিকট হইতে যে-সকল পত্র পাইয়াছিলাম, তাহার একখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

ভাই! যে কষ্টে, যে লজ্জায়, যে আত্মগ্লানির যন্ত্রণায় পাগল হইয়া দেশ পরিত্যাগ করিলাম তাহা তোমার কাছে গোপন করি নাই। সেই আঁধার রাত্রে বিজন পথ দিয়া যখন যাইতেছিলাম— কোনো কারণ নাই, কোনো উদ্দেশ্য নাই, কোনো গম্য স্থান নাই— তখন কেন যাইতেছি, কোথায় যাইতেছি কিছুই ভাবি নাই। মনে করিয়াছিলাম এ পথের যেন অন্ত নাই, এমনি করিয়াই যেন আমাকে চিরজীবন চলিতে হইবে— চলিয়া, চলিয়া, চলিয়া তবু পথ ফুরাইবে না— রাত্রি পোহাইবে না। মনের ভিতর কেমন এক প্রকার ঔদাস্যের অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু রাত্রের অন্ধকার যত হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল, দিনের কোলাহল যতই জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই আমার মনের আবেগ কমিয়া আসিল। তখন ভালো করিয়া সমস্ত ভাবিবার সময় আসিল। কিন্তু তখনও দেশে ফিরিবার

জন্য এক তিলও ইচ্ছা হয় নি। কত দেশ দেখিলাম, কত স্থানে ভ্রমণ করিলাম, কত দিন কত মাস চলিয়া গেল, কিন্তু কী দেখিলাম কী করিলাম কিছু যদি মনে আছে! চোকের উপর কত পর্বত নদী অরণ্য মন্দির অট্টালিকা গ্রাম উঠিত, কিন্তু সে সকল যেন কী। কিছুই নয়। যেন স্বপ্নের মতো, যেন মায়ার মতো, যেন মেঘের পর্বত-অরণ্যের মতো। চোখের উপর পড়িত তাই দেখিতাম, আর কিছুই নহে। এইরূপ করিয়া যে কত দিন গেল তাহা বলিতে পারি না— আমার মনে হইয়াছিল এক বৎসর হইবে, কিন্তু পরে গণনা করিয়া দেখিলাম চার মাস। ক্রমে ক্রমে আমার মন শান্ত হইয়া আসিয়াছে। এখন ভবিষ্যৎ ও অতীত ভাবিবার অবসর পাইলাম। আমি এখন লাহোরে আসিয়াছি। এখানকার একজন বাঙালিবাবুর বাড়িতে আশ্রয় লইলাম, ও অল্প অল্প করিয়া ডাক্তারি করিতে আরম্ভ করিলাম। এখন আমার মন্দ আয় হইতেছে না। কিন্তু আয়ের জন্য ভাবি না ভাই, আমার হৃদয়ে যে নূতন মনস্তাপ উত্থিত হইয়াছে তাহাতে যে আমাকে কী অস্থির করিয়া তুলিয়াছে বলিতে পারি না। আমার নিজের উপর যে কী ঘৃণা হইয়াছে তাহা কী করিয়া প্রকাশ করিব। যখন দেশে ছিলাম তখন রজনীর জন্যে এক দিনও ভাবি নাই, যখন দেশ ছাড়িয়া আসিলাম তখনও এক মুহূর্তের জন্য রজনীর ভাবনা মনে উদিত হয় নাই, কিন্তু দেশ হইতে যত দূরে গিয়াছি— যত দিন চলিয়া গিয়াছে— হতভাগিনী রজনীর কথা ততই মনে পড়িয়াছে— আপনাকে ততই মনে পড়িয়াছে— আপনাকে ততই নিষ্ঠুর পিশাচ বলিয়া মনে হইয়াছে। আমার ইচ্ছা করে এখনই দেশে ফিরিয়া যাই, তাহাকে যত্ন করি, তাহাকে ভালোবাসি, তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। সে হয়তো এতদিনে আমার কলঙ্কের কথা শুনিয়াছে। আমি তাহার কাছে কী বলিয়া দাঁড়াইব। না ভাই, আমি তাহা পারিব না।...

মহেন্দ্র

আমি দেখিতেছি, যে-সকল বাহ্য কারণে মহেন্দ্রের রজনীর উপর বিরাগ ছিল, সে-সকল কারণ হইতে দূরে থাকিয়া মহেন্দ্র একটু ভাবিবার অবসর পাইয়াছে। যতই তাহার আপনার নিষ্ঠুরাচরণ মনে উদিত হইয়াছে ততই রজনীর উপর মমতা তাহার দৃঢ়মূল হইয়াছে। মহেন্দ্র এখন ভাবিয়াই পাইতেছে না তাহাকে কেন ভালোবাসে নাই—এমন মৃদু, কোমল স্নিগ্ধ স্বভাব, তাহাকে ভালোবাসে না এমন পিশাচ আছে! কেন, তাহাকে দেখিতেই বা কী মন্দ! মন্দ? কেন, অমন সুন্দর স্নেহপূর্ণ চক্ষু! অমন কোমল ভাবব্যঞ্জক মুখশ্রী! ভাব লইয়া রূপ, না, বর্ণ লইয়া? রজনীর যাহা-কিছু ভালো তাহাই মহেন্দ্রের মনে পড়িতে লাগিল, আর তাহার যাহা-কিছু মন্দ তাহাও মহেন্দ্র ভালো বলিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে রজনীকে যতই ভালো বলিয়া বুঝিল, আপনাকে ততই পিশাচ বলিয়া মনে হইল।

মহেন্দ্রের সেখানে বিলক্ষণ পসার হইয়াছে। মাসে প্রায় দুই শত টাকা উপার্জন করিত। কিন্তু প্রায় সমস্তই রজনীর কাছে পাঠাইয়া দিত, নিজের জন্য এত অল্প টাকা রাখিয়া দিত যে, আমি ভাবিয়া পাই না কী করিয়া তাহার খরচ চলিত।

অনেক দিন হইয়া গেছে মহেন্দ্রের বাড়ি আসিতে বড়োই ইচ্ছা হয়, কিন্তু সকল কথা মনে উঠিলে আর ফিরিয়া আসিতে পা সরে না। মহেন্দ্র একটা চিঠি

পাইয়াছে, পাইয়া অবধি বড়োই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। ইহা সেই মোহিনীর চিঠি। চিঠির শেষ ভাগে লিখা আছে—'আপনি যদি রজনীকে নিতান্তই দেখিতে না পারেন, যদি রজনী এখানে আছে বলিয়া আপনি নিতান্তই আসিতে না চান তবে আপনার আশঙ্কা করিবার বিশেষ কোনো কারণ নাই, সে তাহার দিদির বাড়ি চলিয়া যাইবে। রজনী লিখিতে জানে না বলিয়া আমি তাহার হইয়া লিখিয়া দিলাম। সে লিখিতে জানিলেও হয়তো আপনাকে লিখিতে সাহস করিত না।'

ইহার মৃদু তিরস্কার মহেন্দ্রের মর্মের মধ্যে বিদ্ধ হইয়াছে। সে স্থির করিয়াছে, দেশে ফিরিয়া যাইবে।

রজনীর শরীর দিনে দিনে ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। মুখ বিবর্ণ ও বিষণ্ণতর হইতেছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা সে মোহিনীর গলা ধরিয়া বলিল, "দিদি, আর আমি বেশিদিন বাঁচিব না।"

মোহিনী কহিল, "সেকি রজনী, ও কথা বলিতে নাই।"

রজনী বলিল, "হাঁ দিদি, আমি জানি, আর আমি বেশি দিন বাঁচিব না। যদি এর মধ্যে তিনি না আসেন তবে তাঁকে এই টাকাগুলি দিয়ো। তিনি আমাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়া দিতেন, কিন্তু আমার খরচ করিবার দরকার হয় নাই, সমস্ত জমাইয়া রাখিয়াছি।"

মোহিনী অতিশয় স্নেহের সহিত রজনীর মুখ তাহার বুকে টানিয়া লইয়া বলিল, "চুপ কর্, ও-সব কথা বলিস নে।"

মোহিনী অনেক কষ্টে অশ্রুসম্বরণ করিয়া মনে-মনে কহিল, 'মা ভগবতি, আমি যদি এর দুঃখের কারণ হয়ে থাকি, তবে আমার তাতে কোনো দোষ নাই।'

হাত-অবসর পাইলেই রজনীর শাশুড়ি রজনীকে লইয়া পড়িতেন, নানা জন্তুর সহিত তাহার রূপের তুলনা করিতেন, আর বলিতেন যে বিবাহের সম্বন্ধ হওয়া অবধিই তিনি জানিতেন যে এইরূপ একটা দুর্ঘটনা হইবে—তবে জানিয়া শুনিয়া কেন যে বিবাহ দিলেন সে কথা উত্থাপন করিতেন না। রজনী না থাকিলে মহেন্দ্র-বিয়োগে তাঁহার মাতার অধিকতর কষ্ট হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই-যে মাঝে মাঝে মন খুলিয়া তিরস্কার করিতে পান, ইহাতে তাঁহার মন অনেকটা ভালো আছে। মহেন্দ্রের মাতার স্বভাব যত দূর জানি তাহাতে তো এক-একবার আমার মনে হয়—এই-যে তিরস্কার করিবার তিনি সুযোগ পাইয়াছেন ইহাতে বোধ হয় মহেন্দ্রের বিয়োগও তিনি ভাগ্য বলিয়া মানেন। মহেন্দ্রের অবস্থান-কালে, রজনী যেদিন কোনো দোষ না করিত সেদিন মহেন্দ্রের মাতা মহা মুশকিলে পড়িয়া যাইতেন। অবশেষে ভাবিয়া ভাবিয়া দুই বৎসরের পুরানো কথা লইয়া তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া আসিতেন। কিন্তু এই ঘটনার পর তাঁহার তিরস্কারের ভাণ্ডার সর্বদাই মজুত রহিয়াছে, অবসর পাইলেই হয়।

ইতিমধ্যে মহেন্দ্রের মা মহেন্দ্রকে এক লোভনীয় পত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার 'বাবা'কে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে কহিয়াছেন ও সংবাদ দিয়াছেন যে, তাঁহার জন্য একটি সুন্দরী কন্যা অনুসন্ধান করা যাইতেছে। এই চিঠি পাইয়া মহেন্দ্রের আপনার উপর দ্বিগুণ লজ্জা উপস্থিত হইয়াছে—তবে সকলেই মনে করিয়াছে

আমি রূপের কাঙাল! রজনী দেখিতে ভালো নয় বলিয়াই আমি তাহার উপর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি? লোকের কাছে মুখ দেখাইব কোন্ লজ্জায়।'

কিন্তু রজনীর আজকাল অল্প তিরস্কারই অত্যন্ত মনে লাগে, আগেকার অপেক্ষাও সে কেমন ভীত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার শরীর যতই খারাপ হইতেছে ততই সে ভয়ে গ্রস্ত ও তিরস্কারে অধিকতর ব্যথিত হইয়া পড়িতেছে, ক্রমাগত তিরস্কার শুনিয়া শুনিয়া আপনাকে সত্য-সত্যই দোষী বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। মোহিনী প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা তাহার কাছে আসিত—প্রত্যহ তাহাকে যথাসাধ্য যত্ন করিত ও প্রত্যহ দেখিত সে দিনে দিনে অধিকতর দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। একদিন রজনী সংবাদ পাইল মহেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার কিসের আহ্লাদ! মহেন্দ্র তো তাহাকে সেই ঘৃণাচক্ষে দেখিবে। তাহা হউক, কিন্তু তাহার জন্য মহেন্দ্র যে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে কষ্ট পাইতেছে এ আত্মগ্লানির যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইল—যে কারণেই হউক, মহেন্দ্র যে বিদেশে গিয়া কষ্ট পাইতেছে ইহা রজনীর অতিশয় কষ্টকর হইয়াছিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কাশীর স্টেশনে করুণা-সংক্রান্ত যে-সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছিল, একজন ভদ্রলোক তাহা সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। স্বরূপকে দেখিয়া তিনি কেমন লজ্জিত ও সংকুচিত হইয়া সরিয়া গিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন সকলে চলিয়া গেল এবং করুণা মূর্ছিত হইয়া পড়িল তখন তিনি তাহাকে একটা গাড়িতে তুলিয়া তাঁহার বাসাবাড়িতে লইয়া যান—তাঁহার কোথায় যাইবার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যাওয়া হইল না। করুণার মুখ দেখিয়া, এমন কে আছে যে তাহাকে দোষী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে? মহেন্দ্রও তাহাকে সন্দেহ করে নাই। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম—সেই ভদ্রলোকটি মহেন্দ্র।

লাহোর হইতে আসিবার সময় একবার কাশীতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতার ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে এই-সমস্ত ঘটনা ঘটে। করুণা চেতনা পাইলে মহেন্দ্র তাহাকে তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। মহেন্দ্রের মুখে এমন দয়ার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল যে, করুণা শীঘ্রই সাহস পাইল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে কহিল এবং ঠিক সে যেমন করিয়া ভাবিকে জিজ্ঞাসা করিত তেমন করিয়া মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, কেন নরেন্দ্র তাহার উপর অমন রাগ করিল। মহেন্দ্র বালিকার সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না—কিন্তু এই প্রশ্ন শুনিয়া তাহার চক্ষে জল আসিয়াছিল। নরেন্দ্রকে মহেন্দ্র বেশ চেনে, সে সমস্ত ঘটনা বেশ বুঝিতে পারিল। পণ্ডিতমহাশয় যে কেন তাহাকে অমন করিয়া ফেলিয়া গেলেন তাহাও করুণা ভাবিয়া পাইতেছিল না, অনেক ক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া তাহাও মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল। মহেন্দ্র তাহার যথার্থ কারণ যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহা গোপন করিয়া নানারূপে বুঝাইয়া দিলেন।

এখন করুণাকে লইয়া যে কী করিবে মহেন্দ্র তাহাই ভাবিতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইল তাহাদের বাড়িতেই লইয়া যাইবে। মহেন্দ্র করুণার নিকট তাহার বাড়ির

বর্ণনা করিল। কহিল— তাহাদের বাড়ির সামনেই একটি প্রাচীর-দেওয়া বাগান আছে, বাগানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, পুষ্করিণীর উপরে একটি বাঁধানো শানের ঘাট। কহিল— তাহাদের বাড়িতে গেলে করুণা তাহার একটি দিদি পাইবে, তেমন স্নেহশালিনী— তেমন কোমলহৃদয়া— তেমন ক্ষমাশীলা (আরও অসংখ্য বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছিল) দিদি কেহই কখনও পায় নাই। করুণা অমনি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল সেখানে কি ভাবির দেখা পাইবে! মহেন্দ্র ভাবির সন্ধান করিবে বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন করুণা তাঁহাকে ভ্রাতার মতো দেখিবে কি না, করুণার তাহাতে কোনো আপত্তি ছিল না। যাহা হউক, এত দিন পরে করুণার মুখ প্রফুল্ল দেখিলাম, এতদিন পরে সে তবু আশ্রয় পাইল। কিন্তু বারবার করুণা মহেন্দ্রকে পণ্ডিতমহাশয়ের তাহার উপর রাগ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছে।

অবশেষে তাহারা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। কাশী পরিত্যাগ করিয়া চলিল। কে কী বলিবে, কে কী করিবে, কখন কী হইবে— এই-সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে ও যদি কেহ কিছু বলে তবে তাহার কী উত্তর দিবে, যদি কেহ কিছু করে তবে তাহার কী প্রতিবিধান করিবে, যদি কখনও কিছু হয় তবে সে অবস্থায় কিরূপ ব্যবহার করিবে— এই-সমস্ত ঠিক করিতে করিতে মহেন্দ্র গ্রামের রাস্তায় গিয়া পৌঁছিল। লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া, সংকোচে অভিভূত হইয়া, পথিকদিগের চক্ষু এড়াইয়া ও কোনোমতে পথ পার হইয়া গৃহের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল।

কতবার সাত-পাঁচ করিয়া পরে প্রবেশ করিল। দাদাবাবুকে দেখিয়াই ঝি ঝাঁটা রাখিয়া ছুটিয়া বড়োমা'কে খবর দিতে গেল। বড়োমা তখন রজনীর সম্মুখে বসিয়া রজনীর রূপের ব্যাখ্যান করিতেছিলেন, এমন সময়ে খবর পাইলেন যে আর-একটি নূতন বধূ লইয়া তাঁহার 'বাবা' ঘরে আসিয়াছেন।

মহেন্দ্রের ও করুণার সহিত সকলের সাক্ষাৎ হইল, যখন সকলে মিলিয়া উলু দিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন এমন সময়ে মহেন্দ্র তাঁহাদিগকে করুণা-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিল। সে-সমস্ত বৃত্তান্ত মহেন্দ্রের মাতার বড়ো ভালো লাগে নাই। মহেন্দ্রের সম্মুখে কিছু বলিলেন না, কিন্তু সেই রাত্রে মহেন্দ্রের পিতার সহিত তাঁহার ভারি একটা পরামর্শ হইয়া গিয়াছিল ও অবশেষে রজনী পোড়ারমুখীই যে এই-সমস্ত বিপত্তির কারণ তাহা অবধারিত হইয়া গিয়াছিল। এই কথাটা লইয়া মহেন্দ্রের পিতার অতিরিক্ত আনা-দুয়েকের তামাকু ব্যয় হইয়াছিল ও দুই-চারিজন বৃদ্ধ বিজ্ঞ প্রতিবাসীদিগের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আর অধিক কিছু দুর্ঘটনা হয় নাই।

রজনী তাহার দিদির বাড়ি যাইবার সমস্তই বন্দোবস্ত করিয়াছিল, তাঁহার শ্বশুর শাশুড়িরা এই বন্দোবস্তে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু রজনী বড়ো দুর্বল বলিয়া এখনও সমাধা হইয়া উঠে নাই। এই খবরটি আসিয়াই মহেন্দ্র তাঁহার মাতার নিকট হইতে শুনিতে পাইলেন। আশ্চর্যের স্বরে কহিলেন, "দিদির বাড়ি যাইবে, তার অর্থ কী। আমি আসিলাম আর অমনি দিদির বাড়ি যাইবে!"

মহেন্দ্রের মা'ও অবাক্, মহেন্দ্রের পিতা কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন— পরে ঠুঙি হইতে চশমা বাহির করিয়া পরিলেন এবং মহেন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন—

যেন তিনি মিলাইয়া দেখিতে চান যে এ মহেন্দ্রের সহিত পূর্বকার মহেন্দ্রের কোনো আদল আছে কি না! এ মহেন্দ্র ঝুটা মহেন্দ্র কি না! মহেন্দ্র অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ রজনীর ঘরে চলিয়া গেলেন ও কর্তা গৃহিণীতে মিলিয়া ফুস্ ফুস্ করিয়া মহাপরামর্শ করিতে লাগিলেন।

রজনী মহেন্দ্রকে দেখিয়া মহা শশব্যস্ত হইয়া পড়িল, কেমন অপ্রস্তুত হইয়া গেল। সে মনে করিতে লাগিল, মহেন্দ্র তাহাকে দেখিয়া কি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে! তাহার তাড়াতাড়ি বলিবার ইচ্ছা হইল যে, 'আমি এখনই যাইতেছি, আমার সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছে।' যখন সে এই গোলমালে পড়িয়া কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না, তখন মহেন্দ্র ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিল। কী ভাগ্য! বিষণ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নাকি আজই দিদির বাড়ি যাবে। কেন রজনী।"

আর কি উত্তর দিবার জো আছে।—"আমি তোমার কাছে অনেক অপরাধ করিয়াছি, আমি তোমাকে কষ্ট দিয়াছি, কিন্তু তাহা কি ক্ষমা করিবে না।"

ওকি মহেন্দ্র! অমন করিয়া বলিয়ো না, রজনীর বুক ফাটিয়া যাইতেছে। —"বলো, তাহা কি ক্ষমা করিবে না।"

রজনীর উত্তর দিবার কি ক্ষমতা আছে। সে পূর্ণ উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল। মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "একবার বলো ক্ষমা করিলে।"

রজনী ভাবিল—সেকি কথা! মহেন্দ্র কেন ক্ষমা চাহিতেছেন। সে জানিত তাহারই সমস্ত দোষ, সেই মহেন্দ্রের নিকট অপরাধী, কেননা তাহার জন্যই মহেন্দ্র এত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, গৃহ ত্যাগ করিয়া কত বৎসর বিদেশে কাল যাপন করিয়াছেন, সে কোথায় মহেন্দ্রের নিকট ক্ষমা চাহিবে—তাহা না হইয়া একি বিপরীত! ক্ষমা চাহিবে কী, সে নিজেই ক্ষমা চাহিতে সাহস করে নাই। সে কি ক্ষমার যোগ্য। মহেন্দ্র রজনীর দুর্বল মস্তক কোলে তুলিয়া লইল। রজনী ভাবিল, 'এই সময়ে যদি মরি তবে কী সুখে মরি!' তাহার কেমন সংকোচ বোধ হইতে লাগিল, মহেন্দ্রের ক্রোড় তাহার নিকট যেন ভিখারীর নিকট সিংহাসন।

মহেন্দ্র তাহাকে কত কী কথা বলিল, সে-সকল কথার উত্তর দিতে পারিল না। সে ভাবিল 'এ মধুর স্বপ্ন চিরস্থায়ী নহে—এই মুহূর্তে মরিতে পাইলে কী সুখী হই! কিন্তু এ অবস্থা কতক্ষণ রহিবে!' রজনীর এ সংকোচ শীঘ্র দূর হইল। রজনী তাহার কোলে মাথা রাখিয়া কতক্ষণ কত কী কথা কহিল—কত অশ্রুজল, কত কথা, কত হাসি, সে বলিবার নহে।

মহেন্দ্র যখন উঠিয়া যাইতে চাহিল তখন রজনী তাহাকে আর-একটু বসিয়া থাকিতে অনুরোধ করিল, যাহা আর কখনও করিতে সাহস করে নাই। রজনীর একি পরিবর্তন! যে সুখ সে কখনও আশা করে নাই, আপনাকে যে সুখ পাইবার যোগ্য বলিয়া মনে করে নাই, সেই সুখ সহসা পাইয়াছে—আহ্লাদে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল—সে কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

সেই সন্ধ্যাবেলাই সে মোহিনীর বাড়িতে গেল, তাড়াতাড়ি তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে বসিল। মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন রজনী, কী হয়েছে।"

সে মনে করিল মহেন্দ্র না জানি আবার কী অন্যায়াচরণ করিয়াছে।

রজনী তাহাকে সকল কথা বলিতে লাগিল—শুনিয়া মোহিনীও আহ্লাদে

কাঁদিতে লাগিল। রজনীর দুই-এক মাসের মধ্যে যে কোনো ব্যাধি বা দুর্বলতা হইয়াছিল তাহার কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। আর কখনও রজনীর ঘরকন্নার কাজে এত উৎসাহ কেহ দেখে নাই—শাশুড়ি মহা উগ্রভাবে কহিলেন, "হয়েছে, হয়েছে, ঢের হয়েছে, আর গিন্নিপনা করে কাজ নেই, দু দিন উপোস করে আছেন, সবে আজ ভাত খেয়েছেন, ওঁর গিন্নিপনা দেখে আর বাঁচি নে।"

এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক—রজনী যে দুদিন উপোস করিয়াছিল সে দুদিন কাজ করিতে পারে নি বলিয়া তাহার শাশুড়ি মহা বক্তৃতা দিয়াছিলেন ও ভবিষ্যতে যখনই রজনীর দোষের অভাব পড়িবে সেই দুই দিনের কথা লইয়া আবার বক্তৃতা যে দিবেন ইহাও নিশ্চিত, এ বিষয়ে কোনো পাঠকের সন্দেহ উপস্থিত না হয়।

দেখিতে দেখিতে করুণার সহিত রজনীর মহা ভাব হইয়া গেল। দুই জনের ফুস্ ফুস্ করিয়া মহা মনের কথা পড়িয়া গেল—তাহাদের কথা আর ফুরায় না। তাহাদের স্বামীদের কত দিনকার সামান্য যত্ন, সামান্য আদরটুকু তাহারা মনের মধ্যে গাঁথিয়া রাখিয়াছে—তাহাই কত মহান ঘটনার মতো বলাবলি করিত। কিন্তু এ বিষয়ে তো দুই জনেরই ভাণ্ডার অতি সামান্য, তবে কী যে কথা হইত তাহারাই জানে। হয়তো সে-সব কথা লিখিলে পাঠকেরা তাহার গাম্ভীর্য বুঝিতে পারিবেন না, হয়তো হাসিবেন, হয়তো মনে করিবেন এ-সব কোনো কাজেরই কথা নয়। কিন্তু সে বালিকারা যে-সকল কথা লইয়া অতি গুপ্তভাবে অতি সাবধানে আন্দোলন করিয়াছে তাহাই লইয়া যে সকলে হাসিবে, সকল কথা তুচ্ছভাবে উড়াইয়া দিবে তাহা মনে করিলে কষ্ট হয়। কিন্তু করুণার সঙ্গে রজনী পারিয়া উঠে না—সে এক কথা সাতবার করিয়া বলিয়া, সব কথা একেবারে বলিতে চেষ্টা করিয়া, কোনো কথাই ভালো করিয়া বুঝাইতে না পারিয়া, রজনীর এক প্রকার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারই কথা ফুরায় নাই তো কেমন করে সে রজনীর কথা শুনিবে! তাহার কি একটা-আধটা কথা। তাহার পাখির কথা, তাহার ভবির কথা, তাহার কাঠবিড়ালির গল্প—সে কবে কী স্বপ্ন দেখিয়াছিল—তাহার পিতার নিকট দুই রাজার কী গল্প শুনিয়াছিল—এ সমস্ত কথা তাহার বলা আবশ্যক। আবার বলিতে বলিতে যখন হাসি পাইত তখন তাহাই বা থামায় কে। আর, কেন যে হাসি পাইল তাহাই বা বুঝে কাহার সাধ্য। রজনী-বেচারির বড়ো বেশি কথা বলিবার ছিল না, কিন্তু বেশি কথা নীরবে শুনিবার এমন আর উপযুক্ত পাত্র নাই। রজনী কিছুতেই বিরক্ত হইত না, তবে এক-এক সময়ে অন্যমনস্ক হইত বটে—তা, তাহাতে করুণার কী ক্ষতি। করুণার বলা লইয়া বিষয়।

করুণাকে লইয়া মহেন্দ্রের মাতা বড়ো ভাবিত আছেন। তাঁহার বয়স বড়ো কম নহে, পঞ্চান্ন বৎসর—এই পঞ্চান্ন বৎসরের অভিজ্ঞতায় তিনি ভদ্রলোকের ঘরে এমন বেহায়া মেয়ে কখনও দেখেন নাই, আবার তাঁহার প্রতিবেশিনীরা তাহাদের বাপের বয়সেও এমন মেয়ে কখনও দেখে নাই বলিয়া স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গেল। মহেন্দ্রের পিতা তামাকু খাইতে খাইতে কহিতেন যে, ছেলেমেয়েরা সবাই খৃস্টান হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রের মাতা কহিতেন সে কথা মিছা নয়। মহেন্দ্রের মাতা মাঝে মাঝে রজনীকে

সম্বোধন করিয়া করুণার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া কহিতেন, 'আজ বাগানে বড়ো গলা বাহির করা হইতেছিল! লজ্জা করে না!' কিন্তু তাহাতে করুণা কিছুই সাবধান হয় নাই। কিন্তু এ তো করুণার শান্ত অবস্থা, করুণা যখন মনের সুখে তাহার পিতৃভবনে থাকিত তখন যদি এই পঞ্চান্ন বৎসরের অভিজ্ঞ গৃহিণী তাহাকে দেখিতেন তবে কী করিতেন বলিতে পারি না।

আবার এক-একবার যখন বিষণ্ণ ভাব করুণার মনে আসিত তখন তাহার মূর্তি সম্পূর্ণ বিপরীত। আর তাহার কথা নাই, হাসি নাই, গল্প নাই, সে এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে— রজনী পাশে বসিয়া 'লক্ষ্মী দিদি আমার' বলিয়া কত সাধ্যসাধি করিলে উত্তর নাই। করুণা প্রায় মাঝে মাঝে এমনি বিষণ্ণ হইত, কতক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তবে সে শান্ত হইত। একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "নরেন্দ্র কোথায়।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমি তো জানি না।"

করুণা কহিল, "কেন জান না।"

কেন জানে না সে কথা মহেন্দ্র ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না, তবে নরেন্দ্রের সন্ধান করিতে স্বীকার করিল।।

কিন্তু নরেন্দ্রের অধিক সন্ধান করিতে হইল না। নরেন্দ্র কেমন করিয়া তাহার সন্ধান পাইয়াছে। একদিন করুণা যখন রজনীর নিকট দুই রাজার গল্প করিতে ভারি ব্যস্ত ছিল, এমন সময়ে ডাকে তাহার নামে একখানি চিঠি আসিল। এ পর্যন্তও তাহার বয়সে সে কখনও নিজের নামের চিঠি দেখে নাই। এ চিঠি পাইয়া করুণার মহা আহ্লাদ হইল, সে জানিত চিঠি পাওয়া এক মহা কাণ্ড, রাজা--রাজড়াদেরই অধিকার। আস্ত চিঠি ছিঁড়িয়া খুলিতে তাহার কেমন মায়া হইতে লাগিল, আগে সকলকে দেখাইয়া অনেক অনিচ্ছার সহিত লেফাফা খুলিল, চিঠি পড়িল, চিঠি পড়িয়া তাহার মুখ শুখাইয়া গেল, থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চিঠি মহেন্দ্রকে দিল।

নরেন্দ্র লিখিতেছেন— 'তিন শত টাকা আমার প্রয়োজন, না পাইলে আমার সর্বনাশ, না পাইলে আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিব। ইতি।'

করুণা কাঁদিয়া উঠিল। করুণা মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "কী হবে।"

মহেন্দ্র কহিল কোনো ভাবনা নাই, এখনি টাকা লইয়া সে যাইতেছে। নরেন্দ্রের ঠিকানা চিঠিতে লিখা ছিল, সেই ঠিকানা-উদ্দেশ্যে মহেন্দ্র চলিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র দেশে আসিয়া অবধি মোহিনীর বড়ো খোঁজ-খপর পাওয়া যায় না। মহেন্দ্র তো তাহার কোনো কারণ খুঁজিয়া পায় না— 'একদিন কী অপরাধ করিয়াছিলাম তাহার জন্য কি দুই জনের এ জন্মের মতো ছাড়াছাড়ি হইবে?' সে মনে করিল হয়তো মোহিনী রাগ করিয়াছে, হয়তো মোহিনী তাহাকে ভালোবাসে না। পাঠকেরা শুনিলে বোধ হয় সন্তুষ্ট হইবেন না যে, মহেন্দ্র এখনও মোহিনীকে ভালোবাসে। কিন্তু মহেন্দ্রের সে ভালোবাসার পক্ষে যে যুক্তি কত, তাহা শুনিলে কাহারও আর

কথা কহিবার জো থাকিবে না। সে বলে, 'মানুষকে ভালোবাসিতে দোষ কী। আমি তো মোহিনীকে তেমন ভালোবাসি না, আমি তাহাকে ভগিনীর মতো, বন্ধুর মতো ভালোবাসি—আমি কখনও তাহার অধিক তাহাকে ভালোবাসি না।' এই কথা এত বিশেষ করিয়া ও এত বার বার বলিত যে তাহাতেই বুঝা যাইত তদপেক্ষাও অধিক ভালোবাসে। সে আপনার মনকে ভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিত, সুতরাং ঐ এক কথা তাহাকে বার বার বিশেষ করিয়া বলিতে হইত। ঐ এক কথা বার বার বলিয়া তাহার মনকে বিশ্বাস করাইতে চাহিত, তাহার মন এক-একবার অল্প-অল্প বিশ্বাস করিত। সে বলিত, 'আপনার ভগিনীর মতো, বন্ধুর মতো যদি মোহিনী মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসে তাহাতে দোষ কী। বরং না আসিলেই দোষ। কেন, মোহিনী তো আর-সকলের সঙ্গেই দেখা করিতে পারে, তবে আমার সঙ্গে দেখা করিতে পারিবে না কেন। যেন সত্য-সত্যই আমাদের মধ্যে কোনো সমাজবিরুদ্ধ ভাব আছে—কিন্তু তাহা তো নাই, নিশ্চয় তাহা নাই, তাহা থাকা অসম্ভব। আমি রজনীকে প্রেমের ভাবে ভালোবাসি, সকলের অপেক্ষা ভালোবাসি—আমি মোহিনীকে কেবল ভগিনীর মতো ভালোবাসি।' মহেন্দ্র এইরূপে মনের মধ্যে সকল কথা তোলাপাড়া করিত। এমন-কি, রজনীকেও তাহার এই-সকল যুক্তি বুঝাইয়াছিল। রজনীর বুঝিতে কিছুই গোল বাধে নাই, সে বেশ স্পষ্টই বুঝিয়াছিল। সে নিজে গিয়া মোহিনীকে ঐ-সমস্ত কথা বুঝাইল, মোহিনী বিশেষ কিছুই উত্তর দিল না। মনে-মনে কহিল, 'সকলের মন জানি না, কিন্তু আমার নিজের মনের উপর আমার বিশ্বাস নাই।' মোহিনী ভাবিল—আর না, আর এখানে থাকা শ্রেয় নহে। মোহিনী কাশী যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিল, বাড়ির লোকেরা তাহাতে অসম্মত হইল না।

কাশী যাইবার সময় করুণা ও রজনীর সহিত একবার দেখা করিল। করুণা কহিল, "তুমি কাশী যাইতেছ, যদি আমাদের পণ্ডিতমহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয় তবে তাঁহাকে বলিয়ো আমি ভালো আছি।"

করুণা জানিত যে, পণ্ডিতমহাশয় নিশ্চয় তাহার কুশলসংবাদ পাইবার জন্য আকুল আছেন।

করুণা যাহা মনে করিয়াছিল তাহা মিথ্যা নহে। নিধির পীড়াপীড়িতে রেলের গাড়িতে চড়িয়া পণ্ডিতমহাশয়ের এমন অনুতাপ হইয়াছিল যে অনেকবার তিনি চীৎকার করিয়া গাড়ি থামাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 'গাড়োয়ান যখন কিছুতেই ব্রাহ্মণের দোহাই মানিল না, তখন তিনি ক্ষান্ত হন। কিন্তু বার বার কাতরস্বরে নিধিকে বলিতে লাগিলেন 'কাজটা ভালো হইল না'। দুই-চার-বার এইরূপ বলিতেই নিধি মহা বিরক্ত হইয়া বিলক্ষণ একটি ধমক দিয়া উঠিল। পণ্ডিতমহাশয় নিধিকে আর-কিছু বলিতে সাহস করিলেন না ; কিন্তু গাড়ির কোণে বসিয়া এক ডিবা নস্য সমস্ত নিঃশেষ করিয়াছিলেন ও তাঁহার চাদরের এক অংশ অশ্রুজলে সম্পূর্ণরূপে ভিজাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কেবল গাড়িতে নয়, যেখানে গিয়াছেন নিধিকে বার বার ঐ এক কথা বলিয়া বিরক্ত করিয়াছেন। কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া যখন করুণাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহার আর অনুতাপের পরিসীমা রহিল না। নিধিকে ঐ এক কথা বলিয়া এমন বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, সে একদিন কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার সমস্ত উদ্যোগ করিয়াছিল।

মোহিনী কহিল, "তোমাদের পণ্ডিতমহাশয়কে তো আমি চিনি না, যদি চিনা-শুনা হয়, তবে বলিব।"

করুণা একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। পণ্ডিতমহাশয়কে চিনে না? সে জানিত পণ্ডিতমহাশয়কে সকলেই চিনে। সে মোহিনীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিল কোন্ পণ্ডিতমহাশয়ের কথা কহিতেছে, কিন্তু তাহাতেও যখন মোহিনী পণ্ডিত-মহাশয়কে চিনিল না তখন করুণা নিরাশ ও অবাক্ হইয়া গেল।

কাঁদিতে কাঁদিতে রজনীর কাছে বিদায় লইয়া মোহিনী কাশী চলিয়া গেল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

বর্ষা কাল। দুই দিন ধরিয়া বাদলার বিরাম নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, কলিকাতার রাস্তায় ছাতির অরণ্য পড়িয়া গিয়াছে। সসংকোচ পথিকদের সর্বাঙ্গে কাদা বর্ষণ করিতে করিতে গাড়ি ছুটিতেছে।

মহেন্দ্র নরেন্দ্রের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন। বড়ো রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করাইয়া একটি অতি সংকীর্ণ অন্ধকার গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুটা-একটা খোলার ঘর ভাঙিয়া-চুরিয়া পড়িতেছে ও তাহার দুই প্রৌঢ়া অধিবাসিনী অনেক ক্ষণ ধরিয়া বকাবকি করিয়া অবশেষে চুলাচুলি করিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। ভাঙা হাঁড়ি, পচা ভাত, আমের আঁটি ও পৃথিবীর আবর্জনা গলির যেখানে সেখানে রাশীকৃত রহিয়াছে।

একটি দুর্গন্ধ পুষ্করিণীর তীরে আস্তাবল-রক্ষকের মহিলারা আঁচল ভরিয়া তাঁহাদের আহারের জন্য উদ্ভিজ্জ সঞ্চয় করিতেছেন। হুঁচট খাইতে খাইতে— কখনও বা এক-হাঁটু কাদায়, কখনও বা এক-হাঁটু ঘোলা জলে জুতা ও পেণ্টলুনটাকে পেন্সন দিবার কল্পনা করিতে করিতে— সর্বাঙ্গে কাদামাখা দুই-চারিটা কুকুরের নিকট হইতে অশ্রান্ত তিরস্কার শুনিতে শুনিতে মহেন্দ্র গোবর-আচ্ছাদিত একটি অতি মুমূর্ষু বাটীতে গিয়া পৌঁছিলেন। দ্বারে আঘাত করিলেন, জীর্ণ শীর্ণ দ্বার বিরক্ত রোগীর মতো মৃদু আর্তনাদ করিতে করিতে খুলিয়া গেল। নরেন্দ্র গৃহে ছিলেন, কিন্তু বৎসর-কয়েকের মধ্যে পুলিসের কনস্টেবল ছাড়া নরেন্দ্রের গৃহে আর-কোনো অতিথি আসে নাই— এই জন্য দ্বার খুলিবার শব্দ শুনিয়াই নরেন্দ্র অন্তর্ধান করিয়াছেন।

দ্বার খুলিয়াই মহেন্দ্র আবর্জনা ও দুর্গন্ধ-ময় এক প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিলেন। সে প্রাঙ্গণের এক পাশে একটা কূপ আছে সে কূপের কাছে কতকগুলা আমের আঁটি হইতে ছোটো ছোটো চারা উঠিয়াছে। সে কূপের উপরে একটা পেয়ারা গাছ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। প্রাঙ্গণ পার হইয়া সংকুচিত মহেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। এমন নিম্ন ও এমন স্যাঁৎসেঁতে ঘর বুঝি মহেন্দ্র আর কখনও দেখে নাই, ঘর হইতে এক প্রকার ভিজা ভাপসা গন্ধ বাহির হইতেছে। বৃষ্টির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভগ্ন জানালায় একটা ছিন্ন দরমার আচ্ছাদন রহিয়াছে। সে গৃহের দেয়ালে যে এক কালে বালি ছিল, সে পাড়ায় এইরূপ একটা প্রবাদ আছে মাত্র। এক জায়গায় ইঁটের মধ্যে একটি গর্তে খানিকটা তামাক গোঁজা আছে। গৃহসজ্জার মধ্যে একখানি

অবিশ্বাসজনক তক্তা (যদি তাহার প্রাণ থাকিত তবে তাহা ব্যবহার করিলে পশু-নৃশংসতানিবারিণী সভায় অনেক টাকা জরিমানা দিতে হইত)—তাহার উপরে মলালিপ্ত মসীবর্ণ একখানি মাদুর ও তদুপযুক্ত বালিশ ও সর্বোপরি স্বকার্যে অক্ষম দীনহীন একটি মশারি।

গৃহে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র একটি দাসীকে দেখিতে পাইলেন। সে দাসীটি তাঁহাকে দেখিয়াই ঈষৎ হাসিতে হাসিতে মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে কহিল, "কেন গো বাবু, মানুষের গায়ের উপর না পড়িলেই কি নয়।"

মহেন্দ্র তাহার নিকট হইতে অন্তত দুই হস্ত ব্যবধানে ছিলেন ও তাহার দুর্গন্ধ বস্ত্র ও ভয়জনক মুখশ্রী দেখিয়া আরও দুই হস্ত ব্যবধানে যাইবার সংকল্প করিতেছিলেন। কিন্তু মহেন্দ্রের যে তাহার কাছে যাওয়াই লক্ষ্য ছিল, ইহা কল্পনা করিয়া সে দাসীটি মনে-মনে মহা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই দাসী গিয়া ভীত নরেন্দ্রকে অনেক আশ্বাস দিয়া ডাকিয়া আনিল। নরেন্দ্র মহেন্দ্রকে দেখিয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য হইল না, সে যেন তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

কিন্তু মহেন্দ্র নরেন্দ্রকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল—এমন পরিবর্তন সে আর কাহারও দেখে নাই। অনাবৃত দেহ, অল্পপরিসর জীর্ণ মলিন বস্ত্রে হাঁটু পর্যন্ত আচ্ছাদিত। মুখশ্রী অত্যন্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে, চক্ষু জ্যোতিহীন, কেশপাশ অপরিচ্ছন্ন ও বিশৃংখল, সর্বদাই হাত থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, বর্ণ এমন মলিন হইয়া গিয়াছে যে আশ্চর্য হইতে হয়—তাহাকে দেখিলেই কেমন এক প্রকার ঘৃণা ও সংকোচ উপস্থিত হয়। নরেন্দ্র অতি শান্তভাবে মহেন্দ্রকে তাঁহার নিজের ও তাঁহার সংক্রান্ত সমস্ত লোকের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, কাজ কর্ম কিরূপ চলিতেছে তাহাও খোঁজ লইলেন। মহেন্দ্র নরেন্দ্রের এই অতি শান্তভাব দেখিয়া অত্যন্ত অবাক্ হইয়া গিয়াছেন—মহেন্দ্রকে দেখিয়া নরেন্দ্র কিছুমাত্র লজ্জা বা সংকোচ বোধ করেন নাই।

মহেন্দ্র আর কিছু না বলিয়া নরেন্দ্রের চিঠিটি তাহার হস্তে দিল। সে অবিচলিত ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হাঁ মশায়, সম্প্রতি অবস্থা মন্দ হওয়াতে কিছু দেনা হইয়াছে, তাই বড়ো জড়াইয়া পড়িয়াছি।"

মহেন্দ্র কহিলেন, "তা, আপনার স্ত্রীর নিকট সাহায্য চাহিবার অর্থ কী। উপার্জনের ভার তো আপনার হাতে। আর, তিনি অর্থ পাইবেন কোথা।"

নির্লজ্জ নরেন্দ্র কহিল, "সেকি কথা! আমি সন্ধান লইয়াছি, আজকাল সে খুব উপার্জন করিতেছে। দিনকতক স্বরূপবাবু তাহাকে পালন করিয়াছিলেন, শুনিলাম আজকাল আর কোনো বাবুর আশ্রয়ে আছে।"

মহেন্দ্র ইচ্ছপূর্বক কথাটার মন্দ অর্থ না লইয়া কিঞ্চিৎ দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "আপনি জানেন তিনি আমার বাটীতেই আছেন।"

নরেন্দ্র কহিলেন, "আপনারই বাটীতে? সে তো ভালোই।"

মহেন্দ্র কহিলেন, "কিন্তু তাঁহার কাছে অর্থ থাকিবার তো কোনো সম্ভাবনা নাই।"

নরেন্দ্র কহিলেন, "তা যদি হয়, তবে আমার চিঠির উত্তরে সে কথা লিখিয়া দিলেই হইত।"

মহেন্দ্র যেরূপ ভালো মানুষ, অধিক গোলযোগ করা তাঁহার কর্ম নয়। বকাবকি করিতে আরম্ভ করিলে তাহার আর অন্ত হইবে না জানিয়া মহেন্দ্র প্রস্তাব করিলেন—নরেন্দ্র যদি তাঁহার কু-অভ্যাসগুলি পরিত্যাগ করেন তবে তিনি তাঁহার সাহায্য করিবেন।

নরেন্দ্র আকাশ হইতে পড়িল ; কহিল, "কু-অভ্যাস কী মশায়! নূতন কু-অভ্যাস তো আমার কিছুই হয় নাই, আমার যা অভ্যাস আছে সে তো আপনি সমস্ত জানেন।"

এই কথায় ভালোমানুষ মহেন্দ্র কিছু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, সে তেমন ভালো উত্তর দিতে পারিল না। নরেন্দ্র পূর্বে এত কথা কহিতে জানিত না, বিশেষ মহেন্দ্রের কাছে কেমন একটু সংকোচ অনুভব করিত—সম্প্রতি দেখিতেছি সে ভারি কথা কাটাকাটি করিতে শিখিয়াছে। তাহার স্বভাব আশ্চর্য বদল হইয়া গিয়াছে।

মহেন্দ্র শীঘ্র শীঘ্র তাহার সহিত মীমাংসা করিয়া লইয়া তাহাকে টাকা দিলেন ও কহিলেন, ভবিষ্যতে নরেন্দ্র যেন তাঁহার স্ত্রীকে অন্যায় ভয় দেখাইয়া চিঠি না লেখেন। মহেন্দ্র সেই আর্দ্র বাষ্পময় ঘর হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলেন ও পথের মধ্যে একটা ডাক্তারখানা হইতে একশিশি কুইনাইন কিনিয়া লইয়া যাইবেন বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। দ্বারের নিকট দাসীটি বসিয়াছিল, সে মহেন্দ্রকে দেখিয়া অতি মধুর দুই-তিনটি হাস্য ও কটাক্ষ বর্ষণ করিল ও মনে-মনে ঠিক দিয়া রাখিল—সেই কটাক্ষের প্রভাবে, মলয়সমীরণে, চন্দ্রকিরণে মহেন্দ্র বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

আজকাল রজনী ভারি গিন্নি হইয়াছে। এখন তাহার হাতে টাকাকড়ি আসে। পাড়ার অধিকাংশ বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়া গৃহিণীরা রজনীর শাশুড়ির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শিঙ ভাঙিয়া রজনীর দলে মিশিয়াছেন। তাঁহারা ঘণ্টাখানেক ধরিয়া রজনীর কাছে দেশের লোকের নিন্দা করিয়া, উঠিয়া যাইবার সময় হাই তুলিতে তুলিতে পুনশ্চ নিবেদনের মধ্যে আবশ্যকমত টাকাটা-সিকিটা ধার করিয়া লইতেন এবং রজনীর স্বামীর, রজনীর উচ্চ বংশের ও চোখের জল মুছিতে মুছিতে রজনীর মৃত লক্ষ্মীস্বভাবা মাতার প্রশংসা করিয়া শীঘ্র সে ধারগুলি শুধিতে না হয় এমন বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেন। কিন্তু এই পিসি-মাসি শ্রেণীর মধ্যে করুণার দুর্নাম আর ঘুচিল না। ঘুচিবে কিরূপে বলো। মাসি যখন সন্তোষজনকরূপে ভূমিকাটি শেষ করিয়া রজনীর কাছে কাজের কথা পাড়িবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে হয়তো করুণা কোথা হইতে তাড়াতাড়ি আসিয়া রজনীকে টানিয়া লইয়া বাগানে চলিল। মাঝে মাঝে তাঁহারা করুণার ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'তুমি কেমন-ধারা গা?' সে যে কেমন-ধারা করুণা তাহার কোনো হিসাব দিতে চেষ্টা করিত না। কোনো পিসির বিশেষ কথা, বিশেষ অঙ্গভঙ্গি বা বিশেষ মুখশ্রী দেখিলে এক-এক সময় তাহার এমন হাসি পাইত যে, সে সামলাইয়া উঠা দায় হইত, সে রজনীর গলা ধরিয়া মহা হাসির কল্লোল তুলিত—রজনী-সুদ্ধ বিব্রত হইয়া উঠিত। তাহা ছাড়া রজনীর গিন্নিপনা দেখিয়া সে এক-এক সময়ে হাসিয়া আর বাঁচিত না।

কিছুদিন হইতে মহেন্দ্র দেখিতেছেন বাড়িটা যেন শান্ত হইয়াছে। করুণার আমোদ আহ্লাদ থামিয়াছে। কিন্তু সে শান্তি প্রার্থনীয় নহে—হাস্যময়ী বালিকা হাসিয়া খেলিয়া বাড়ির সর্বত্র যেন উৎসবময় করিয়া রাখিত—সে এক দিনের জন্য নীরব হইলে বাড়িটা যেন শূন্য-শূন্য ঠেকিত, কী যেন অভাব বোধ হইত। কয়দিন হইতে করুণা এমন বিষন্ন হইয়া গিয়াছিল—সে এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, কাঁদিত, কিছুতেই প্রবোধ মানিত না। করুণা যখন এইরূপ বিষন্ন হইয়া থাকে তখন রজনীর বড়ো কষ্ট হয়—সে বালিকার হাসি আহ্লাদ না দেখিতে পাইলে সমস্ত দিন তাহার কেমন কোনো কাজই হয় না।

নরেন্দ্রের বাড়ি যাইবে বলিয়া করুণা মহেন্দ্রকে ভারি ধরিয়া পড়িয়াছে। মহেন্দ্র বলিল, সে বাড়ি অনেক দূরে। করুণা বলিল, তা হোক্! মহেন্দ্র কহিল, সে বাড়ি বড়ো খারাপ। করুণা কহিল, তা হোক্! মহেন্দ্র কহিল, সে বাড়িতে থাকিবার জায়গা নাই। করুণা উত্তর দিল, তা হোক! সকল আপত্তির বিরুদ্ধে এই 'তা হোক' শুনিয়া মহেন্দ্র ভাবিলেন, নরেন্দ্রকে একটি ভালো বাড়িতে আনাইবেন ও সেইখানে করুণাকে লইয়া যাইবেন। নরেন্দ্রের সন্ধানে চলিলেন।

বাড়িভাড়া দিবার সময় হইয়াছে বলিয়াই হউক বা মহেন্দ্র তাঁহার বাড়ির ঠিকানা জানিতে পারিয়াছে বলিয়াই হউক, নরেন্দ্র সে বাড়ি হইতে উঠিয়া গিয়াছেন। মহেন্দ্র তাঁহার বৃথা অন্বেষণ করিলেন, পাইলেন না।

এই বার্তা শুনিয়া অবধি করুণার আর হাসি নাই। বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ সময়ে, সহসা এক-একটা কথা শুনিলে যেমন বুকে আঘাত লাগে, করুণার তেমনি আঘাত লাগিয়াছে। কেন, এত দিনেও কি করুণার সহিয়া যায় নাই। নরেন্দ্র করুণার উপর কত শত দুর্ব্যবহার করিয়াছে, আর আজ তাহার এক স্থানান্তর সংবাদ পাইয়াই কি তাহার এত লাগিল। কে জানে, করুণার বড়ো লাগিয়াছে। বোধ হয় ক্রমাগত জ্বালাতন হইয়া হইয়া তাহার হৃদয় কেমন জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আজ এই একটি সামান্য আঘাতেই ভাঙিয়া পড়িল। বোধ হয় এবার বেচারি করুণা বড়োই আশা করিয়াছিল যে, বুঝি নরেন্দ্রের সহিত আবার দেখা-সাক্ষাৎ হইবে। তাহাতে নিরাশ হইয়া সে পৃথিবীর সমুদয় বিষয়ে নিরাশ হইয়াছে, হয়তো এই এক নিরাশা হইতেই তাহার বিশ্বাস হইয়াছে তাহার আর কিছুতেই সুখ হইবে না। করুণার মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িল—যে ভাবনা করুণার মতো বালিকার মনে আসা প্রায় অসম্ভব, সেই মরণের ভাবনা তাহার মনে হইল। তাহার মনে হইল এ সংসারে সে কেমন শ্রান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সে আর পারিয়া ওঠে না, এখন তাহার মরণ হইলে বাঁচে। এখন আর অধিক লোকজন তাহার কাছে আসিলে তাহার কেমন কষ্ট হয়। সে মনে করে, 'আমাকে এইখানে একলা রাখিয়া দিক, আপনার মনে একলা পড়িয়া থাকিয়া মরি।' সে সকল লোকের নানা জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া উঠিতে আর পারে না। সে সকল বিষয়েই কেমন বিরক্ত উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। রজনী বেচারি কত কাঁদিয়া তাহাকে কত সাধ্য সাধনা করিয়াছে, কিন্তু এই আহত লতাটি জন্মের মতো ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে—বর্ষার সলিলসেকে বসন্তের বায়ুবীজনে, আর সে মাথা তুলিতে পারিবে না।

কিন্তু এ কি সংবাদ! মহেন্দ্র নরেন্দ্রের সন্ধান আবার পাইয়াছে শুনিতেছি। মহেন্দ্র করুণা ও নরেন্দ্রের জন্য একটি ভালো বাড়ি ভাড়া করিয়াছে। নরেন্দ্র মহেন্দ্রের ব্যয়ে সে বাড়িতে বাস করিতে সহজেই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু একবার মন ভাঙিয়া গেলে তাহাতে আর স্ফূর্তি হওয়া সহজ নহে— করুণা এই সংবাদ শুনিল, কিন্তু তাহার অবসন্ন মন আর তেমন জাগিয়া উঠিল না। করুণা মহেন্দ্রদের বাড়ি হইতে বিদায় হইল— যাইবার দিন রজনী করুণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কতই কাঁদিতে লাগিল। করুণা চলিয়া গেলে সে বাড়ি যেন কেমন শূন্য-শূন্য হইয়া গেল। সেই-যে করুণা গেল, আর সে ফিরিল না। সে বাড়িতে সেই অবধি করুণার সেই সুমধুর হাসির ধ্বনি এক দিনের জন্যও আর শুনা গেল না।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

পীড়িত অবস্থায় করুণা নরেন্দ্রের নিকট আসিল। মহেন্দ্র প্রায় মাঝে মাঝে করুণাকে দেখিতে আসিতেন; করুণা কখনও খারাপ থাকিত, কখনও ভালো থাকিত। এমনি করিয়া দিন চলিয়া যাইতেছে। নরেন্দ্র করুণাকে মনে মনে ঘৃণা করিত, কেবল মহেন্দ্রের ভয়ে এখনও তাহার উপর কোনো অসদ্‌ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে নাই। কিন্তু নরেন্দ্র প্রায় বাড়িতে থাকিত না— দুই-একদিন বাদে যে অবস্থায় বাড়িতে আসিত, তখন করুণার কাছে না আসিলেই ভালো হইত। তাহার অবর্তমানে পীড়িতা করুণাকে দেখিবার কেহ লোক নাই। কেবল সেই দাসীটি মাঝে মাঝে আসিয়া বিরক্তির স্বরে কহিত, "তোমার কি ব্যামো কিছুতেই সারবে না গা। কী যন্ত্রণা!"

নরেন্দ্রের উপর এই দাসীটির মহা আধিপত্য ছিল। নরেন্দ্র যখন মাঝে মাঝে বাড়ি হইতে চলিয়া যাইত, তখন ইহার যত ঈর্ষা হইত এত আর কাহারও নয়। এমন-কি নরেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসিলে তাহাকে মাঝে মাঝে ঝাঁটাইতে ত্রুটি করিত না। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের উপর ইহার অভিমানই বা দেখে কে। করুণার উপরেও ইহার ভারি আক্রোশ ছিল, করুণাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া জ্বালাতন করিয়া মারিত। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের সহিত ইহার মহা মারামারি বাধিয়া যাইত— দুজনেই দুজনের উপর গালাগালি ও কিল চাপড় বর্ষণ করিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া দিত। কিন্তু এইরূপ জনশ্রুতি আছে, নরেন্দ্র তাহার বিপদের দিনে ইহার সাহায্যে দিন-যাপন করিতেন।

নরেন্দ্রের ব্যবহার ক্রমেই স্ফূর্তি পাইতে লাগিল। যখন-তখন আসিয়া মাতলামি করিত, সেই দাসীটির সহিত ভারি ঝগড়া বাধাইয়া দিত। করুণা এই-সমস্তই দেখিতে পাইত, কিন্তু তাহার কেমন এক প্রকারের ভাব হইয়াছে— সে মনে করে যাহা হইতেছে হউক, যাহা যাইতেছে চলিয়া যাক! দাসীটা মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের উপর রাগিয়া করুণার নিকট গর্ গর্ করিয়া মুখ নাড়িয়া যাইত; করুণা চুপ করিয়া থাকিত কিছুই উত্তর দিত না। নরেন্দ্র আবশ্যকমত গৃহসজ্জা বিক্রয় করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাতেও কিছু হইল না— অর্থসাহায্য চাহিয়া মহেন্দ্রকে একখানা চিঠি লিখিবার জন্য করুণাকে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল।

করুণা বেচারি কোথায় একটু নিশ্চিন্ত হইতে চায়, কোথায় সে মনে করিতেছে 'যে যাহা করে করুক—আমাকে একটু একেলা থাকিতে দিক', না, তাহাকে লইয়াই এই-সমস্ত হাঙ্গাম! সে কী করে, মাঝে মাঝে লিখিয়া দিত। কিন্তু বার বার এমন কী করিয়া লিখিবে। মহেন্দ্রের নিকট হইতে বার বার অর্থ চাহিতে তাহার কেমন কষ্ট হইত, তাদ্ভিন্ন সে জানিত অর্থ পাইলেই নরেন্দ্র তাহা দুষ্কর্মে ব্যয় করিবে মাত্র।

একদিন সন্ধ্যার সময় নরেন্দ্র আসিয়া মহেন্দ্রকে চিঠি লিখিবার জন্য করুণাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। করুণা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "পায়ে পাড়, আমাকে আর চিঠি লিখিতে বলিয়ো না।"

সেই সময় সেই দাসীটি আসিয়া পড়িল, সেও নরেন্দ্রের সঙ্গে যোগ দিল—কহিল, "তুমি অমন একগুঁয়ে মেয়ে কেন গা! টাকা না থাকলে গিলবে কী।"

নরেন্দ্র ক্রুদ্ধভাবে কহিল, "লিখিতেই হইবে।"

করুণা নরেন্দ্রের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "ক্ষমা করো, আমি লিখিতে পারিব না।"

"লিখিবি না? হতভাগিনী, লিখিবি না?"

ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া নরেন্দ্র করুণাকে প্রহার করিতে লাগিল। এমন সময় সহসা দ্বার খুলিয়া পণ্ডিতমহাশয় প্রবেশ করিলেন; তিনি তাড়াতাড়ি গিয়া নরেন্দ্রকে ছাড়াইয়া দিলেন, দেখিলেন দুর্বল করুণা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

পূর্বেই বলিয়াছি, পণ্ডিতমহাশয় নিধির টানাটানিতে গাড়িতে উঠিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন কখনোই ভালো ছিল না। তিনি প্রায়ই মাঝে মাঝে মনে করিতেন, তাঁহার স্নেহভাগিনী করুণার দশা কী হইল! এইরূপ অনুতাপে যখন কষ্ট পাইতেছিলেন এমন সময়ে দৈবক্রমে মোহিনীর সহিত সত্য-সত্যই তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

তাহার নিকট করুণার সমস্ত সংবাদ পাইয়া আর থাকিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি কলিকাতায় আসিলেন। প্রথমে মহেন্দ্রের কাছে গেলেন, সেখানে নরেন্দ্রের বাড়ির সন্ধান লইলেন—বাড়িতে আসিয়াই নরেন্দ্রের ঐ নিষ্ঠুর অত্যাচার দেখিতে পাইলেন।

সেই মূর্ছার পর হইতে করুণার বার বার মূর্ছা হইতে লাগিল। পণ্ডিতমহাশয় মহা অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি যে কী করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। এই সময়ে তিনি নিধির অভাব অত্যন্ত অনুভব করিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি তাড়াতাড়ি মহেন্দ্রকে ডাকিতে গেলেন। মহেন্দ্র ও রজনী উভয়েই আসিল। মহেন্দ্র যথাসাধ্য চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। করুণা মাঝে মাঝে রজনীর হাত ধরিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে কথা কহিত; পণ্ডিতমহাশয় যখন অনুতপ্ত-হৃদয়ে করুণার নিকট আপনাকে ধিক্কার দিতেন, যখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন, মা, আমি তোকে অনেক কষ্ট দিয়াছি', তখন করুণা অশ্রুপূর্ণনেত্রে অতি ধীরস্বরে

তাঁহাকে বারণ করিত। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত 'নরেন্দ্রকে ডাকিয়া দিবে?' সে কহিত, "কাজ নাই।"

সে জানিত নরেন্দ্র কেবল বিরক্ত হইবে মাত্র।

আজ রাত্রে করুণার পীড়া বড়ো বাড়িয়াছে। শিয়রে বসিয়া রজনী কাঁদিতেছে। আর পণ্ডিতমহাশয় কিছুতেই ঘরের মধ্যে স্থির থাকিতে না পারিয়া বাহিরে গিয়া শিশুর ন্যায় অধীর উচ্ছ্বাসে কাঁদিতেছেন। নরেন্দ্র গৃহে নাই। আজ করুণা একবার নরেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিবার জন্য মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিল। নরেন্দ্র যখন গৃহে আসিলেন, তাঁহার চক্ষু লাল, মুখ ফুলিয়াছে, কেশ ও বস্ত্র বিশৃঙ্খল। হতবুদ্ধি-প্রায় নরেন্দ্রকে করুণার শয্যার পার্শ্বে সকলে বসাইয়া দিল। করুণা কম্পিত হস্তে নরেন্দ্রের হাত ধরিল, কিন্তু কিছু কহিল না।

আশ্বিন ১২৮৪ - ভাদ্র ১২৮৫

মুকুট

প্রথম পরিচ্ছেদ

ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র রাজধর সেনাপতি ইশা খাঁকে বলিলেন, "দেখো সেনাপতি, আমি বার বার বলিতেছি, তুমি আমাকে অসম্মান করিয়ো না।"

পাঠান ইশা খাঁ কতকগুলি তীরের ফলা লইয়া তাহাদের ধার পরীক্ষা করিতেছিলেন। রাজধরের কথা শুনিয়া কিছুই বলিলেন না, কেবল মুখ তুলিয়া ভুরু উঠাইয়া একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। আবার তখনই মুখ নত করিয়া তীরের ফলার দিকে মনোযোগ দিলেন।

রাজধর বলিলেন, "ভবিষ্যতে যদি তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাকো, তবে আমি তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করিব।"

বৃদ্ধ ইশা খাঁ সহসা মাথা তুলিয়া বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বটে!"

রাজধর তাঁহার তলোয়ারের খাপের আগা মেঝের পাথরের উপরে ঠক্ করিয়া ঠুকিয়া বলিলেন, "হাঁ।"

ইশা খাঁ বালক রাজধরের বুক-ফুলানোর ভঙ্গি ও তলোয়ারের আস্ফালন দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না, হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রাজধরের সমস্ত মুখ, চোখের সাদাটা পর্যন্ত লাল হইয়া উঠিল।

ইশা খাঁ উপহাসের স্বরে হাসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "মহামহিম মহারাজাধিরাজকে কী বলিয়া ডাকিতে হইবে। হুজুর, জনাব, জাঁহাপনা, শাহেন্ শা—"

রাজধর তাঁহার স্বাভাবিক কর্কশ স্বর দ্বিগুণ কর্কশ করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার ছাত্র বটে, কিন্তু আমি রাজকুমার—তাহা তোমার মনে নাই!"

ইশা খাঁ তীব্রস্বরে কহিলেন, "বস্! চুপ! আর অধিক কথা কহিয়ো না। আমার অন্য কাজ আছে।"

বলিয়া পুনরায় তীরের ফলার প্রতি মন দিলেন।

এমন সময় ত্রিপুরার দ্বিতীয় রাজপুত্র ইন্দ্রকুমার তাঁহার দীর্ঘ প্রশস্ত বিপুল বলিষ্ঠ দেহ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। মাথা হেলাইয়া হাসিয়া বলিলেন, "খাঁ-সাহেব, আজিকার ব্যাপারটা কী।"

ইন্দ্রকুমারের কণ্ঠ শুনিয়া বৃদ্ধ ইশা খাঁ তীরের ফলা রাখিয়া সস্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন; হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শোনো তো বাবা, বড়ো তামাসার কথা। তোমার এই কনিষ্ঠটিকে, মহারাজচক্রবর্তীকে, জাঁহাপনা জনাব বলিয়া না ডাকিলে উঁহার অপমান বোধ হয়!"

বলিয়া আবার তীরের ফলা লইয়া পড়িলেন।

"সত্য নাকি!"—বলিয়া ইন্দ্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রাজধর বিষম ক্রোধে বলিলেন, "চুপ করো দাদা!"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "রাজধর, তোমাকে কী বলিয়া ডাকিতে হইবে। জাঁহাপনা! হা হা হা হা!"

রাজধর কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "দাদা, চুপ করো বলিতেছি।"

ইন্দ্রকুমার আবার হাসিয়া বলিলেন, "জনাব!"

রাজধর অধীর হইয়া বলিলেন, "দাদা, তুমি নিতান্ত নির্বোধ।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া রাজধরের পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "ঠাণ্ডা হও ভাই, ঠাণ্ডা হও। তোমার বুদ্ধি তোমার থাক্, আমি তোমার বুদ্ধি কাড়িয়া লইতেছি না।"

ঈশা খাঁ কাজ করিতে করিতে আড়চোখে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "উঁহার বুদ্ধি সম্প্রতি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "নাগাল পাওয়া যায় না!"

রাজধর গস্ গস্ করিয়া চলিয়া গেলেন। চলনের দাপে খাপের মধ্যে তলোয়ারখানা ঝন্ ঝন্ করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজকুমার রাজধরের বয়স উনিশ বৎসর। শ্যামবর্ণ, বেঁটে, দেহের গঠন বলিষ্ঠ। সেকালে অন্য রাজপুত্রেরা যেমন বড়ো বড়ো চুল রাখিতেন, ইঁহার তেমন ছিল না। ইঁহার সোজা সোজা মোটা চুল ছোটো করিয়া ছাঁটা। ছোটো ছোটো চোখ, তীক্ষ্ন দৃষ্টি। দাঁতগুলি কিছু বড়ো। গলার আওয়াজ ছেলেবেলা হইতেই কেমন কর্কশ। রাজধরের বুদ্ধি অত্যন্ত বেশি এইরূপ সকলের বিশ্বাস, তাঁহার নিজের বিশ্বাসও তাই। এই বুদ্ধির বলে তিনি আপনার দুই দাদাকে অত্যন্ত হেয়জ্ঞান করিতেন। রাজধরের প্রবল প্রতাপে বাড়িসুদ্ধ সকলে অস্থির। আবশ্যক থাক্ না-থাক্, একখানা তলোয়ার মাটিতে ঠুকিয়া ঠুকিয়া তিনি বাড়িময় কর্তৃত্ব করিয়া বেড়ান। রাজবাটীর চাকর-বাকরেরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া, মহারাজ বলিয়া, হাত জোড় করিয়া, সেলাম করিয়া, প্রণাম করিয়া, কিছুতে নিস্তার পায় না। সকল জিনিসেই তাঁহার হাত, সকল জিনিসই তিনি নিজে দখল করিতে চান। সে বিষয়ে তাঁহার চক্ষুলজ্জাটুকু পর্যন্ত নাই। একবার যুবরাজ চন্দ্রনারায়ণের একটা ঘোড়া তিনি রীতিমত দখল করিয়াছিলেন; দেখিয়া যুবরাজ ঈষৎ হাসিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। আর একবার কুমার ইন্দ্রকুমারের রুপার-পাত-লাগানো একটা ধনুক অম্লানবদনে অধিকার করিয়াছিলেন; ইন্দ্রকুমার চটিয়া বলিলেন, 'দেখো, যে জিনিস লইয়াছ উহা আমি আর ফিরাইয়া লইতে চাহি না, কিন্তু ফের যদি তুমি আমার জিনিসে হাত দাও তবে আমি এমন করিয়া দিব যে, ও হাতে আর জিনিস তুলিতে পারিবে না।' কিন্তু রাজধর দাদাদের কথা বড়ো গ্রাহ্য করিতেন না। লোকে তাঁহার আচরণ দেখিয়া আড়ালে বলিত, 'ছোটোকুমারের রাজার ঘরে জন্ম বটে, কিন্তু রাজার ছেলের মতো কিছুই দেখি না।'

কিন্তু মহারাজ অমরমাণিক্য রাজধরকে কিছু বেশি ভালোবাসিতেন। রাজধর তাহা জানিতেন। আজ পিতার কাছে গিয়া ঈশা খাঁর নামে নালিশ করিলেন।

রাজা ঈশা খাঁকে ডাকাইয়া আনিলেন। বলিলেন, "সেনাপতি, রাজকুমারদের এখন বয়স হইয়াছে। এখন উঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান করা উচিত।"

"মহারাজ বাল্যকালে যখন আমার কাছে যুদ্ধ শিক্ষা করিতেন, তখন মহা-

রাজকে যেরূপ সম্মান করিতাম—রাজকুমারগণকে তাহা অপেক্ষা কম সম্মান করি না।"

রাজধর বলিলেন, "আমার অনুরোধ, তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়ো না।"

ইশা খাঁ বিদ্যুদ্‌বেগে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "চুপ করো বৎস। আমি তোমার পিতার সহিত কথা কহিতেছি। মহারাজ, মার্জনা করিবেন, আপনার এ কনিষ্ঠ পুত্রটি রাজপরিবারের উপযুক্ত হয় নাই। ইহার হাতে তলোয়ার শোভা পায় না। এ বড়ো হইলে মুন্‌শির মতো কলম চালাইতে পারিবে—আর কোনো কাজে লাগিবে না।"

এমন সময়ে চন্দ্রনারায়ণ ও ইন্দ্রকুমার সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইশা খাঁ তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চাহিয়া দেখুন মহারাজ, এই তো যুবরাজ বটে! এই তো রাজপুত্র বটে!"

রাজা রাজধরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রাজধর, খাঁ-সাহেব কী বলিতেছেন। তুমি অস্ত্রবিদ্যায় উঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারো নাই?"

রাজধর বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করুন—পরীক্ষায় যদি আমি সর্বশ্রেষ্ঠ না হই তবে আমাকে পরিত্যাগ করিবেন। আমি রাজবাটী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।"

রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, আগামী সপ্তাহে পরীক্ষা হইবে। তোমাদের মধ্যে যিনি উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাকে আমার হীরকখচিত তলোয়ার পুরস্কার দিব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রকুমার ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ ছিলেন। শুনা যায় একবার তাঁহার এক অনুচর প্রাসাদের ছাদের উপর হইতে একটা মোহর নীচে ফেলিয়া দেয়, সেই মোহর মাটিতে পড়িতে না পড়িতে তীর মারিয়া কুমার তাহাকে শত হাত দূরে ফেলিয়াছিলেন।—রাজধর রাগের মাথায় পিতার সম্মুখে দম্ভ করিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু মনের ভিতর বড়ো ভাবনা পড়িয়া গেল। যুবরাজ চন্দ্রনারায়ণের জন্য বড়ো ভাবনা নাই, তীর ছোঁড়া বিদ্যা তাঁহার ভালো আসিত না, কিন্তু ইন্দ্রকুমারের সঙ্গে আঁটিয়া উঠা দায়। রাজধর অনেক ভাবিয়া অবশেষে একটা ফন্দি ঠাওরাইলেন। হাসিয়া মনে-মনে বলিলেন, 'তীর ছুঁড়িতে পারি না-পারি, আমার বুদ্ধি তীরের মতো—তাহাতে সকল লক্ষ্যই ভেদ হয়।'

কাল পরীক্ষার দিন। যে জায়গাতে পরীক্ষা হইবে, যুবরাজ, ইশা খাঁ ও ইন্দ্রকুমার সেই জমি তদারক করিতে গিয়াছেন। রাজধর আসিয়া বলিলেন, "দাদা, আজ পূর্ণিমা আছে—আজ রাত্রে যখন বাঘ গোমতী নদীতে জল খাইতে আসিবে, তখন নদীতীরে বাঘ-শিকার করিতে গেলে হয় না?"

ইন্দ্রকুমার আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "কী আশ্চর্য। রাজধরের যে আজ শিকারে প্রবৃত্তি হইল। এমন তো কখনও দেখা যায় না।"

ইশা খাঁ রাজধরের প্রতি ঘৃণার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "উনি আবার শিকারী নন? উনি জাল পাতিয়া ঘরের মধ্যে শিকার করেন। উঁহার বড়ো ভয়ানক

শিকার। রাজসভায় একটি জীব নাই যে উঁহার ফাঁদে একবার-না-একবার না পড়িয়াছে।"

চন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন, কথাটা রাজধরের মনে লাগিয়াছে ; ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "সেনাপতি-সাহেব, তোমার তলোয়ারও যেমন তোমার কথাও তেমনি, উভয়ই শাণিত—যাহার উপরে গিয়া পড়ে তাহার মর্মচ্ছেদ করে।"

রাজধর হাসিয়া বলিলেন, "না দাদা, আমার জন্য বেশি ভাবিয়ো না। খাঁ-সাহেব অনেক শান দিয়া কথা কহেন বটে, কিন্তু আমার কানের মধ্যে পালকের মতো প্রবেশ করে।"

ইশা খাঁ হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া পাকা গোঁফে চাড়া দিয়া বলিলেন, "তোমার কান আছে নাকি। তা যদি থাকিত তাহা হইলে এতদিনে তোমাকে সিধা করিতে পারিতাম।"

বৃদ্ধ ইশা খাঁ কাহাকেও বড়ো মান্য করিতেন না।

ইন্দ্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। চন্দ্রনারায়ণ গম্ভীর হইয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না। যুবরাজ বিরক্ত হইয়াছেন বুঝিয়া ইন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ হাসি থামাইয়া তাঁহার কাছে গেলেন ; মৃদুভাবে বলিলেন, "দাদা, তোমার কী মত। আজ রাত্রে শিকার করিতে যাইবে কি।"

চন্দ্রনারায়ণ কহিলেন, "তোমার সঙ্গে ভাই, শিকার করিতে যাওয়া মিথ্যা—তাহা হইলে নিতান্ত নিরামিষ শিকার করিতে হয়। তুমি বনে গিয়া যত জন্তু মারিয়া আনো, আর আমরা কেবল লাউ কুমড়া কচু কাঁঠাল শিকার করিয়া আনি।"

ইশা খাঁ পরম হৃষ্ট হইয়া হাসিতে লাগিলেন ; সস্নেহে ইন্দ্রকুমারের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "যুবরাজ ঠিক কথা বলিতেছেন পুত্র! তোমার তীর সকলের আগে গিয়া ছোটে এবং নির্ঘাত গিয়া লাগে। তোমার সঙ্গে কে পারিয়া উঠিবে!"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "না না দাদা, ঠাট্টা নয়—যাইতে হইবে। তুমি না গেলে কে শিকার করিতে যাইবে!"

যুবরাজ বলিলেন, "আচ্ছা, চলো। আজ রাজধরের শিকারের ইচ্ছা হইয়াছে উঁহাকে নিরাশ করিব না।"

সহাস্য ইন্দ্রকুমার চকিতের মধ্যে ম্লান হইয়া বলিলেন, "কেন দাদা, আমার ইচ্ছা হইয়াছে বলিয়া কি যাইতে নাই।"

চন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "সেকি কথা ভাই, তোমার সঙ্গে তো রোজই শিকারে যাইতেছি"—

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "তাই সেটা পুরাতন হইয়া গেছে!"

চন্দ্রনারায়ণ বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, ' তুমি আমার কথা এমন করিয়া ভুল বুঝিলে বড়ো ব্যথা লাগে।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না দাদা, আমি ঠাট্টা করিতেছিলাম। শিকারে যাইব না তো কী! চলো, তার আয়োজন করি গে।"

ইশা খাঁ মনে-মনে কহিলেন, 'ইন্দ্রকুমার বুকে দশটা বাণ সহিতে পারে, কিন্তু দাদার একটু সামান্য অনাদর সহিতে পারে না।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিকারের বন্দোবস্ত সমস্ত স্থির হইলে পরে রাজধর আস্তে আস্তে ইন্দ্রকুমারের স্ত্রী কমলাদেবীর কক্ষে গিয়া উপস্থিত। কমলাদেবী হাসিয়া বলিলেন, "এ কী ঠাকুরপো! একেবারে তীরধনুক বর্মচর্ম লইয়া যে! আমাকে মারিবে নাকি!"

রাজধর বলিলেন, "ঠাকুরানী, আমরা আজ তিন ভাই শিকার করিতে যাইব, তাই এই বেশ।"

কমলাদেবী আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "তিন ভাই! তুমিও যাইবে নাকি। আজ তিন ভাই একত্র হইবে! এ তো ভালো লক্ষণ নয়। এ যে ত্র্যহস্পর্শ হইল।"

যেন বড়ো ঠাট্টা হইল এইভাবে রাজধর হা হা করিয়া হাসিলেন, কিন্তু বিশেষ কিছু বলিলেন না।

কমলাদেবী কহিলেন, "না না, তাহা হইবে না—রোজ রোজ শিকার করিতে যাইবেন আর আমি ঘরে বসিয়া ভাবিয়া মরি।"

রাজধর কহিলেন, "আজ আবার রাত্রে শিকার।"

কমলাদেবী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সে কখনোই হইবে না। দেখিব আজ কেমন করিয়া যান।"

রাজধর বলিলেন, "ঠাকুরানী, এক কাজ করো, ধনুকবাণগুলি লুকাইয়া রাখো।"

কমলাদেবী কহিলেন, "কোথায় লুকাইব।"

রাজধর। আমার কাছে দাও, আমি লুকাইয়া রাখিব।

কমলাদেবী হাসিয়া কহিলেন, "মন্দ কথা নয়। সে বড়ো রঙ্গ হইবে।"

কিন্তু মনে-মনে বলিলেন, 'তোমার একটা কী মতলব আছে। তুমি যে কেবল আমার উপকার করিতে আসিয়াছ তাহা বোধ হয় না।'

"এসো, অস্ত্রশালায় এসো" বলিয়া কমলাদেবী রাজধরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। চাবি লইয়া ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালার দ্বার খুলিয়া দিলেন। রাজধর যেমন ভিতরে প্রবেশ করিলেন অমনি কমলাদেবী দ্বারে তালা লাগাইয়া দিলেন। রাজধর ঘরের মধ্যে বন্ধ হইয়া রহিলেন। কমলাদেবী বাহির হইতে হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, আমি তবে আজ আসি।"

বলিয়া চলিয়া গেলেন।

এ দিকে সন্ধ্যার সময় ইন্দ্রকুমার অন্তঃপুরে আসিয়া অস্ত্রশালার চাবি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছেন না। কমলাদেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁগা, আমাকে খুঁজিতেছ বুঝি, আমি তো হারাই নাই।"

শিকারের সময় বহিয়া যায় দেখিয়া ইন্দ্রকুমার দ্বিগুণ ব্যস্ত হইয়া খোঁজ করিতে লাগিলেন। কমলাদেবী তাঁহাকে বাধা দিয়া আবার তাঁহার মুখের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন; হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁগা, দেখিতে কি পাও না। চোখের সম্মুখে, তবু ঘরময় বেড়াইতেছ?"

ইন্দ্রকুমার কিঞ্চিৎ কাতরস্বরে কহিলেন, "দেবী, এখন বাধা দিয়ো না—আমার একটা বড়ো আবশ্যকের জিনিস হারাইয়াছে।"

কমলা কহিলেন, "আমি জানি তোমার কী হারাইয়াছে, আমার একটি কথা যদি

রাখ তো খুঁজিয়া দিতে পারি।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "আচ্ছা, রাখিব।"

কমলাদেবী বলিলেন, "তবে শোনো। আজ তুমি শিকার করিতে যাইতে পারিবে না। এই লও তোমার চাবি।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "সে হয় না, এ কথা রাখিতে পারি না।"

কমলাদেবী বলিলেন, "চন্দ্রবংশে জন্মিয়া এই বুঝি তোমার আচরণ! একটা সামান্য প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারো না?"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার কথাই রহিল। আজ আমি শিকারে যাইব না।"

কমলাদেবী। তোমাদের আর কিছু হারাইয়াছে? মনে করিয়া দেখো দেখি।

ইন্দ্রকুমার। কই, মনে পড়ে না তো।

কমলাদেবী। তোমাদের সাত-রাজার-ধন মানিক? তোমাদের সোনার চাঁদ?

ইন্দ্রকুমার মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন। কমলাদেবী কহিলেন, "তবে এসো, দ্যাখো-'সে।"

বলিয়া অস্ত্রশালার দ্বারে গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। কুমার দেখিলেন, রাজধর ঘরের মেঝেতে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন ; দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন— "এ কী, রাজধর অস্ত্রশালায় যে!"

কমলাদেবী বলিলেন, "উনি আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "তা বটে, উনি সকল অস্ত্রের চেয়ে তীক্ষ্ণ।"

রাজধর মনে-মনে বলিলেন, 'তোমাদের জিহ্বার চেয়ে নয়।' রাজধর ঘর হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলেন।

তখন কমলাদেবী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "না কুমার, তুমি শিকার করিতে যাও। আমি তোমার সত্য ফিরাইয়া লইলাম।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "শিকার করিব? আচ্ছা।"

বলিয়া ধনুকে তীর যোজনা করিয়া অতি ধীরে কমলাদেবীর দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তীর তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল ; কুমার বলিলেন, "আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল।"

কমলাদেবী বলিলেন, "না, পরিহাস না। তুমি শিকারে যাও।"

ইন্দ্রকুমার কিছু বলিলেন না। ধনুর্বাণ ঘরের মধ্যে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। যুবরাজকে বলিলেন, "দাদা, আজ শিকারের সুবিধা হইল না।"

চন্দ্রনারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আজ পরীক্ষার দিন। রাজবাটীর বাহিরের মাঠে বিস্তর লোক জড়ো হইয়াছে। রাজার ছত্র ও সিংহাসন প্রভাতের আলোতে ঝকঝক্ করিতেছে। জায়গাটা পাহাড়ে, উঁচুনিচু—লোকে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, চারি দিকে যেন মানুষের মাথার ঢেউ উঠিয়াছে। ছেলেগুলো গাছের উপর চড়িয়া বসিয়াছে। একটা ছেলে গাছের ডাল

হইতে আস্তে আস্তে হাত বাড়াইয়া একজন মোটা মানুষের মাথা হইতে পাগড়ি তুলিয়া আর-একজনের মাথায় পরাইয়া দিয়াছে। যাহার পাগড়ি সে ব্যক্তি চটিয়া ছেলেটাকে গ্রেফতার করিবার জন্য নিষ্ফল প্রয়াস পাইতেছে, অবশেষে নিরাশ হইয়া সজোরে গাছের ডাল নাড়া দিতেছে, ছোঁড়াটা মুখভঙ্গি করিয়া ডালের উপর বাঁদরের মতো নাচিতেছে। মোটা মানুষের দুর্দশা ও রাগ দেখিয়া সে দিকে একটা হো-হো হাসি পড়িয়া গিয়াছে। একজন এক-হাঁড়ি দই মাথায় করিয়া বাড়ি যাইতেছিল, পথে জনতা দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল—হঠাৎ দেখে তাহার মাথায় হাঁড়ি নাই, হাঁড়িটা মুহূর্তের মধ্যে হাতে হাতে কত দূর চলিয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই—দইওয়ালা খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। একজন বলিল, 'ভাই, তুমি দইয়ের বদলে ঘোল খাইয়া গেলে, কিঞ্চিৎ লোকসান হইল বৈ তো নয়।' দইওয়ালা পরম সান্ত্বনা পাইয়া গেল। হারু নাপিতের 'পরে গাঁ-সুদ্ধ লোক চটা ছিল। তাহাকে ভিড়ের মধ্যে দেখিয়া লোকে তাহার নামে ছড়া কাটিতে লাগিল। সে যত খেপিতে লাগিল খেপাইবার দল তত বাড়িয়া উঠিল—চারি দিকে চটাপট্ হাততালি পড়িতে লাগিল। আটাম্ন প্রকার আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল। সে ব্যক্তি মুখ চক্ষু লাল করিয়া, চটিয়া, গলদঘর্ম হইয়া, চাদর ভূমিতে লুটাইয়া, একপাটি চটিজুতা ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া, বিশ্বের লোককে অভিশাপ দিতে দিতে বাড়ি ফিরিয়া গেল। ঠাসাঠাসি ভিড়ের মাঝে মাঝে এক-একটা ছোটো ছেলে আত্মীয়ের কাঁধের উপর চড়িয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। এমন কত জায়গায় কত কলরব উঠিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। হঠাৎ নহবৎ বাজিয়া উঠিল। সমস্ত কোলাহল ভাসাইয়া দিয়া জয়-জয় শব্দে আকাশ প্লাবিত হইয়া গেল। কোলের ছেলে যতগুলা ছিল ভয়ে সমস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় কুকুরগুলো ঊর্ধ্বমুখ হইয়া খেউ খেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। পাখি যেখানে যত ছিল ভয়ে গাছের ডাল ছাড়িয়া আকাশে উড়িল। কেবল গোটাকতক বুদ্ধিমান কাক সুদূরে গাম্ভারী গাছের ডালে বসিয়া দক্ষিণে ও বামে ঘাড় হেলাইয়া একাগ্রচিত্তে অনেক বিবেচনা করিতে লাগিল এবং একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ অসন্দিগ্ধচিত্তে কা কা করিয়া ডাকিয়া উঠিতে লাগিল।

রাজা আসিয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন। পাত্রমিত্র সভাসদ্‌গণ আসিয়াছেন। রাজকুমারগণ ধনুর্বাণ হস্তে আসিয়াছেন। নিশান লইয়া নিশানধারী আসিয়াছে। ভাট আসিয়াছে। সৈন্যগণ পশ্চাতে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাজনদারগণ মাথা নাড়াইয়া, নাচিয়া, সবলে পরমোৎসাহে ঢোল পিটাইতেছে। মহা ধুম পড়িয়া গিয়াছে। পরীক্ষার সময় যখন হইল, ঈশা খাঁ রাজকুমারগণকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন। ইন্দ্রকুমার যুবরাজকে কহিলেন, "দাদা, আজ তোমাকে জিতিতে হইবে, তাহা না হইলে চলিবে না।"

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, "চলিবে না তো কী! আমার একটা ক্ষুদ্র তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেও জগৎসংসার যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিবে। আর যদিই-বা না চলিত তবু আমার জিতিবার কোনো সম্ভাবনা দেখিতেছি না।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "দাদা, তুমি যদি হারো তো আমিও ইচ্ছাপূর্বক লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব।"

যুবরাজ ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া কহিলেন, "না ভাই, ছেলেমানুষি করিয়ো না—

ওস্তাদের নাম রক্ষা করিতে হইবে।"

রাজধর বিবর্ণ শুষ্ক চিন্তাকুল মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ইশা খাঁ আসিয়া কহিলেন, "যুবরাজ, সময় হইয়াছে, ধনুক গ্রহণ করো।"

যুবরাজ দেবতার নাম করিয়া ধনুক গ্রহণ করিলেন। প্রায় দুই শত হাত দূরে গোটা পাঁচ-ছয় কলাগাছের গুঁড়ি একত্র বাঁধিয়া স্থাপিত হইয়াছে। মাঝে একটা কচুর পাতা চোখের মতো করিয়া বসানো আছে। তাহার ঠিক মাঝখানে চোখের তারার আকারে কালো চিহ্ন অঙ্কিত। সেই চিহ্নই লক্ষ্যস্থল। দর্শকেরা অর্ধচন্দ্র আকারে মাঠ ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—যে দিকে লক্ষ্য স্থাপিত সে দিকে যাওয়া নিষেধ।

যুবরাজ ধনুকে বাণ যোজনা করিলেন। লক্ষ স্থির করিলেন। বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বাণ লক্ষ্যের উপর দিয়া চলিয়া গেল। ইশা খাঁ তাঁহার গোঁফ-সুদ্ধ দাড়ি-সুদ্ধ মুখ বিকৃত করিলেন, পাকা ভুরু কুঞ্চিত করিলেন। কিন্তু কিছু বলিলেন না। ইন্দ্রকুমার বিষণ্ণ হইয়া এমন ভাব ধারণ করিলেন যেন তাঁহাকেই লজ্জিত করিবার জন্য দাদা ইচ্ছা করিয়া এই কীর্তিটি করিলেন। অস্থিরভাবে ধনুক নাড়িতে নাড়িতে ইশা খাঁকে বলিলেন, "দাদা মন দিলেই সমস্ত পারেন, কিন্তু কিছুতেই মন দেন না।"

ইশা খাঁ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার দাদার বুদ্ধি আর সকল জায়গাতেই খেলে, কেবল তীরের আগায় খেলে না ; তাহার কারণ, বুদ্ধি তেমন সূক্ষ্ম নয়।"

ইন্দ্রকুমার ভারি চটিয়া একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন। ইশা খাঁ বুঝিতে পারিয়া দ্রুত সরিয়া গিয়া রাজধরকে বলিলেন, "কুমার, এবার তুমি লক্ষ্যভেদ করো, মহারাজা দেখুন।"

রাজধর বলিলেন, "আগে দাদার হউক।"

ইশা খাঁ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "এখন উত্তর করিবার সময় নয়। আমার আদেশ পালন করো।"

রাজধর চটিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। ধনুর্বাণ তুলিয়া লইলেন। লক্ষ স্থির করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তীর মাটিতে বিদ্ধ হইল। যুবরাজ রাজধরকে কহিলেন, "তোমার বাণ অনেকটা নিকটে গিয়াছে ; আর-একটু হইলেই লক্ষ্য বিদ্ধ হইত।"

রাজধর অম্লানবদনে কহিলেন, "লক্ষ্য তো বিদ্ধ হইয়াছে, দূর হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না।"

যুবরাজ কহিলেন, "না রাজধর, তোমার দৃষ্টির ভ্রম হইয়াছে, লক্ষ্য বিদ্ধ হয় নাই।"

রাজধর কহিলেন, "হাঁ, বিদ্ধ হইয়াছে। কাছে গেলেই দেখা যাইবে।"

যুবরাজ আর কিছু বলিলেন না।

অবশেষে ইশা খাঁর আদেশক্রমে ইন্দ্রকুমার নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে ধনুক তুলিয়া লইলেন। যুবরাজ তাঁহার কাছে গিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "ভাই, আমি অক্ষম—আমার উপর রাগ করা অন্যায়—তুমি যদি আজ লক্ষ্য ভেদ করিতে না পারো, তবে তোমার ভ্রষ্টলক্ষ্য তীর আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিবে ইহা নিশ্চয় জানিয়ো।"

ইন্দ্রকুমার যুবরাজের পদধূলি লইয়া কহিলেন, "দাদা, তোমার আশীর্বাদে আজ লক্ষ্যভেদ করিব, ইহার অন্যথা হইবে না।"

ইন্দ্রকুমার তীর নিক্ষেপ করিলেন, লক্ষ্য বিদ্ধ হইল। বাজনা বাজিল। চারি দিকে জয়ধ্বনি উঠিল। যুবরাজ যখন ইন্দ্রকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন, আনন্দে ইন্দ্রকুমারের চক্ষু ছল্‌ ছল্‌ করিয়া আসিল ; ইশা খাঁ পরম স্নেহে কহিলেন, "পুত্র, আল্লার কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া থাকো।"

মহারাজা যখন ইন্দ্রকুমারকে পুরস্কার দিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে রাজধর গিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনাদের ভ্রম হইয়াছে। আমার তীর লক্ষ্যভেদ করিয়াছে।"

মহারাজ কহিলেন, "কখনোই না।"

রাজধর কহিলেন, "মহারাজ, কাছে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন।"

সকলে লক্ষ্যের কাছে গেলেন। দেখিলেন, যে তীর মাটিতে বিদ্ধ তাহার ফলায় ইন্দ্রকুমারের নাম খোদিত, আর যে তীর লক্ষ্যে বিদ্ধ তাহাতে রাজধরের নাম ক্ষোদিত।

রাজধর কহিলেন, "বিচার করুন মহারাজ!"

ইশা খাঁ কহিলেন, "নিশ্চয়ই তূণ বদল হইয়াছে।"

কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, তূণ বদল হয় নাই। সকলে পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন।

ইশা খাঁ কহিলেন, "পুনর্বার পরীক্ষা করা হউক।"

রাজধর বিষম অভিমান করিয়া কহিলেন, "তাহাতে আমি সম্মত হইতে পারি না। আমার প্রতি এ বড়ো অন্যায় অবিশ্বাস। আমি তো পুরস্কার চাই না, মধ্যমকুমার-বাহাদুরকে পুরস্কার দেওয়া হউক।"

বলিয়া পুরস্কারের তলোয়ার ইন্দ্রকুমারের দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন।

ইন্দ্রকুমার দারুণ ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ধিক্‌! তোমার হাত হইতে এ পুরস্কার গ্রাহ্য করে কে। এ তুমি লও।"

বলিয়া তলোয়ারখানা ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া রাজধরের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। রাজধর হাসিয়া নমস্কার করিয়া তাহা তুলিয়া লইলেন।

তখন ইন্দ্রকুমার কম্পিতস্বরে পিতাকে কহিলেন, "মহারাজ, আরাকানপতির সহিত শীঘ্রই যুদ্ধ হইবে। সেই যুদ্ধে গিয়া আমি পুরস্কার আনিব। মহারাজ, আদেশ করুন।"

ইশা খাঁ ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া কঠোরস্বরে কহিলেন, "তুমি আজ মহারাজের অপমান করিয়াছ। উঁহার তলোয়ার লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছ। ইহার সমুচিত শাস্তি আবশ্যক।"

ইন্দ্রকুমার সবলে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, "বৃদ্ধ, আমাকে স্পর্শ করিয়ো না।"

বৃদ্ধ ইশা খাঁ সহসা বিষন্ন হইয়া রুদ্ধ স্বরে কহিলেন, "পুত্র, একি পুত্র! আমার 'পরে এই ব্যবহার! তুমি আজ আত্মবিস্মৃত হইয়াছ বৎস!"

ইন্দ্রকুমারের চোখে জল উথলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "সেনাপতিসাহেব, আমাকে মাপ করো, আমি আজ যথার্থই আত্মবিস্মৃত হইয়াছি।"

যুবরাজ স্নেহের স্বরে কহিলেন, "শান্ত হও, ভাই—গৃহে ফিরিয়া চলো।"

ইন্দ্রকুমার পিতার পদধূলি লইয়া কহিলেন, "পিতা। অপরাধ মার্জনা করুন।"

গৃহে ফিরিবার সময় যুবরাজকে কহিলেন, “দাদা, আজ আমার যথার্থই পরাজয় হইয়াছে।”

রাজধর যে কেমন করিয়া জিতিলেন তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজধর পরীক্ষাদিনের পূর্বে যখন কমলাদেবীর সাহায্যে ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখনই ইন্দ্রকুমারের তূণ হইতে ইন্দ্রকুমারের নামাঙ্কিত একটি তীর নিজের তূণে তুলিয়া লইয়াছিলেন এবং নিজের নামাঙ্কিত তীর ইন্দ্রকুমারের তূণে এমন স্থানে এমনভাবে স্থাপিত করিয়াছিলেন, যাহাতে সেইটিই সহজে ও সর্বাগ্রে তাঁহার হাতে উঠিতে পারে। রাজধর যাহা মনে করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। ইন্দ্রকুমার দৈবক্রমে রাজধরের স্থাপিত তীরই তুলিয়া লইয়াছিলেন— সেই জন্যই পরীক্ষাস্থলে এমন গোলমাল হইয়াছিল। কালক্রমে যখন সমস্ত শান্তভাব ধারণ করিল তখন ইন্দ্রকুমার রাজধরের চাতুরী কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা আর কাহাকেও কিছু বলিলেন না— কিন্তু রাজধরের প্রতি তাঁহার ঘৃণা আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

ইন্দ্রকুমার মহারাজের কাছে বার বার বলিতে লাগিলেন, “মহারাজ, আরাকান-পতির সহিত যুদ্ধে আমাদিগকে পাঠান।”

মহারাজ অনেক বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

আমরা যে সময়ের গল্প বলিতেছি সে আজ প্রায় তিন শো বৎসরের কথা। তখন ত্রিপুরা স্বাধীন ছিল এবং চট্টগ্রাম ত্রিপুরার অধীন ছিল। আরাকান চট্টগ্রামের সংলগ্ন। আরাকানপতি মাঝে মাঝে চট্টগ্রাম আক্রমণ করিতেন। এই জন্য আরাকানের সঙ্গে ত্রিপুরার মাঝে মাঝে বিবাদ বাধিত। অমরমাণিক্যের সহিত আরাকানপতির সম্প্রতি সেইরূপ একটি বিবাদ বাধিয়াছে। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া ইন্দ্রকুমার যুদ্ধে যাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। রাজা অনেক বিবেচনা করিয়া অবশেষে সম্মতি দিলেন। তিন ভাইয়ে পাঁচ হাজার করিয়া পনেরো হাজার সৈন্য লইয়া চট্টগ্রাম-অভিমুখে চলিলেন। ইশা খাঁ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া গেলেন।

কর্ণফুলি নদীর পশ্চিম ধারে শিবির স্থাপিত হইল। আরাকানের সৈন্য কতক নদীর ও পারে কতক এ পারে। আরাকানপতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া নদীর পর-পারে আছেন। এবং তাঁহার বাইশ হাজার সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আক্রমণের প্রতীক্ষায় নদীর পশ্চিম পারে অপেক্ষা করিয়া আছে।

যুদ্ধের ক্ষেত্র পর্বতময়। সমুখা-সমুখি দুই পাহাড়ের উপর দুই পক্ষের সৈন্য স্থাপিত হইয়াছে। উভয় পক্ষ যদি যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয় তবে মাঝের উপত্যকায় দুই সৈন্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে। পর্বতের চারি দিকে হরীতকী আমলকী শাল ও গাম্ভারীর বন। মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদের শূন্য গৃহ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা ঘর ছাড়িয়া পলাইয়াছে। মাঝে মাঝে শস্যক্ষেত্র। পাহাড়েরা সেখানে ধান কাপাস তরমুজ আলু একত্রে রোপণ করিয়া গিয়াছে। আবার এক-এক জায়গায়

জ্বালিয়া চাষারা এক-একটা পাহাড় সমস্ত দগ্ধ করিয়া কালো করিয়া রাখিয়াছে, বর্ষার পর সেখানে শস্যবপন হইবে। দক্ষিণে কর্ণফুলি, বামে দুর্গম পর্বত।

এইখানে প্রায় এক সপ্তাহকাল উভয় পক্ষ পরস্পরের আক্রমণ-প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। ইন্দ্রকুমার যুদ্ধের জন্য অস্থির হইয়াছেন, কিন্তু যুবরাজের ইচ্ছা বিপক্ষ পক্ষেরা আগে আসিয়া আক্রমণ করে। সেই জন্য বিলম্ব করিতেছেন—কিন্তু তাহারাও নড়িতে চাহে না, স্থির হইয়া আছে। অবশেষে আক্রমণ করাই স্থির হইল।

সমস্ত রাত্রি আক্রমণের আয়োজন চলিতে লাগিল। রাজধর প্রস্তাব করিলেন, "দাদা, তোমরা দুইজনে তোমাদের দশ হাজার সৈন্য লইয়া আক্রমণ করো। আমার পাঁচ হাজার হাতে থাক্, আবশ্যকের সময় কাজে লাগিবে।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন, "রাজধর তফাতে থাকিতে চান।"

যুবরাজ কহিলেন, "না, হাসির কথা নয়। রাজধরের প্রস্তাব আমার ভালো বোধ হইতেছে।"

ইশা খাঁও তাহাই বলিলেন। রাজধরের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল।

যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমারের অধীনে দশ হাজার সৈন্য পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইল। প্রত্যেক ভাগে দুই হাজার করিয়া সৈন্য রহিল। স্থির হইল, একেবারে শত্রুব্যূহের পাঁচ জায়গায় আক্রমণ করিয়া ব্যূহভেদ করিবার চেষ্টা করা হইবে। সর্বপ্রথম সারে ধানুকীরা রহিল, তার পরে তলোয়ার বর্শা প্রভৃতি লইয়া অন্য পদাতিকেরা রহিল এবং সর্বশেষে অশ্বারোহীরা সার বাঁধিয়া চলিল।

আরাকানের মগ সৈন্যেরা দীর্ঘ এক বাঁশবনের পশ্চাতে ব্যূহ রচনা করিয়াছিল। প্রথম দিনের আক্রমণে কিছুই হইল না। ত্রিপুরার সৈন্য ব্যূহ ভেদ করিতে পারিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় দিন সমস্তদিন নিষ্ফল যুদ্ধ-অবসানে রাত্রি যখন নিশীথ হইল, যখন উভয় পক্ষের সৈন্যেরা বিশ্রামলাভ করিতেছে, দুই পাহাড়ের উপর দুই শিবিরে স্থানে স্থানে কেবল এক-একটা আগুন জ্বলিতেছে, শৃগালেরা রণক্ষেত্রে ছিন্ন হস্ত পদ ও মৃত দেহের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া দলে দলে কাঁদিয়া উঠিতেছে—তখন শিবিরের দুই ক্রোশ দূরে রাজধর তাঁহার পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া সারবন্দী নৌকা বাঁধিয়া কর্ণফুলি নদীর উপরে নৌকার সেতু নির্মাণ করিয়াছেন। একটি মশাল নাই, শব্দ নাই, সেতুর উপর দিয়া অতি সাবধানে সৈন্য পার করিতেছেন। নীচে দিয়া যেমন অন্ধকারে নদীর স্রোত বহিয়া যাইতেছে তেমনি উপর দিয়া মানুষের স্রোত অবিচ্ছিন্ন বহিয়া যাইতেছে। নদীতে ভাঁটা পড়িয়াছে। পরপারের পর্বতময় দুর্গম পাড় দিয়া সৈন্যেরা অতি কষ্টে উঠিতেছে। রাজধরের প্রতি সৈন্যাধ্যক্ষ ইশা খাঁর আদেশ ছিল যে, রাজধর রাত্রিযোগে তাঁহার সৈন্যদের লইয়া নদী বাহিয়া উত্তর দিকে যাত্রা করিবেন—তীরে উঠিয়া বিপক্ষ সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগে লুক্কায়িত থাকিবেন। প্রভাতে যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার সম্মুখ ভাগে আক্রমণ করিবেন—বিপক্ষেরা যুদ্ধে শ্রান্ত

হইলে পর সংকেত পাইলে রাজধর সহসা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবেন। সেই-জন্যই এত নৌকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু রাজধর ইশা খাঁর আদেশ কই পালন করিলেন? তিনি তো সৈন্য লইয়া নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি আর-এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলেন নাই। তিনি নিঃশব্দে আরাকানের রাজার শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। চতুর্দিকে পর্বত, মাঝে উপত্যকা, রাজার শিবির তাহারই মাঝখানে অবস্থিত। শিবিরে নির্ভয়ে সকলে নিদ্রিত। মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা দেখিয়া দূর হইতে শিবিরের স্থান-নির্ণয় হইতেছে। পর্বতের উপর হইতে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া রাজধরের পাঁচ হাজার সৈন্য অতি সাবধানে উপত্যকার দিকে নামিতে লাগিল—বর্ষাকালে যেমন পর্বতের সর্বাঙ্গ দিয়া গাছের শিকড় ধুইয়া ঘোলা হইয়া জলধারা নামিতে থাকে—তেমনি পাঁচ সহস্র মানুষ, পাঁচ সহস্র তলোয়ার, অন্ধকারের ভিতর দিয়া গাছের নীচে দিয়া সহস্র পথে আঁকিয়া-বাঁকিয়া যেন নিম্নাভিমুখে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু শব্দ নাই, মন্দ গতি। সহসা পাঁচ সহস্র সৈন্যের ভীষণ চীৎকার উঠিল—ক্ষুদ্র শিবির যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং তাহার ভিতর হইতে মানুষগুলো কিল্‌কিল্‌ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কেহ মনে করিল দুঃস্বপ্ন, কেহ মনে করিল প্রেতের উৎপাত, কেহ কিছুই মনে করিতে পারিল না।

রাজা বিনা রক্তপাতে বন্দী হইলেন। রাজা বলিলেন, "আমাকে বন্দী করিলে বা বধ করিলে যুদ্ধের অবসান হইবে না। আমি বন্দী হইবামাত্র সৈন্যেরা আমার ভাই হামচুপামুকে রাজা করিবে। যুদ্ধ যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিবে। আমি বরঞ্চ পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিই, আমার বন্ধন মোচন করিয়া দিন।"

রাজধর তাহাতেই সম্মত হইলেন। আরাকানরাজ পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিলেন। একটি হস্তিদন্ত-নির্মিত মুকুট, পাঁচ শত মণিপুরি ঘোড়া ও তিনটে বড়ো হাতি উপহার দিলেন। এইরূপ নানা ব্যবস্থা করিতে করিতে প্রভাত হইল—বেলা হইয়া গেল। সুদীর্ঘ রাত্রে সমস্তই ভূতের ব্যাপার বলিয়া মনে হইয়াছিল, দিনের বেলা আরাকানের সৈন্যগণ আপনাদের অপমান স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিল। চারি দিকে বড়ো বড়ো পাহাড় সূর্যালোকে সহস্রচক্ষু হইয়া তাহাদিগের দিকে তাকাইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজধর আরাকানপতিকে কহিলেন, "আর বিলম্ব নয়, শীঘ্র যুদ্ধ নিবারণ করিবার এক আদেশপত্র আপনার সেনাপতির নিকট পাঠাইয়া দিন। ও পারে এতক্ষণে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেছে।"

কতকগুলি সৈন্য-সহিত দূতের হস্তে আদেশপত্র পাঠানো হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অতি প্রত্যুষেই, অন্ধকার দূর হইতে না হইতেই, যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার দুই ভাগে পশ্চিমে ও পূর্বে মগদিগকে আক্রমণ করিতে চলিয়াছেন। সৈন্যের অল্পতা লইয়া রূপনারায়ণ হাজারি দুঃখ করিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন—আর পাঁচ হাজার লইয়া আসিলেই ভাবনা ছিল না। ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "ত্রিপুরারির অনুগ্রহ যদি

হয় তবে এই কয় জন সৈন্য লইয়াই জিতিব, আর যদি না হয় তবে বিপদ আমাদের উপর দিয়াই যাক, ত্রিপুরাবাসী যত কম মরে ততই ভালো। কিন্তু হরের কৃপায় আজ আমরা জিতিবই।"

এই বলিয়া হর হর বোম্ বোম্ রব তুলিয়া কৃপাণ বর্শা লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বিপক্ষদের অভিমুখে ছুটিলেন— তাঁহার দীপ্ত উৎসাহ তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। গ্রীষ্মকালে দক্ষিনা বাতাসে খড়ের চালের উপর দিয়া আগুন যেমন ছোটে তাঁহার সৈন্যেরা তেমনি ছুটিতে লাগিল। কেহই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। বিপক্ষদের দক্ষিণ দিকের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। হাতাহাতি যুদ্ধ বাধিল। মানুষের মাথা ও দেহ কাটা শস্যের মতো শস্যক্ষেত্রের উপর গিয়া পড়িতে লাগিল। ইন্দ্রকুমারের ঘোড়া কাটা পড়িল। তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। রব উঠিল তিনি মারা পড়িয়াছেন। কুঠারাঘাতে এক মগ অশ্বারোহীকে অশ্বচ্যুত করিয়া ইন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ তাহার ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিলেন। রেকাবের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার রক্তাক্ত তলোয়ার আকাশে সূর্যালোকে উঠাইয়া বজ্রস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "হর হর বোম্ বোম্"— যুদ্ধের আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল।

এই-সকল ব্যাপার দেখিয়া মগদিগের বাম দিকের ব্যূহের সৈন্যগণ আক্রমণের প্রতীক্ষা না করিয়া সহসা বাহির হইয়া যুবরাজের সৈন্যের উপর গিয়া পড়িল। যুবরাজের সৈন্যেরা সহসা এরূপ আক্রমণপ্রত্যাশা করে নাই। তাহারা মুহূর্তের মধ্যে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তাহাদের নিজের অশ্ব নিজের পদাতিকের উপর গিয়া পড়িল, কোন্ দিকে যাইবে ঠিকানা পাইল না। যুবরাজ ও ইশা খাঁ অসম সাহসের সহিত সৈন্যদের সংযত করিয়া লইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। অদূরে রাজধরের সৈন্য লুক্কায়িত আছে কল্পনা করিয়া সংকেতস্বরূপে বার বার তূরীনিনাদ করিলেন, কিন্তু রাজধরের সৈন্যের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। ইশা খাঁ বলিলেন, "তাহাকে ডাকা বৃথা। সে শৃগাল, দিনের বেলা গর্ত হইতে বাহির হইবে না।"

ইশা খাঁ ঘোড়া হইতে মাটিতে লাফাইয়া পড়িলেন। পশ্চিম-মুখ করিয়া সত্বর নামাজ পড়িয়া লইলেন। মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া 'মরিয়া' হইয়া লড়িতে লাগিলেন। চারি দিকে মৃত্যু যতই ঘেরিতে লাগিল, দুর্দান্ত যৌবন ততই যেন তাঁহার দেহে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময় ইন্দ্রকুমার শত্রুদের এক অংশ সম্পূর্ণ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, যুবরাজের একদল অশ্বারোহী ছিন্নভিন্ন হইয়া পলাইতেছে, তিনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইলেন। বিদ্যুৎ-বেগে যুবরাজের সাহায্যার্থে আসিলেন, কিন্তু সে বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছুই কূল-কিনারা পাইলেন না। ঘূর্ণা বাতাসে মরুভূমির বালুকারাশি যেমন ঘুরিতে থাকে, উপত্যকার মাঝখানে যুদ্ধ তেমনি পাক খাইতে লাগিল। রাজধরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বার বার তূরীধ্বনি উঠিল, কিন্তু তাহার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

সহসা কী মন্ত্রবলে সমস্ত থামিয়া গেল, যে যেখানে ছিল স্থির হইয়া দাঁড়াইল —আহতের আর্তনাদ ও অশ্বের হ্রেষা ছাড়া আর শব্দ রহিল না। সন্ধির নিশান লইয়া লোক আসিয়াছে। মগের রাজা পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। হর হর বোম্

বোম্ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল। মগসৈন্যগণ আশ্চর্য হইয়া পরস্পরের মুখ চাহিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

রাজধর যখন জয়োপহার লইয়া আসিলেন তখন তাঁহার মুখে এত হাসি যে, তাঁহার ছোটো চোখ দুটা বিন্দুর মতো হইয়া পিট্ পিট্ করিতে লাগিল। হাতির দাঁতের মুকুট বাহির করিয়া ইন্দ্রকুমারকে দেখাইয়া কহিলেন, "এই দেখো, যুদ্ধের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই পুরস্কার পাইয়াছি।"

ইন্দ্রকুমার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "যুদ্ধ! যুদ্ধ তুমি কোথায় করিলে! এ পুরস্কার তোমার নহে। এ মুকুট যুবরাজ পরিবেন।"

রাজধর কহিলেন, "আমি জয় করিয়া আনিয়াছি; এ মুকুট আমি পরিব।"

যুবরাজ কহিলেন, "রাজধর ঠিক কথা বলিতেছেন, এ মুকুট রাজধরেরই প্রাপ্য।"

ঈশা খাঁ চটিয়া রাজধরকে বলিলেন, "তুমি মুকুট পরিয়া দেশে যাইবে! তুমি সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যুদ্ধ হইতে পলাইলে, এ কলঙ্ক একটা মুকুটে ঢাকা পড়িবে না। তুমি একটা ভাঙা হাঁড়ির কানা পরিয়া দেশে যাও, তোমাকে সাজিবে ভালো।"

রাজধর বলিলেন, "খাঁ-সাহেব, এখন তো তোমার মুখে খুব বোল ফুটিতেছে, কিন্তু আমি না থাকিলে তোমরা এতক্ষণে থাকিতে কোথায়।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "যেখানেই থাকি, যুদ্ধ ছাড়িয়া গর্তের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতাম না।"

যুবরাজ বলিলেন, "ইন্দ্রকুমার, তুমি অন্যায় বলিতেছ। সত্য কথা বলিতে কী রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের বিপদ হইত।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের কোনো বিপদ হইত না। রাজধর না থাকিলে এ মুকুট আমি যুদ্ধ করিয়া আনিতাম— রাজধর চুরি করিয়া আনিয়াছে। দাদা, এ মুকুট আনিয়া আমি তোমাকে পরাইয়া দিতাম, নিজে পরিতাম না।"

যুবরাজ মুকুট হাতে লইয়া রাজধরকে বলিলেন, "ভাই, তুমিই আজ জিতিয়াছ। তুমি না থাকিলে অল্প সৈন্য লইয়া আমাদের কী বিপদ হইত জানি না। এ মুকুট আমি তোমাকে পরাইয়া দিতেছি।"

বলিয়া রাজধরের মাথায় মুকুট পরাইয়া দিলেন।

ইন্দ্রকুমারের বক্ষ যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল— তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "দাদা, রাজধর শৃগালের মতো গোপনে রাত্রিযোগে চুরি করিয়া এই রাজমুকুট পুরস্কার পাইল; আর আমি যে প্রাণপণে যুদ্ধ করিলাম— তোমার মুখ হইতে একটা প্রশংসার বাক্যও শুনিতে পাইলাম না! তুমি কিনা বলিলে, রাজধর না থাকিলে কেহ তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত না। কেন দাদা, আমি কি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার চোখের সামনে যুদ্ধ করি নাই— আমি কি যুদ্ধ ছাড়িয়া পলাইয়া

গিয়াছিলাম— আমি কি কখনও ভীরুতা দেখাইয়াছি। আমি কি শত্রুসৈন্যকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া তোমার সাহায্যের জন্য আসি নাই। কী দেখিয়া তুমি বলিলে যে, তোমার পরম স্নেহের রাজধর ব্যতীত কেহ তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত না!"

যুবরাজ একান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "ভাই, আমি নিজের বিপদের কথা বলিতেছি না"—

কথা শেষ হইতে না হইতে অভিমানে ইন্দ্রকুমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ইশা খাঁ যুবরাজকে বলিলেন, "যুবরাজ, এ মুকুট তোমার কাহাকেও দিবার অধিকার নাই। আমি সেনাপতি, এ মুকুট আমি যাহাকে দিব তাহারই হইবে।" বলিয়া ইশা খাঁ রাজধরের মাথা হইতে মুকুট তুলিয়া যুবরাজের মাথায় দিতে গেলেন।

যুবরাজ সরিয়া গিয়া বলিলেন, "না, এ আমি গ্রহণ করিতে পারি না।"

ইশা খাঁ বলিলেন, "তবে থাক্। এ মুকুট কেহ পাইবে না।"

বলিয়া পদাঘাতে মুকুট কর্ণফুলি নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন, "রাজধর যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন— রাজধর শাস্তির যোগ্য।"

দশম পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রকুমার তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া আহতহৃদয়ে শিবির হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। যুদ্ধ অবসান হইয়া গিয়াছে, ত্রিপুরার সৈন্য শিবির তুলিয়া দেশে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে। এমন সময় সহসা এক ব্যাঘাত ঘটিল।

ইশা খাঁ যখন মুকুট কাড়িয়া লইলেন রাজধর মনে-মনে কহিলেন, 'আমি না থাকিলে তোমরা কেমন করিয়া উদ্ধার পাও একবার দেখিব।'

তাহার পরদিন রাজধর গোপনে আরাকানপতির শিবিরে এক পত্র পাঠাইয়া দিলেন। সেই পত্রে তিনি ত্রিপুরার সৈন্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদের সংবাদ দিয়া আরাকানপতিকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

ইন্দ্রকুমার যখন স্বতন্ত্র হইয়া সৈন্যসমেত স্বদেশাভিমুখে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং যুবরাজের সৈন্যেরা শিবির তুলিয়া গৃহের অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন, তখন সহসা মগেরা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিল— রাজধর সৈন্য লইয়া কোথায় সরিয়া পড়িলেন তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

যুবরাজের হতাবশিষ্ট তিন সহস্র সৈন্য প্রায় তাহার চতুর্গুণ মগসৈন্য-কর্তৃক হঠাৎ বেষ্টিত হইল। ইশা খাঁ যুবরাজকে বলিলেন, "আজ আর পরিত্রাণ নাই। যুদ্ধের ভার আমার উপর দিয়া তুমি পলায়ন করো।"

যুবরাজ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "পলাইলেও তো একদিন মরিতে হইবে।" চারি দিকে চাহিয়া বলিলেন— "পলাইবই বা কোথা! এখানে মরিবার যেমন সুবিধা পলাইবার তেমন সুবিধা নাই। হে ঈশ্বর, সকলই তোমারই ইচ্ছা।"

ইশা খাঁ বলিলেন, "তবে আইস, আজ সমারোহ করিয়া মরা যাক।"— বলিয়া প্রাচীরবৎ শত্রুসৈন্যের এক দুর্বল অংশ লক্ষ্য করিয়া সমস্ত সৈন্য বিদ্যুৎ-বেগে

ছুটাইয়া দিলেন। পলাইবার পথ রুদ্ধ দেখিয়া সৈন্যেরা উন্মত্তের ন্যায় লড়িতে লাগিল। ইশা খাঁ দুই হাতে দুই তলোয়ার লইলেন— তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে একটি লোক তিষ্ঠিতে পারিল না। যুদ্ধক্ষেত্রের এক স্থানে একটি ক্ষুদ্র উৎস উঠিতেছিল, তাহার জল রক্তে লাল হইয়া উঠিল।

ইশা খাঁ শত্রুর ব্যূহ ভাঙিয়া ফেলিয়া লড়িতে লড়িতে প্রায় পর্বতের শিখর পর্যন্ত উঠিয়াছেন, এমন সময় এক তীর আসিয়া তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। তিনি আল্লার নাম উচ্চারণ করিয়া ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া গেলেন।

যুবরাজের জানুতে এক তীর, পৃষ্ঠে এক তীর এবং তাঁহার বাহন হাতির পঞ্জরে এক তীর বিদ্ধ হইল। মাহুত হত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। হাতি যুদ্ধক্ষেত্র ফেলিয়া উন্মাদের মতো ছুটিতে লাগিল। যুবরাজ তাহাকে ফিরাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন, সে ফিরিল না। অবশেষে যন্ত্রণায় ও রক্তপাতে দুর্বল হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অনেক দূরে কর্ণফুলি নদীর তীরে হাতির পিঠ হইতে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আজ রাত্রে চাঁদ উঠিয়াছে। অন্য দিন রাত্রে যে সবুজ মাঠের উপরে চাঁদের আলো বিচিত্রবর্ণ ছোটো ছোটো বনফুলের উপর আসিয়া পড়িত, আজ সেখানে সহস্র সহস্র মানুষের হাত পা কাটা-মুণ্ডু ও মৃতদেহের উপর আসিয়া পড়িয়াছে— যে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ উৎসের জলে সমস্ত রাত ধরিয়া চন্দ্রের প্রতিবিম্ব নৃত্য করিত, সে উৎস মৃত অশ্বের দেহে প্রায় রুদ্ধ— তাহার জল রক্তে লাল হইয়া গেছে। কিন্তু দিনের বেলা মধ্যাহ্নের রৌদ্রে যেখানে মৃত্যুর ভীষণ উৎসব হইতেছিল, ভয় ক্রোধ নিরাশা হিংসা সহস্র হৃদয় হইতে অনবরত ফেনাইয়া উঠিতেছিল— অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্‌, উন্মাদের চীৎকার, আহতের আর্তনাদ, অশ্বের হ্রেষা, রণশঙ্খের ধ্বনিতে নীল আকাশ যেন মন্থিত হইতেছিল— রাত্রে চাঁদের আলোতে সেখানে কী অগাধ শান্তি, কী সুগভীর বিষাদ! মৃত্যুর নৃত্য যেন ফুরাইয়া গেছে, কেবল প্রকাণ্ড নাট্যশালার চারি দিকে উৎসবের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। সাড়াশব্দ নাই, প্রাণ নাই, চেতনা নাই, হৃদয়ের তরঙ্গ স্তব্ধ। এক দিকে পর্বতের সুদীর্ঘ ছায়া পড়িয়াছে, এক দিকে চাঁদের আলো। মাঝে মাঝে পাঁচ-ছয়টা করিয়া বড়ো বড়ো গাছ ঝাঁকড়া মাথা লইয়া শাখা প্রশাখা জটাজুট আঁধার করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ইন্দ্রকুমার যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ পাইয়া যখন যুবরাজকে খুঁজিতে আসিয়াছেন, তখন যুবরাজ কর্ণফুলি নদীর তীরে ঘাসের শয্যার উপর শুইয়া আছেন। মাঝে মাঝে অঞ্জলি পুরিয়া জল পান করিতেছেন, মাঝে মাঝে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া চোখ বুজিয়া আসিতেছে। দূরে সমুদ্রের দিক হইতে বাতাস আসিতেছে। কানের কাছে কুল্‌কুল্‌ করিয়া নদীর জল বহিয়া যাইতেছে। জনপ্রাণী নাই। চারি দিকে বিজন পর্বত দাঁড়াইয়া আছে— বিজন অরণ্য ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে— আকাশে চন্দ্র একাকী, জ্যোৎস্নালোকে অনন্ত নীলাকাশ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে ইন্দ্রকুমার যখন বিদীর্ণ হৃদয়ে 'দাদা' বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন,

তখন আকাশ পাতাল যেন শিহরিয়া উঠিল। চন্দ্রনারায়ণ চমকিয়া জাগিয়া 'এসো ভাই' বলিয়া আলিঙ্গনের জন্য দুই হাত তুলিয়া দিলেন। ইন্দ্রকুমার দাদার আলিঙ্গনের মধ্যে বদ্ধ হইয়া শিশুর মতো কাঁদিতে লাগিলেন।

চন্দ্রনারায়ণ ধীরে ধীরে বলিলেন, "আঃ, বাঁচিলাম ভাই! তুমি আসিবে জানিয়াই এতক্ষণ কোনোমতে আমার প্রাণ বাহির হইতেছিল না। ইন্দ্রকুমার, তুমি আমার উপরে অভিমান করিয়াছিলে, তোমার সেই অভিমান লইয়া কি আমি মরিতে পারি। আজ আবার দেখা হইল, তোমার প্রেম আবার ফিরিয়া পাইলাম—এখন মরিতে আর কোনো কষ্ট নাই।"

বলিয়া দুই হাতে তাঁহার তীর উৎপাটন করিলেন। রক্ত ছুটিয়া পড়িল, তাঁহার শরীর হিম হইয়া আসিল। মৃদুস্বরে বলিলেন, "মরিলাম তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু আমাদের পরাজয় হইল!"

ইন্দ্রকুমার কাঁদিয়া কহিলেন, "পরাজয় তোমার হয় নাই দাদা, পরাজয় আমারই হইয়াছে।"

চন্দ্রনারায়ণ ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া হাত জোড় করিয়া কহিলেন, "দয়াময়, ভবের খেলা শেষ করিয়া আসিলাম, এখন তোমার কোলে স্থান দাও।"—বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

ভোরের বেলা নদীর পশ্চিম পাড়ে চন্দ্র যখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিল, চন্দ্রনারায়ণের মুদ্রিতনেত্র মুখচ্ছবিও তখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবন অস্তমিত হইল।

পরিশিষ্ট

বিজয়ী মগ-সৈন্যেরা সমস্ত চট্টগ্রাম ত্রিপুরার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর পর্যন্ত লুণ্ঠন করিল। অমরমাণিক্য দেওঘাটে পলাইয়া গিয়া অপমানে আত্মহত্যা করিয়া মরিলেন। ইন্দ্রকুমার মগদের সহিত যুদ্ধ করিয়াই মরেন— জীবন ও কলঙ্ক লইয়া দেশে ফিরিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

রাজধর রাজা হইয়া কেবল তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন— তিনি গোমতীর জলে ডুবিয়া মরেন।

ইন্দ্রকুমার যখন যুদ্ধে যান তখন তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহারই পুত্র কল্যাণমাণিক্য রাজধরের মৃত্যুর পরে রাজা হন। তিনি পিতার ন্যায় বীর ছিলেন। যখন সম্রাট শাজাহানের সৈন্য ত্রিপুরা আক্রমণ করে, তখন কল্যাণমাণিক্য তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

গ্রন্থপরিচয়

বর্ষার সমান সুরে অন্তর বাহির পূরে
সংগীতের মুষলধারায়—
পরাণের বহুদূর কূলে কূলে ভরপূর,
বিদেশী কাব্যে সে কোথা হায়!
তখন সে পুঁথি ফেলি দুয়ারে আসন মেলি
বসি গিয়ে আপনার মনে—
কিছু করিবার নাই, চেয়ে চেয়ে ভাবি তাই
দীর্ঘদিন কাটিবে কেমনে।
মাথাটি করিয়া নিচু বসে বসে রচি কিছু
বহুযত্নে সারাদিন ধরে—
ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।
ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল—
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি,
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ—
অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।
জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত,
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অজ্ঞাত জীবনগুলা, অখ্যাত কীর্তির ধুলা,
কত ভাব, কত ভয় ভুল—
সংসারের দশ দিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝরঝর বরষার মতো—
ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণহাসি পড়িতেছে রাশি রাশি,
শব্দ তার শুনি অবিরত।
সেইসব হেলাফেলা, নিমেষের লীলাখেলা
চারি দিকে করি স্তূপাকার
তাই দিয়ে করি সৃষ্টি একটি বিস্মৃতিবৃষ্টি
জীবনের শ্রাবণনিশার।

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯ —বর্ষাযাপন। সোনার তরী

উৎস ও ব্যাখ্যান

প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্র-রচনা বা উক্তি

আমি বাস্তবিক ভেবে পাই নে কোন্‌টা আমার আসল কাজ। এক-এক সময় মনে হয় আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে— লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়।...মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। মিউজ্‌দের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাই নে—কিন্তু তাতে কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায়। সাজাদপুর, ৩০ আষাঢ় ১৮৯৩

—রবীন্দ্রনাথ। ছিন্নপত্র

কাল থেকে হঠাৎ আমার মাথায় একটা হ্যাপি থট্‌ এসেছে। আমি চিন্তা করে দেখলুম পৃথিবীর উপকার করব ইচ্ছা থাকলেও কৃতকার্য হওয়া যায় না; কিন্তু তার বদলে যেটা করতে পারি সেইটে করে ফেললে অনেক সময় আপনিই পৃথিবীর উপকার হয়, নিদেন যা হোক একটা কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। আজকাল মনে হচ্ছে যদি আমি আর কিছুই না করে ছোটো ছোটো গল্প লিখতে বসি তা হলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হতে পারলে হয়তো পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা সুখ এই—যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের সংকীর্ণতা দূর করবে, এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের 'পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকালবেলায় তাই গিরিবালা[১]-নাম্নী উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। সবে মাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি এবং সে পাঁচ লাইনে কেবল এই কথা বলেছি যে, কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ বর্ষণ-অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চলছে, হেনকালে পূর্বসঞ্চিত বিন্দু-বিন্দু-বারিশীকর-বর্ষী তরুতলে গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আসা উচিত ছিল, তা না হয়ে আমার বোটে আমলাবর্গের সমাগম হল—তাতে করে সম্প্রতি গিরিবালাকে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে হল। তা হোক, তবু সে মনের মধ্যে আছে।...

বর্তমান গ্রন্থপরিচয় আদ্যন্ত প্রায় একই রূপ বানানে ও ছেদচিহ্নে সংকলন করা হইয়াছে। নানা গ্রন্থ বা রচনা হইতে যে-সকল উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে, ঐ দুটি বিষয়ে সেগুলি সর্বত্র মূলানুগ নহে। কেবলমাত্র সংকলনের ভিতরেই কোথাও কিছু বাদ দেওয়া হইয়া থাকিলে, সংকেতে জানানো হইয়াছে—এমন-কি সংকলিত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে কিছু বাদ পড়িলেও চিহ্ন ব্যবহার করা হয় নাই।

আমি ভাবলুম এই তো আমি কোনো উপকরণ না নিয়ে কেবল গল্প লিখে... নিজেকে নিজে সুখী করতে পারি। শিলাইদা, ২৭ জুন ১৮৯৪

—রবীন্দ্রনাথ। ছিন্নপত্র

ছোটো গল্প রচনার প্রসঙ্গে রবিবাবু বলিলেন—"আমি প্রথমে কেবল কবিতাই লিখতুম, গল্পে-টল্পে বড়ো হাত দিই নাই। মাঝে একদিন বাবা ডেকে বললেন, 'তোমাকে জমিদারির বিষয়কর্ম দেখতে হবে।' আমি তো অবাক; আমি কবি মানুষ, পদ্য-টদ্য লিখি, আমি এ সবের কী বুঝি? কিন্তু বাবা বললেন, 'তা হবে না: তোমাকে এ কাজ করতে হবে।' কী করি? বাবার হুকুম, কাজেই বেরতে হল। এই জমিদারি দেখা উপলক্ষে নানা রকমের লোকের সঙ্গে মেশার সুযোগ হয় এবং এই থেকেই আমার গল্প লেখারও শুরু হয়।"

এই কথা প্রসঙ্গে রবিবাবু তাঁহার দুই-একটি গল্প-রচনার ক্ষুদ্র ইতিহাস দিলেন। কোনো-না-কোনো বাস্তব ঘটনা বা বাস্তব চিত্র হইতে তাঁহার অনেক গল্পেরই উৎপত্তি। [২ মে ১৯০৯]

—জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ। সুপ্রভাত, ভাদ্র ১৩১৬

সাধনা পত্রিকায় অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত।...

এই সময়েই বিষয়কর্মের ভার আমার প্রতি অর্পিত হওয়াতে সর্বদাই আমাকে জলপথে ও স্থলপথে পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিতে হইত—কতকটা সেই অভিজ্ঞতার উৎসাহে আমাকে ছোটোগল্প-রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল।

সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়।...সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটোগল্প সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটো-গল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।

সাধনা চারি বৎসর চলিয়াছিল। বন্ধ হওয়ার কিছুদিন পরে এক বৎসর ভারতীর সম্পাদক ছিলাম, এই উপলক্ষ্যেও গল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ কতকগুলি লিখিতে হয়। বোলপুর, ২৮ ভাদ্র ১৩১৭

—রবীন্দ্রনাথ, পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্র। আত্মপরিচয়

একটা কথা মনে রেখো, গল্প ফোটোগ্রাফ নয়। যা দেখেছি, যা জেনেছি, তা যতক্ষণ না মরে গিয়ে ভূত হয়, একটার সঙ্গে আর-একটা মিশে গিয়ে পাঁচটায় মিলে পঞ্চত্ব পায়, ততক্ষণ গল্পে তাদের স্থান হয় না। ৭ আশ্বিন ১৩৩৮

—রবীন্দ্রনাথ। চিঠিপত্র ৯

বর্ষার সময় খালটা থাকত জলে পূর্ণ। শুকনোর দিনে লোক চলত তার উপর দিয়ে। এ পারে ছিল একটা হাট, সেখানে বিচিত্র জনতা। দোতলার ঘর থেকে লোকালয়ের লীলা দেখতে ভালো লাগত। পদ্মায় আমার জীবনযাত্রা ছিল জনতা থেকে দূরে। নদীর চর—ধু ধু বালি, স্থানে স্থানে জলকুণ্ড ঘিরে জলচর পাখি।

সেখানে যে-সব ছোটোগল্প লিখেছি তার মধ্যে আছে পদ্মাতীরের আভাস। সাজাদ-পুরে যখন আসতুম চোখে পড়ত গ্রাম্য জীবনের চিত্র, পল্লীর বিচিত্র কর্মোদ্যম। তারই প্রকাশ 'পোস্টমাস্টার' 'সমাপ্তি' 'ছুটি' প্রভৃতি গল্পে। তাতে লোকালয়ের খণ্ড খণ্ড চলতি দৃশ্যগুলি কল্পনার দ্বারা ভরাট করা হয়েছে।

—রবীন্দ্রনাথ। মানবসত্য (১৩৩৯)। মানুষের ধর্ম

[শিলাইদহে পদ্মার] বোটে ছিলাম আমি একলা, সঙ্গে ছিল এক বুড়ো মাঝি, আমার মতো চুপচাপ প্রকৃতির, আর ছিল এক চাকর—ফটিক তার নাম, সেও স্ফটিকের মতোই নিঃশব্দ। নির্জনে নদীর বুকে দিন বয়ে যেত নদীর ধারারই মতো সহজে। বোট বাঁধা থাকত পদ্মার চরে। সে দিকে ধু ধু করত দিগন্ত পর্যন্ত পাণ্ডুবর্ণ বালুরাশি, জনহীন, তৃণশস্যহীন। মাঝে-মাঝে জল বেধে আছে, সেখানে শীত ঋতুর আমন্ত্রিত জলচর পাখির দল। নদীর ওপারে গাছপালার ঘন ছায়ায় গ্রামের জীবনযাত্রা। মেয়েরা জল নিয়ে যায়, ছেলেরা জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটে, চাষীরা গোরু মোষ নিয়ে পার হয়ে চলে অন্য তীরের চাষের ক্ষেতে, মহাজনী নৌকা গুণের টানে মন্থর গতিতে চলতে থাকে, ডিঙিনৌকা পাটকিলে রঙের পাল উড়িয়ে হু হু করে জল চিরে যায়, জেলে-নৌকা জাল বাচ করতে থাকে, যেন সে কাজ নয়, যেন সে খেলা—এর মধ্যে প্রজাদের প্রাত্যহিক সুখদুঃখ আমার গোচরে এসে পড়ত তাদের নানাপ্রকার নালিশ নিয়ে, আলোচনা নিয়ে। পোস্ট্‌মাস্টার গল্প শুনিয়ে যেত গ্রামের সদ্য ঘটনা এবং তার নিজের সংকট সমস্যা নিয়ে, বোষ্টমী এসে আশ্চর্য লাগিয়ে যেত তার রহস্যময় জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা ক'রে। বোট ভাসিয়ে চলে যেতুম পদ্মা থেকে পাবনার কোলের ইছামতীতে, ইছামতী থেকে বড়লে, হুড়ো সাগরে, চলন বিলে, আত্রাইয়ে, নাগর নদীতে, যমুনা পেরিয়ে সাজাদপুরের খাল বেয়ে সাজাদপুরে। দুই ধারে কত টিনের-ছাদ-ওয়ালা গঞ্জ, কত মহাজনী নৌকার ভিড়ের কিনারায় হাট, কত ভাঙনধরা তট, কত বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ছেলেদের দলপতি ব্রাহ্মণ বালক, গোচারণের মাঠে রাখাল ছেলের জটলা, বনঝাউ-আচ্ছন্ন পদ্মাতীরের উঁচু পাড়ির কোটরে কোটরে গাঙশালিকের উপনিবেশ। আমার গল্পগুচ্ছের ফসল ফলেছে আমার গ্রাম-গ্রামান্তরের পথে-ফেরা এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভূমিকায়। সেদিন দেখলুম একজন সমালোচক লিখেছেন আমার গল্প অভিজাত সম্প্রদায়ের গল্প, সে তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করে না। গল্পগুচ্ছের গল্প বোধ হয় তিনি আমার ব'লে মানেন না। সেদিন গভীর আনন্দে আমি যে কেবল পল্লীর ছবি এঁকেছি তা নয়, পল্লীসংস্কারের কাজ আরম্ভ করেছি তখন থেকেই—সে সময়ে আজকের দিনের পল্লীদরদী লেখকেরা 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটার সৃষ্টিও করেন নি। সেদিন গল্পও চলেছে, তারই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রে বাঁধা জীবনও চলেছে এই নদীমাতৃক বাংলাদেশের আতিথ্যে।...

'সাধনা'র যুগে প্রধানত শিলাইদহেই কাটিয়েছি। কলকাতা থেকে বন্ধুর ফরমাস আসত, গল্প চাই। জীবনের পথ-চলতি কুড়িয়ে-পাওয়া অভিজ্ঞতার সঞ্চয় সাজিয়ে লিখেছি গল্প। তখন ভাবতাম কলম বাগিয়ে বসলেই গল্প লেখা যায়। [২০ অক্টোবর ১৯৩৬]

—রবীন্দ্রনাথের উক্তি। প্রভাত-রবি। রবিচ্ছবি

বাংলাদেশে গল্পগুচ্ছ পড়বার যুগের অবসান হয় নি কি? অল্প বয়সে বাংলাদেশের পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে যখন আমার চোখে চোখে পরিচয় হয়েছিল তখন প্রতিদিন আমার মনে যে আনন্দের ধারা উদ্‌বারিত হয়েছিল তাই সহজে প্রবাহিত হয়েছিল ঐ নিরলংকৃত সরল গল্পগুলির ভিতর দিয়ে। আমার নিজের বিশ্বাস এই আনন্দবিস্মিত দৃষ্টির ভিতর দিয়ে বাংলাদেশকে দেখা আমাদের সাহিত্যে আর কোথাও নেই। বাংলা পল্লীর সেই অন্তরঙ্গ আতিথ্য থেকে সরে এসেছি, তাই সাহিত্যের সেই শ্যামছায়াশীতল নিভৃত বীথিকার ভিতর দিয়ে আমার বর্তমান মোটর-চলা কলম আর কোনোদিন চলতেই পারবে না। আবার যদি শিলাইদহে বাসা উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারি তা হলে মন হয়তো আবার সেই স্নিগ্ধ সরলতার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে। ১১ জুন ১৯৩৭

—রবীন্দ্রনাথ। চিঠিপত্র ৯

লোকে অনেক সময়ই আমার সম্বন্ধে সমালোচনা করে ঘরগড়া মত নিয়ে। বলে, 'উনি তো ধনীঘরের ছেলে। ইংরেজিতে যাকে বলে রুপোর চাম্‌চে, মুখে নিয়ে জন্মেছেন। পল্লীগ্রামের কথা উনি কী জানেন?' আমি বলতে পারি আমার থেকে কম জানেন তাঁরা, যাঁরা এমন কথা বলেন। কী দিয়ে জানেন তাঁরা? অভ্যাসের জড়তার ভিতর দিয়ে জানা কি যায়? যথার্থ জানায় ভালোবাসা। কুঁড়ির মধ্যে যে কীট জন্মেছে সে জানে না ফুলকে। জানে, বাইরে থেকে যে পেয়েছে আনন্দ। আমার যে নিরন্তর ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে আমি পল্লীগ্রামকে দেখেছি তাতেই তার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছে। আজ বললে অহংকারের মতো শোনাবে, তবু বলব আমাদের দেশের খুব অল্প লেখকই এই রসবোধের চোখে বাংলাদেশকে দেখেছেন। আমার রচনাতে পল্লীপরিচয়ের যে অন্তরঙ্গতা আছে, কোনো বাঁধাবুলি দিয়ে তার সত্যতাকে উপেক্ষা করলে চলবে না। সেই পল্লীর প্রতি যে একটা আনন্দময় আকর্ষণ আমার যৌবনের মুখে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল, আজও তা যায় নি। ১৮ ফাল্গুন ১৩৪৬

—রবীন্দ্রনাথ। কবির উত্তর। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭

আমার রচনায় যাঁরা মধ্যবিত্ততার সন্ধান করে পান নি বলে নালিশ করেন তাঁদের কাছে আমার একটা কৈফিয়ত দেবার সময় এল।...এক সময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশ্বাস এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয় নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। আমার আশঙ্কা হয় এক সময়ে গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য ব'লে অস্পৃশ্য হবে। এখনি যখন আমার লেখার শ্রেণীনির্ণয় করা হয় তখন এই লেখাগুলির উল্লেখমাত্র হয় না, যেন ওগুলির অস্তিত্বই নেই। জাতে-ঠেলাঠেলি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে, তাই ভয় হয় এই আগাছাটাকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে। [চৈত্র ১৩৪৭]

—রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যবিচার। সাহিত্যের স্বরূপ

আমি একটা কথা বুঝতে পারি নে, আমার গল্পগুলিকে কেন গীতধর্মী বলা হয়। এগুলি নেহাত বাস্তব জিনিস। যা দেখেছি, তাই বলেছি।·ভেবে যা কল্পনা করে আর-কিছু বলা যেত, কিন্তু তা তো করি নি আমি। [২২ মে ১৯৪১]

—রবীন্দ্রনাথের উক্তি। আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ

অসংখ্য ছোটো ছোটো লিরিক লিখেছি, বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোনো কবি এত লেখেন নি—কিন্তু আমার অবাক লাগে তোমরা যখন বল যে, আমার গল্পগুচ্ছ গীতধর্মী। এক সময়ে ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনযাত্রা। একটি মেয়ে নৌকো করে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল, তার বন্ধুরা ঘাটে নাইতে নাইতে বলাবলি করতে লাগল, আহা যে পাগলাটে মেয়ে, শ্বশুর-বাড়ি গিয়ে ওর কী না জানি দশা হবে।[৩] কিংবা ধরো একটা ক্ষ্যাপাটে ছেলে সারা গ্রাম দুষ্টুমির চোটে মাতিয়ে বেড়ায়, তাকে হঠাৎ একদিন চলে যেতে হল শহরে তার মামার কাছে।[৪] এইটুকু চোখে দেখেছি, বাকিটা নিয়েছি কল্পনা করে। একে কি তোমরা গানজাতীয় পদার্থ বলবে? আমি বলব আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটে নি। যা-কিছু লিখেছি নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। দেখেছি একজন পুরুষকে নিয়ে দুজন মেয়ের রেষারেষি হানা-হানি, দেখেছি পুত্রবধূর 'পরে মার সতীর বিদ্বেষ, আমার 'চোখের বালি' 'নৌকাডুবি' পড়লে তা বুঝতে পারবে।...কল্পনায় গড়েছি, কবিতায় রচনা করেছি মানস-সুন্দরীকে। এ হল কবিতার কথা, কিন্তু গল্পের উপাদান এ নয়। গল্পে যা লিখেছি তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা। তাকে গীতধর্মী বললে ভুল করবে। 'কঙ্কাল' কি 'ক্ষুধিত পাষাণ'কে হয়তো খানিকটা বলতে পারো, কারণ সেখানে কল্পনার প্রাধান্য, কিন্তু তাও পুরোপুরি নয়। তোমরা আমার ভাষার কথা বলো, বলো যে গদ্যেও আমি কবি। আমার ভাষা যদি কখনো আমার গল্পাংশকে অতিক্রম ক'রে স্বতন্ত্র মূল্য পায়, সেজন্য আমাকে দোষ দিতে পারো না। এর কারণ, বাংলা গদ্য আমার নিজেকেই গড়তে হয়েছে। ভাষা ছিল না, পর্বে পর্বে স্তরে স্তরে তৈরি করতে হয়েছে আমাকে। আমার প্রথম দিককার গদ্যে, যেমন 'কাব্যের উপেক্ষিতা', 'কেকাধ্বনি', এসব প্রবন্ধে, পদ্যের ঝোঁক খুব বেশি ছিল—ওসব যেন অনেকটা গদ্য-পদ্য গোছের। গদ্যের ভাষা গড়তে হয়েছে আমার গল্পপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে। মোপাসাঁর মতো যেসব বিদেশী লেখকের কথা তোমরা প্রায়ই বলো, তাঁরা তৈরি ভাষা পেয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ভাষা গড়তে হলে তাঁদের কী দশা হত জানি নে।

ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে, আমি যে ছোটো ছোটো গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালি সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে। [মে ১৯৪১]

—রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্য, গান ও ছবি। প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৮

আমি একদা যখন বাংলাদেশের নদী বেয়ে তার প্রাণের লীলা অনুভব করেছিলুম তখন আমার অন্তরাত্মা আপন আনন্দে সেইসকল সুখদুঃখের বিচিত্র আভাস অন্তঃকরণের মধ্যে সংগ্রহ করে মাসের পর মাস বাংলার যে পল্লীচিত্র রচনা করেছিল,

তার পূর্বে আর কেউ করে নি। কারণ, সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা কাজ করেন। সে বিশ্বকর্মারই মতন আপনাকে দিয়ে রচনা করে। সেদিন কবি যে পল্লী-চিত্র দেখেছিল নিঃসন্দেহ তার মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাত-প্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তার সৃষ্টিতে মানবজীবনের সেই সুখদুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম ক'রে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে, পল্লীপার্বণে, আপন প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ নিয়ে— কখনো বা মোগল রাজত্বে কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতিসরল মানবত্ব-প্রকাশ নিত্য চলেছে— সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে, কোনো সামন্ততন্ত্র নয়, কোনো রাষ্ট্রতন্ত্র নয়। [২৪ মে ১৯৪১]

—রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা। সাহিত্যের স্বরূপ

আমার বয়স তখন অল্প ছিল। বাংলাদেশের পল্লীতে ঘাটে ঘাটে ভ্রমণ করে ফিরেছি। সেই আনন্দের পূর্ণতায় গল্পগুলি লেখা। চিরদিন এই গল্পগুলি আমার অত্যন্ত প্রিয়, অথচ আমাদের দেশ গল্পগুলিকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করে নেয় নি, এই দুঃখ আমার মনে ছিল। এবার তোমাদের 'পরিচয়ে' এতদিন পরে আমি যথোচিত পুরস্কার পেয়েছি।[৫] তার মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই, পুরোপুরি সম্ভোগের কথা। এই কৃতজ্ঞতা তোমাকে না জানিয়ে পারলুম না। উত্তরায়ণ, ৯ জুন ১৯৪১

—রবীন্দ্রনাথ। শ্রীহিরণকুমার সান্যালকে লিখিত পত্র

শ্রীচন্দ্রগুপ্ত, শ্রীসুদর্শন, শ্রীসত্যবতী দেবী ও শ্রীবনারসীদাস চতুর্বেদী রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলে রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প সম্বন্ধে যে আলোচনা হয় তাহার বিবরণ Forward পত্রে (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬) প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা এ স্থলে সংকলিত হইল—

Mr. Sudarshan: Can you kindly tell us something of the background of your short stories and how they originated?

The Poet: It was when I was quite young that I began to write short stories. Being a landlord I had to go to villages and thus I came in touch with the village people and their simple modes of life. I enjoyed the surrounding scenery and the beauty of rural Bengal. The river system of Bengal the best part of this province, fascinated me and I used to be quite familiar with those rivers. I got glimpses into the life of the people, which appealed to me very much indeed. At first I was quite unfamiliar with the village life as I was born and brought up in Calcutta and so there was an element of mystery for me. My whole heart went out to the simple village people as I came in close contact with them. They seemed to belong to quite another world so very different from that of Calcutta. My earlier stories have this background and they describe this contact of mine with the village

people. They have the freshness of youth. Before I had written these short stories there was not anything of that type in Bengali literature. No doubt Bankimchandra had written some stories but they were of a romantic type; mine were full of the temperament of the village people. There was the rural atmosphere about them. So when I re-read these short stories of mine, many of which I have forgotten— unfortunately I haven't got a good memory; I sometimes forget what I wrote yesterday— they bring back to me vividly the beautiful atmosphere of these earlier short stories. There is a note of universal appeal in them, for man is the same everywhere. My later stories haven't got that freshness, that tenderness of earlier stories.

Mr. Sudarshan: Did you get some characters of your stories from living individuals?

The Poet: Yes, some of the characters were suggested by living individuals. For example, the character of the boy in my story 'Chhuti' was suggested by a boy in a village. I then imagined what would happen to this loving and sensitive boy if he were taken to Calcutta for his education and made to live in an unsympathetic atmosphere of a family with her aunt. That was the background.

Mr. Chandra Gupta: Which of your stories do you consider as the best of the lot?

The Poet replied smilingly: No, I cannot say that. There are several varieties of them.

The Poet went on to describe how free and how very full of joy were those days by the riverside in his youth with such enthusiasm and tenderness that the hearers were transferred in their imagination to those lovely rural scenes where everything was simple and joyful. Another story, the Poet continued, had its origin in the village life: I actually saw the girl of the type, described in the story, in a village. She was quite wild and extraordinary. There was nobody to restrain her freedom. She used to watch me every day from a distance and sometimes she brought a child with her and with finger pointed towards me she used to show me to the child. Day after day she came. Then one day she didn't come. That day I overheard the talk of the village women who had come to fetch water from the river.

They were discussing with anxiety about the fate of that girl who was now to go to her mother-in-law's house. 'She is quite wild. She doesn't know how to behave. What will happen to her!' they said. The next day I saw a small boat on the river. The poor girl was forced to go aboard. The whole scene was full of sadness and pathos. One of her girl companions was shedding tears stealthily, while others were persuading and encouraging her not to be afraid. The boat disappeared. It gave me the setting for a story named: The End [Samapti].

Then there was a Postmaster. He used to come to me. He had been away from his place for a long time and he was longing to go back. He didn't like his surroundings. He thought he was forced to live among barbarians. And his desire to get leave was so intense that he even thought of resigning from his post. He used to relate to me the happenings of the village life. He thus gave me material for a character in my story: Postmaster.

Mr. Chaturvedi then asked: How was 'Kabuliwala' suggested? It is one of the stories that has a universal appeal. It is very popular on our side.

The Poet: The story was a work of imagination. Of course there used to be a Kabuliwala who came to our house and who became very familiar with us. I imagined that he too must have a daughter left behind in his motherland to be remembered by him.

Mr. Chaturvedi: I specially like that part of the story of Kabuliwala where he says that he is going to his father-in-law's house.

The Poet: On our side they refer to prison as *sasurbari*. Do they do so in your parts too?

'Yes, they do call it *sasuralaya*': one of the party replied amidst laughter in which all joined.

Mr. Chandra Gupta: You have adopted a new style in your later stories. How do you like your own earlier stories now?

Poet: My later stories have not got that freshness, though they have greater psychological value and they deal with problems. Happily I had no social or political problems before my mind when I was quite young. Now there are a number of

problems of all kinds and they crop up unconsciously when I write a story. I am very susceptible to environment and until and unless I am in the midst of a certain type of atmosphere I cannot produce any artistic work. During my youth whatever I saw appealed to me with pathos quite strong, and therefore, my earlier stories have a greater literary value because of their spontaneity. But now it is different. My stories of a later period have got the necessary technique but I wish I could go back once more to my former life. I have different strata of my life, and all my writings can be divided into so many periods. They express the sentiments of those respective periods. All of us have different incarnations in this very life. We are born again and again in this very life. When we come out of one period, we are as if born again. So we have our literary incarnations also. In my case the difference is so vast that I forget my former literary births and last time when I was reading the proofs of short stories of my early period, they had a freshness for me. They seemed to come from a shadowy past. There was some vagueness about them and I remembered the period of my early life like the girl at Delhi who remembers her past life.

—*Forward,* 23 February, 1936

বিভিন্ন ছোটোগল্প

কালানুক্রমিক

ভিখারিনী

ষোলো বছর বয়সের…আরম্ভের মুখেই দেখা দিয়েছে ভারতী।…আমার মতো ছেলে, যার না ছিল বিদ্যে, না ছিল সাধ্যি, সেও সেই বৈঠকে জায়গা জুড়ে বসল অথচ সেটা কারও নজরে পড়ল না, এর থেকে জানা যায় চার দিকে ছেলেমানুষি হাওয়ার যেন ঘুর লেগেছিল।…আমি লিখে বসলুম এক গল্প, সেটা যে কী বকুনির বিনুনি নিজে তার যাচাই করবার বয়স ছিল না, বুঝে দেখবার চোখ যেন অন্যদেরও তেমন করে খোলে নি।

—রবীন্দ্রনাথ। ছেলেবেলা

করুণা

কেবল বৈষ্ণব পদাবলী নহে, তখন বাংলা সাহিত্যে যে-কোনো বই বাহির হইত আমার লুব্ধ হস্ত এড়াইতে পারিত না।…এই সব বই পড়িয়া জ্ঞানের দিক হইতে আমার যে অকাল পরিণতি হইয়াছিল বাংলা গ্রাম্য ভাষায় তাহাকে বলে জ্যাঠামি—প্রথম বৎসরের ভারতীতে প্রকাশিত আমার বাংলা রচনা 'করুণা'-নামক গল্প তাহার নমুনা।

—রবীন্দ্রনাথ। জীবনস্মৃতির খসড়া

পোস্টমাস্টার

কালকের চিঠিতে লিখেছিলুম আজ অপরাহ্ণ সাতটার সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এন্‌গেজ্‌মেণ্ট করা যাবে। বাতিটি জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে বইখানি হাতে যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি, হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্টমাস্টার এসে উপস্থিত।…এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট্‌-অপিস ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম তখনই আমি একদিন দুপুর-বেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্টমাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম। এবং সে গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরল তখন আমাদের পোস্টমাস্টারবাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন। যাই হোক, এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। বেশ নানারকম গল্প করে যান, আমি চুপ করে বসে শুনি। ওরই মধ্যে ওঁর আবার বেশ একটু হাস্যরসও আছে। সাজাদপুর, ২৯ জুন ১৮৯২

—রবীন্দ্রনাথ। ছিন্নপত্র

গিন্নি

গিন্নি বলিয়া একটা ছোট গল্প লিখিয়াছিলাম ; সেটা নর্মাল স্কুলেরই স্মৃতি হইতে লিখিত।[৬]

—রবীন্দ্রনাথ। জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপি

ক্রমশ নর্মাল স্কুলের স্মৃতিটা যেখানে ঝাপসা অবস্থা পার হইয়া স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে সেখানে কোনো অংশেই তাহা লেশমাত্র মধুর নহে।... শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না। সম্বৎসর তাঁহার ক্লাসে আমি সকল ছাত্রের শেষে নীরবে বসিয়া থাকিতাম।[৭]

—রবীন্দ্রনাথ। নর্মাল স্কুল। জীবনস্মৃতি

এই পণ্ডিতটি ক্লাসের ছেলেদের অদ্ভুত নামকরণ করিয়া কিরূপ লজ্জিত করিতেন সাধনায় [হিতবাদীতে] গিন্নি-নামক যে গল্প বাহির হইয়াছিল তাহাতে সে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আর একটি ছেলেকে তিনি ভেট্‌কি বলিয়া ডাকিতেন, সে বেচারার গ্রীবার অংশটা কিছুটা প্রশস্ত ছিল।[৬]

—রবীন্দ্রনাথ। জীবনস্মৃতির দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি

দালিয়া

দালিয়া গল্পটায় ইতিহাস যেটুকু আছে সে আছে গল্পের বহিঃপ্রাঙ্গণে— অর্থাৎ গাছে চড়িয়ে দিয়ে মই নিয়েছে ছুটি। আসল গল্পটা ষোলো আনাই গল্প। ৭ আশ্বিন ১৩৩৮

—রবীন্দ্রনাথ। চিঠিপত্র ৯

কঙ্কাল

ছেলেবেলা আমরা যে ঘরে শুতুম, তাতে একটা মেয়ের skeleton ঝুলনো ছিল।[৮] আমাদের কিন্তু কিছু ভয়-টয় করত না। তার পর অনেক দিন কেটে গিয়েছে, আমার বিয়ে-টিয়ে হয়ে গিয়েছে, আমি তখন ভিতর-বাড়িতে শুই। একদিন কয়েকজন আত্মীয়া এসেছেন, তাঁরা আমার ঘরে শোবেন, আমার উপর হুকুম হয়েছে বাইরে শোবার। অনেক দিন পরে আমি আবার সেই ঘরে এসে শুয়েছি। শুয়ে চেয়ে দেখলুম, সেজের আলোটা ক্রমে কাঁপতে কাঁপতে নিবে গেল। আমার মাথায় বোধ হয় তখন রক্ত বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল, আমার মনে হতে লাগল কে যেন মশারির চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলছে 'আমার কঙ্কালটা কোথায় গেল? আমার কঙ্কালটা কোথায় গেল?' ক্রমে মনে হতে লাগল সে দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে বন্ বন্ করে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। এই আমার মাথায় গল্প এসে গেল আর-কি।

জীবিত ও মৃত

ছোটোবৌ [পত্নী] তখনও বেঁচে। আমার তখনকার দিনে ভোররাত্রিতে উঠে অন্ধকার ছাদে ঘুরে বেড়ানো প্রভৃতি অনেকরকম কবিত্ব ছিল। একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে যেতেই উঠে পড়লুম, ভেবেছিলুম আমার সময় হয়েছে, আসলে কিন্তু তখন দুপুর রাত। অন্ধকার বারান্দার ভিতর দিয়ে, দালান পার হয়ে, আমি grope করতে করতে চলতে লাগলুম। সব ঘরে দরজা বন্ধ। এ ঘরে ন'বৌঠান ঘুমচ্ছেন, সে ঘরে অন্য কোনো বৌঠান ঘুমচ্ছেন, সব একেবারে নীরব নিঝুম। খানিক দূরে আসতেই আপিস-ঘরে না কোথায় ঢং ঢং করে দুটো বেজে গেল। আমি থমকে দাঁড়ালুম, ভাবলুম—তাই তো, এই গভীর রাত্রে আমি সারা বাড়িময় এমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছি! হঠাৎ মনে হল আমি যেন প্রেতাত্মা, এ বাড়ি haunt করে বেড়াচ্ছি। আমি যেন মোটেই আমি নয়, আমির রূপ ধরে বেড়াচ্ছি মাত্র। একটা খেয়াল মাথায় এল যে, আচ্ছা, আমি যদি এখন পা টিপে টিপে ঘরে ফিরে গিয়ে মশারিটা তুলে খুব solemn ভাবে প্রশ্ন করি, 'তুমি জানো আমি কে?' তা হলে কেমন হয়? অবশ্য আমি তা করি নি, করলে খুব একটা scene হত নিশ্চয়। হয়তো রাত্রে মাঝে মাঝে উঠে সে ভাবতেও পারত, 'তাই তো, এ সত্যিই আর কিছু নয় তো?' কিন্তু ideaটা আমাকে পেয়ে বসল, যেন একজন জীবিত মানুষ সত্যসত্যই নিজেকে মৃত ব'লে মনে করছে।

—রবীন্দ্রনাথের উক্তি। পুণ্যস্মৃতি

অনেক দিন আগে কলকাতার বাড়িতে, ঠিক সময়টা মনে পড়ে না, তবে ছোটোবৌ তখন ছিলেন, একবার আত্মীয়স্বজন হঠাৎ এসে পড়ায় আমার বাইরের বাড়িতে শোবার ব্যবস্থা হয়। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ভিতরে ছিলুম, এক সময়ে যখন আমার নির্দিষ্ট শোবার জায়গায় যাব ব'লে চলেছি—ভিতরবাড়ি পার হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। ঘুমিয়ে পড়েছে চারি দিক, আলো-অন্ধকারে বড়ো বড়ো ছায়ায় মিলে সে এক গভীর রাত্রি। সত্যিকারের রাত বলা যায় তাকে। বারান্দায় একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম, মনে এল একটা কল্পনা—যেন এ আমি আমি নই। যে আমি ছিলুম সে আমি নয়, যেন আমার বর্তমান-আমিতে আর আমার অতীতে একটা ভাগ হয়ে গেছে। সত্যি যদি তাই হয় তা হলে কেমন হয়? মনে হল যদি পা টিপে টিপে ফিরে গিয়ে ছোটো-বৌকে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়ে বলি—দেখো, এ আমি কিন্তু আমি নয়, তোমার স্বামী নয়—তা হলে কী হয়।...যা হোক, তা করি নি। চলে গেলুম শুতে, কিন্তু সেই রাত্রে এই গল্পটা আমার মাথায় এল, যেন একজন কেউ দিশাহারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেও মনে করছে অন্য সকলেও মনে করছে যে, সে সে নয়।

—রবীন্দ্রনাথের উক্তি। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী অগ্রহায়ণ ১৩৫২ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে 'রবীন্দ্র-নাথের 'জীবিত ও মৃত'' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত, পাবনার উকিল ও 'ঠাকুর-জমিদারবাবুদের ঘরের উকিল ও আমমোক্তার', তারকনাথ অধিকারীর

নিকট বাল্যে তিনি একটি সত্য ঘটনার বিবরণ শুনিয়াছিলেন, যাহার অনেক অংশ 'জীবিত ও মৃত'-কাহিনীর প্রথমাংশের অনুরূপ। ঘটনাটি তারকনাথ অধিকারী মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন। 'তাঁর কাছে শোনা সত্য কাহিনীটাই যে রবীন্দ্রনাথের জীবিত ও মৃত কাহিনীর আসল [আংশিক] উপাদান তা অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে।'

কাবুলিওয়ালা

কাবুলিওয়ালা বাস্তব ঘটনা নয়। মিনি আমার বড়ো মেয়ের আদর্শে রচিত। ৭ আশ্বিন ১৩৩৮

—রবীন্দ্রনাথ। চিঠিপত্র ৯

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'যা-তা গল্পই তো গল্প। আমার ভারি soothing লাগে। ছোটো ছেলের সঙ্গে ছোটো মেয়ের ঐখানে প্রভেদ। অভি [ভ্রাতুষ্পুত্রী] আমার পিছনে দাঁড়িয়ে সারাদিন ঐরকম বকে যেত।' আমি বলিলাম, 'কাবুলি-ওয়ালার মিনির মতো?' কবি বলিলেন, 'বেলাটা [জ্যেষ্ঠা কন্যা] ঠিক অমনি ছিল, মিনির কথা প্রায় তার কথাই সব তুলে দিয়েছি।'

—শ্রীসীতা দেবী। পুণ্যস্মৃতি

ছুটি

বিকেলবেলায় আমি এখানকার গ্রামের ঘাটের উপর বোট লাগাই। অনেক-গুলো ছেলে মিলে খেলা করে, বসে বসে দেখি। কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে নিশিদিন যে পদাতিক সৈন্য লেগে থাকে তাদের জ্বালায় আর আমার মনে সুখ নেই। ছেলেদের খেলা তারা বেআদবি মনে করে...কালও তারা ছেলেদের তাড়া করতে উদ্যত হয়েছিল, আমি আমার রাজমর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের নিবারণ করলুম। ঘটনাটা হচ্ছে এই—

ডাঙার উপর একটা মস্ত নৌকার মাস্তুল পড়ে ছিল—গোটাকতক বিবস্ত্র ক্ষুদে ছেলে মিলে অনেক বিবেচনার পর ঠাওরালে যে, যদি যথোচিত কলরব-সহকারে সেইটেকে ঠেলে ঠেলে গড়ানো যেতে পারে তা হলে খুব একটা নতুন এবং আমোদজনক খেলার সৃষ্টি হয়। যেমন মনে আসা অমনি কার্যারম্ভ, 'সাবাস জোয়ান—হেঁইয়ো। মারো ঠেলা হেঁইয়ো।' মাস্তুল যেমনি এক পাক ঘুরছে অমনি সকলের আনন্দে উচ্চহাস্য।...একটি ছোটো মেয়ে বিনাবাক্যব্যয়ে গম্ভীর প্রশান্ত ভাবে সেই মাস্তুলটার উপর গিয়ে চেপে বসল। ছেলেদের এমন সাধের খেলা মাটি। দুই-একজন ভাবলে এমন স্থলে হার মানাই ভালো, তফাতে গিয়ে তারা ম্লানমুখে সেই মেয়েটির অটল গাম্ভীর্য নিরীক্ষণ করতে লাগল। ওদের মধ্যে একজন এসে পরীক্ষাচ্ছলে মেয়েটাকে একটু একটু ঠেলতে চেষ্টা করলে। কিন্তু সে নীরবে নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম করতে লাগল। সর্বজ্যেষ্ঠ ছেলেটি এসে তাকে বিশ্রামের জন্যে অন্য স্থান নির্দেশ করে দিলে, সে তাতে সতেজে মাথা নেড়ে কোলের উপর দুটি হাত জড়ো করে নড়ে-চড়ে আবার বেশ গুছিয়ে বসল—তখন সেই ছেলেটা শারীরিক

যুক্তি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলে এবং অবিলম্বে কৃতকার্য হল। সাজাদপুর [জুন ১৮৯১]

—রবীন্দ্রনাথ। ছিন্নপত্র

আর-একবার ওই রকম নৌকা ভিড়িয়েছি। নদীর তীরে গ্রামের অনেক ছেলে খেলা করতে এসেছে—প্রায় চৌদ্দ পনেরো জন। তার মধ্যে একটি ছেলেই সর্দার; আর সকলে নিরীহ বেচারির মতো তার অনুসরণ করছে। বামুনের ছেলে, বছর তেরো বয়স, স্ফূর্তি ও সজীবতার অবতার। কোমরে পৈতে বেঁধে সকলের আগে আগে হৈ হৈ করতে করতে যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে 'তারে নারে না' বলে গান ধরছে। তার প্রধান আমোদ হচ্ছে এ-নৌকা ও-নৌকা ক'রে বেড়ানো, মাঝিদের কাজ দেখা, মাস্তুলের পাল গুটানো দেখা ইত্যাদি। তীরে অনেকগুলি গুঁড়িকাঠ গাদা-করা ছিল। মাঝে ছেলেটি তড়াক করে নৌকা থেকে নেমে এই কাঠগুলি গড়িয়ে গড়িয়ে নদীতে ফেলতে আরম্ভ করলে। কিন্তু তার আমোদের পথে একটা বিঘ্ন এসে উপস্থিত হল। একটি ছোটো মেয়ে এসে একটি গুঁড়ি চেপে বসল। ছেলেটি তাকে উঠাবার কত চেষ্টা করলে, কিন্তু মেয়েটি তা গ্রাহ্যও করলে না। সে বেশ ফিলজফারের মতো গম্ভীর ভাবে গুঁড়ি দখল করে বসে আছে। তখন ছেলেটি তাকে-সুদ্ধই গুঁড়িটি উলটে দিলে। মেয়েটি পড়ে গিয়ে বিকট কান্না জুড়ে দিলে, এবং কাঁদতে কাঁদতে উঠেই ছেলেটিকে কষে এক চড় লাগালে। এই ঘটনা থেকেই 'ছুটি'র শুরু। [২ মে ১৯০৯]

—রবীন্দ্রনাথের উক্তি। জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুলিপি
শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ। সুপ্রভাত, ভাদ্র ১৩১৬

অসম্ভব কথা

ভূমিকাংশ তুলনীয়—

সন্ধ্যা হইয়াছে; মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পুকুর ভরতি হইয়া গিয়াছে। বাগানের বেলগাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলা জলের উপরে জাগিয়া আছে; বর্ষাসন্ধ্যার পুলকে মনের ভিতরটা কদম্বফুলের মতো রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। মাস্টারমহাশয়ের আসিবার সময় দু-চার মিনিট অতিক্রম করিয়াছে। তবু এখনো বলা যায় না। রাস্তার সম্মুখের বারান্দাটাতে চৌকি লইয়া গলির মোড়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি। 'পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্' যাকে বলে। এমন সময় বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ আছাড় খাইয়া হা-হতোস্মি করিয়া পড়িয়া গেল। দৈবদুর্যোগে-অপরাহত সেই কালো ছাতাটি দেখা দিয়াছে। হইতে পারে আর কেহ। না, হইতেই পারে না। ভবভূতির সমানধর্মা বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে, কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই গলিতে মাস্টারমহাশয়ের সমানধর্মা দ্বিতীয় আর-কাহারো অভ্যুদয় একেবারেই অসম্ভব।

—রবীন্দ্রনাথ। নানা বিদ্যার আয়োজন। জীবনস্মৃতি

ভূমিকার শেষ অংশের তুলনা—'ছেলেবেলা', তৃতীয় অধ্যায়, শেষ অংশ।

সমাপ্তি

আমাদের ঘাটে একটি নৌকো লেগে আছে, এবং এখানকার অনেকগুলি 'জনপদবধূ' তার সম্মুখে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। বোধ হয় একজন কে কোথায় যাচ্ছে এবং তাকে বিদায় দিতে সবাই এসেছে। অনেকগুলি কচি ছেলে অনেকগুলি ঘোমটা এবং অনেকগুলি পাকা চুল একত্র হয়েছে। কিন্তু ওদের মধ্যে একটি মেয়ে আছে, তার প্রতিই আমার মনোযোগটা সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হচ্ছে। বোধ হয় বয়সে বারো-তেরো হবে, কিন্তু একটু হৃষ্টপুষ্ট হওয়াতে চোদ্দ-পনেরো দেখাচ্ছে। মুখখানি বেড়ে। বেশ কালো অথচ বেশ দেখতে। ছেলেদের মতো চুল ছাঁটা, তাতে মুখটি বেশ দেখাচ্ছে। এমন বুদ্ধিমান এবং সপ্রতিভ এবং পরিষ্কার সরল ভাব। একটা ছেলে কোলে করে এমন নিঃসংকোচ কৌতূহলের সঙ্গে আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। তার মুখখানিতে কিছু যেন নির্বুদ্ধিতা কিম্বা অসরলতা কিম্বা অসম্পূর্ণতা নেই। বিশেষত আধা ছেলে আধা মেয়ের মতো হয়ে আরো একটু বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। ছেলেদের মতো আত্মসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ভাব এবং তার সঙ্গে মাধুরী মিশে ভারি নতুন রকমের একটি মেয়ে তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশে যে এরকম ছাঁদের 'জনপদবধূ' দেখা যাবে এমন প্রত্যাশা করি নি। দেখছি এদের বংশটাই তেমন বেশি লাজুক নয়। একজন মেয়ে ডাঙায় দাঁড়িয়ে রৌদ্রে চুল এলিয়ে দশাঙ্গুলি-দ্বারা জটা ছাড়াচ্ছে এবং নৌকোর আর-একটি রমণীর সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে ঘরকন্নার আলাপ হচ্ছে। শোনা গেল তার একটিমাত্র 'মায়্যা', অন্য 'ছাওয়াল' নাই, কিন্তু সে মেয়েটির বুদ্ধিসুদ্ধি নেই—'কারে কী কয় কারে কী হয়—আপন পর জ্ঞান নেই'—আরো অবগত হওয়া গেল গোপাল সা'র জামাইটি তেমন ভালো হয় নি, মেয়ে তার কাছে যেতে চায় না। অবশেষে যখন যাত্রার সময় হল তখন দেখলুম আমার সেই চুলছাঁটা গোলগাল হাতে-বালা-পরা উজ্জ্বল-সরল-মুখশ্রী মেয়েটিকে নৌকোয় তুললে। বুঝলুম বেচারা বোধ হয় বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর ঘরে যাচ্ছে। নৌকো যখন ছেড়ে দিলে মেয়েরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল, দুই-একজন আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে নাক চোখ মুছতে লাগল। একটি ছোটো মেয়ে, খুব এঁটে চুল বাঁধা, একটি বর্ষীয়সীর কোলে চড়ে তার গলা জড়িয়ে তার কাঁধের উপর মাথাটি রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। যে গেল সে বোধ হয় এ বেচারির দিদিমণি, এর পুতুলখেলায় বোধ হয় মাঝে মাঝে যোগ দিত, বোধ হয় দুষ্টুমি করলে মাঝে মাঝে সে একে ঢিপিয়ে দিত। সকালবেলাকার রৌদ্র এবং নদীতীর এবং সমস্ত এমন গভীর বিষাদে পূর্ণ বোধ হতে লাগল। সকালবেলাকার একটা অত্যন্ত হতাশ্বাস করুণ রাগিণীর মতো। মনে হল সমস্ত পৃথিবীটা এমন সুন্দর অথচ এমন বেদনায় পরিপূর্ণ! এই অজ্ঞাত ছোটো মেয়েটির ইতিহাস আমার যেন অনেকটা পরিচিত হয়ে গেল। সাজাদপুর, ৪ জুলাই ১৮৯১

—রবীন্দ্রনাথ। ছিন্নপত্র

আমি একবার জমিদারি দেখা উপলক্ষ্যে একটি নদীর তীরে নৌকা লাগিয়েছি। নৌকায় ব'সে কোনো রকম কাজ করছি। এমন সময়ে দেখলুম একটি মেয়ে— বড়ো মেয়ে— হিন্দুর ঘরে অত বড়ো মেয়ে অবিবাহিতা প্রায় দেখা যায় না— নদীর তীর থেকে আমার নৌকার দিকে দেখছে। সে তখনই চলে গিয়ে আবার ফস্ করে একটি ছেলে কোলে নিয়ে ফিরে এল, এসে নৌকার এ-দিক ও-দিক দেখতে লাগল। নৌকার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভিতরে দেখতে লাগল। তার সরল সতেজ দৃষ্টি, চলাফেরার মধ্যে একটা সহজ স্ফূর্তির ভাব দেখে আমার বড়ো ভালো বোধ হল। বাঙালী মেয়েদের মধ্যে সে রকম ভাব আমি প্রায় দেখি নাই। আমার মেয়েটিকে ডেকে দু-একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হল। কিন্তু আবার কী ভেবে পারলুম না। সেদিন তো গেল। তার পরের দিন দেখি আমার পাশের একটি নৌকায় চাল-ডাল বাসন-কোসন প্রভৃতি ঘরকন্নার জিনিস বোঝাই হচ্ছে; যেন কোনো মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে। খানিক পরে দেখি ঠিক কালকের সেই মেয়েটিকে কনে সাজিয়ে অনেকে মিলে নৌকার দিকে নিয়ে আসছে। সে কিছুতে নৌকায় উঠবে না, আর তারাও জোর করে তাকে তুলে দেবে। সচরাচর মেয়েটেয়ে পাঠাবার সময় যে কান্না-কাটির ভাব দেখি, এ ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ অভাব দেখলুম। কান্নাকাটির কথা দূরে থাকুক অনেকেই বেশ স্ফূর্তি ও আমোদ করছে। কেবল একটি মেয়ে, বড়ো মেয়ে, সে তার মায়ের কোলে চড়ে আছে, তার লম্বা লম্বা পা দুখানা ঝুলে পড়েছে— সেই মায়ের ঘাড়ে মুখ লুকিয়ে নীরবে ফুলে ফুলে কাঁদছে। তার পরে পাশের নৌকা ছেড়ে দিলে, তীরের স্ত্রীলোকেরাও চলে গেলেন। আমি কেবল দূর থেকে শুনলাম একটি মেয়েমানুষ আর-একজনকে বলছেন— 'ওকে তো জানো বোন, ও ওই রকমই। কত করে বললাম, পরের ঘর করতে যাচ্ছিস, বেশ সাবধানে থাকিস ঘাড় হেঁট করে থাকিস, উঁচু করে কথা বলিস নে; কিন্তু সে কি তা পারবে!' ইত্যাদি— এই ঘটনাই আমার 'সমাপ্তি' রচনার ভিত্তি। [২ মে ১৯০৯]

— রবীন্দ্রনাথের উক্তি। জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুলিপি
শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ। সুপ্রভাত, ভাদ্র ১৩১৬

দেখতুম কিনা বোট থেকে— মেয়েরা ঘাটে আসত, কেউ বা ছেলে কোলে, কেউ বা এক-পাঁজা বাসন নিয়ে, কেউ বা কলসী কাঁখে। ওই দশ-এগারো বছরের মেয়েটা, ছোটো ছোটো করে চুল ছাঁটা, কাঁখে একটা ছেলে নিয়ে রোজ আসত। রোগা রোগা দেখতে, শামলা রঙ। বোটের উপরে আমাকে সবাই দেখত, কিন্তু ওর দেখাটা ছিল অন্যরকম। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকত! মাঝে মাঝে কোলের ছেলেটাকে আমাকে দেখাতো আঙুল দিয়ে— 'ওই দেখ্'। আমার ভারি মজা লাগত। এমন একটা স্বাভাবিক স্ফূর্তি চঞ্চলতা ছিল তার, যা ও বয়সের জড়সড় বাঙালীর মেয়েদের বেশি দেখা যায় না। তার পর একদিন দেখলুম বধূবেশে শ্বশুরবাড়ি চলল সেই মেয়ে। সেই ঘাটে নৌকো বাঁধা। কী তার কান্না! অন্য মেয়েদের বলাবলি কানে এল— 'যা দুরন্ত মেয়ে। কী হবে এর শ্বশুরবাড়িতে!' ভারি দুঃখ হল তার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া দেখে। চঞ্চলা হরিণীকে বন্দিনী করবে। ওর কথা মনে

করেই এই গল্পটা লিখেছিলুম। ওই বোটে বাংলাদেশের গ্রামের এমন একটা সজীব ছবি দেখেছি যা অনেকে দেখে নি।

—রবীন্দ্রনাথের উক্তি। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ

মেঘ ও রৌদ্র

ছিন্নপত্র গ্রন্থ হইতে দ্বিতীয় উদ্‌ধৃতি, ২৭ জুন ১৮৯৪ তারিখে লেখা চিঠির অংশ দ্রষ্টব্য, পূর্ববর্তী পৃ ১০০১।

ক্ষুধিত পাষাণ

ক্ষুধিত পাষাণের কল্পনাও কল্পলোক থেকে আমদানি। ৭ আশ্বিন, ১৩৩৮

—রবীন্দ্রনাথ। চিঠিপত্র ৯

সতেরো বছরে পড়লুম যখন ··· এই সময়ে আমার বিলেত যাওয়া ঠিক হয়েছে। আর সেই সঙ্গে পরামর্শ হল জাহাজে চড়বার আগে মেজদাদার সঙ্গে গিয়ে আমাকে বিলিতি চাল-চলনের গোড়াপত্তন করে নিতে হবে। তিনি তখন জজিয়তি করছেন আমেদাবাদে ···

আমেদাবাদে একটা পুরোনো ইতিহাসের ছবির মধ্যে আমার মন উড়ে বেড়াতে লাগল। জজের বাসা ছিল শাহিবাগে, বাদশাহি আমলের রাজবাড়িতে। দিনের বেলায় মেজদাদা চলে যেতেন কাজে, বড়ো বড়ো ফাঁকা ঘর হাঁ হাঁ করছে, সমস্ত দিন ভূতে-পাওয়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। সামনে প্রকাণ্ড চাতাল, সেখান থেকে দেখা যেত সাবরমতী নদী হাঁটুজল লুটিয়ে নিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে বালির মধ্যে। চাতালটার কোথাও কোথাও চৌবাচ্ছার পাথরের গাঁথনিতে যেন খবর জমা হয়ে আছে বেগমদের স্নানের আমিরিআনার।

কলকাতায় আমরা মানুষ, সেখানে ইতিহাসের মাথাতোলা চেহারা কোথাও দেখি নি। আমাদের চাহনি খুব কাছের দিকের বেঁটে সময়টাতেই বাঁধা। আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম চলতি ইতিহাস থেমে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে তার পিছন-ফেরা বড়োঘরোআনা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নীচে পোঁতা। আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল ক্ষুধিত পাষাণের গল্পের।—

সে আজ কত শত বৎসরের কথা। নহবতখানায় বাজছে রোশনচৌকি দিনরাত্রে অষ্টপ্রহরের রাগিণীতে, রাস্তায় তালে তালে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠছে, ঘোড়সওয়ার তুর্কি ফৌজের চলছে কুচকাওয়াজ, তাদের বর্শার ফলায় রোদ উঠছে ঝক্‌ঝকিয়ে। বাদশাহি দরবারের চার দিকে চলেছে সর্বনেশে কানাকানি ফুস্‌ফাস্‌। অন্দরমহলে খোলা তলোয়ার হাতে হাবসি খোজারা পাহারা দিচ্ছে। বেগমদের হামামে ছুটছে গোলাপজলের ফোয়ারা, উঠছে বাজুবন্ধ-কঙ্কনের ঝন্‌ঝনি। আজ স্থির দাঁড়িয়ে শাহিবাগ, ভুলে-যাওয়া গল্পের মতো, তার চার দিকে কোথাও নেই সেই রঙ, নেই সেই-সব ধ্বনি—শুকনো দিন, রস-ফুরিয়ে-যাওয়া রাত্রি।

পুরোনো ইতিহাস ছিল তার হাড়গুলো বের করে; তার মাথার খুলিটা আছে, মুকুট নেই। তার উপরে খোলস মুখোশ পরিয়ে একটা পুরোপুরি মূর্তি মনের

জাদুঘরে সাজিয়ে তুলতে পেরেছি তা বললে বেশি বলা হবে। চালচিত্তির খাড়া করে একটা খসড়া মনের সামনে দাঁড় করিয়েছিলুম, সেটা আমার খেয়ালেরই খেলনা।[৯]

—রবীন্দ্রনাথ। অধ্যায় ১৩। ছেলেবেলা

অপিচ দ্রষ্টব্য : পত্র ১৪৯, ছিন্নপত্রাবলী।

প্রবাসীতে যে শাহিবাগের ছবি[১০] বাহির হইয়াছে এই বাড়িতেই আমি বাস করিয়াছি এবং ইহাই ক্ষুধিত পাষাণের সেই বাড়ি। নদীতীরের দিকটা ইহাতে দেখানো হয় নাই—শীর্ণ সুবর্ণমতী নদী ইহার প্রাকারতল চুম্বন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে—ইহাকেই আমি গল্পে 'সুস্তা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি মনে হইতেছে। ছবিটি দেখিয়া আমার সেই ১৭ বৎসর বয়সের নির্জন মধ্যাহ্নের উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনা-সকল মনে উদয় হইতেছে। [১৩০৯]

—রবীন্দ্রনাথ। সতীশচন্দ্র রায়কে লিখিত পত্র

বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৫

অতিথি

বসে বসে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখছি—খুব একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। একটু একটু ক'রে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক বর্ণ ধ্বনি আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে-সকল দৃশ্য লোক ও ঘটনা কল্পনা করছি তারই চারি দিকে এই রৌদ্রবৃষ্টি নদীস্রোত এবং নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারাপ্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে ও সৌন্দর্যে সজীব করে তুলছে। কিন্তু পাঠকেরা এর অর্ধেক জিনিসও পাবে না। তারা কেবল কাটা শস্যই পায়, কিন্তু শস্যক্ষেতের আকাশ বাতাস শিশির এবং শ্যামলতা সমস্তই বাদ পড়ে যায়। আমার গল্পের সঙ্গে যদি এই মেঘমুক্ত বর্ষাকালের স্নিগ্ধরৌদ্ররঞ্জিত ছোটো নদীটি এবং নদীর তীরটি, এই গাছের ছায়া এবং গ্রামের শান্তিটি এমনি অখণ্ডভাবে তুলে দিতে পারতুম তা হলে সবাই তার সত্যটুকু একেবারে সমগ্রভাবে এক মুহূর্তে বুঝে নিতে পারত। অনেকটা রস মনের মধ্যেই থেকে যায়, সবটা পাঠককে দেওয়া যায় না। যা নিজের আছে তাও পরকে দেবার ক্ষমতা বিধাতা মানুষকে সম্পূর্ণ দেন নি। সাজাদপুর ২৮ জুন ১৮৯৫

—রবীন্দ্রনাথ। ছিন্নপত্র

দুরাশা

৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৮। আমি [বিপিনবিহারী গুপ্ত] বলিলাম, 'টেনিসনের Princess গল্পটি যেন কয়েকজন বন্ধু মুখে মুখে রচনা করিলেন। একজন আরম্ভ করিলেন, খানিক দূর অগ্রসর হইয়া তিনি আর-একজনকে বলিলেন, এইবার তুমি গল্পটা চালিয়ে যাও; দ্বিতীয় ব্যক্তি থামিলে আর-একজন গল্পটাকে আরও খানিকটা অগ্রসর করিয়া দিলেন—এই রকম করিয়া যেন গল্পটি রচিত হইয়াছে। কিন্তু

বাস্তবিক আগাগোড়াই কবি লিখিয়াছেন। আপনিও নাকি ঐ রকম গল্পরচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন?'

রবিবাবু বলিলেন, 'হাঁ, আমি অনেকবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি,¹¹ কিন্তু কখনোই মনের মতো হইল না। আমি আরম্ভ করিয়া দিতাম, কিন্তু বন্ধুরা গল্পটিকে এমন করিয়া দাঁড় করাইতেন যে আমার মনে হইত সমস্তটা মাটি হইয়া গেল। দার্জিলিঙে একদিন কুচবিহারের মহারানী [সুনীতি দেবী] বলিলেন, 'আসুন, সকলে মিলিয়া একটা গল্প রচনা করা যাক, আগে আপনি আরম্ভ করুন।' আমি আমাদের বাঙালীসমাজ-ছাড়া একটা romantic গল্পের অবতারণা করিবার প্রয়াসে বলিলাম 'আচ্ছা বেশ'; এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া দিলাম— 'দার্জিলিঙে ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে ঘন কুজ্‌ঝটিকার মধ্যে বসিয়া একটি হিন্দুস্থানী রমণী কাঁদিতেছে।' এই বলিয়া আমি ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু দেখিলাম, গল্পটা অন্যের মুখে অগ্রসর হইতে চাহিল না; অগত্যা আমাকেই সমস্তটা রচনা করিয়া লইতে হইল। এই রকম করিয়া আমার 'দুরাশা' গল্পটি রচিত হইয়াছে।

—বিপিনবিহারী গুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গ। মানসী ও মর্মবাণী, ফাল্গুন ১৩২৩
ছিন্নপত্র। মানসী, ফাল্গুন ১৩১৯

কেশরলালের গল্পটা পেয়েছি মগজ থেকে। চতুর্মুখের মগজ আছে কি না জানি নে, কিন্তু তিনি কিছু-না থেকে কিছুকে যে ভাবে গড়ে তোলেন এও তাই। অনেক কাল পূর্বে একবার যখন দার্জিলিঙে গিয়েছিলুম, সেখানে ছিলেন কুচবিহারের মহারানী। তিনি আমাকে গল্প বলতে কেবলই জেদ করতেন। এই গল্পটা তাঁর সঙ্গে দার্জিলিঙের রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে মুখে মুখে বলেছিলুম। মাস্টারমশায় গল্পের ভূমিকা অংশটা এবং মণিহারা গল্পটিও এমনি ক'রে তাঁরই তাগিদে মুখে মুখে রচিত। ৭ আশ্বিন ১৩৩৮

—রবীন্দ্রনাথ। চিঠিপত্র ৯

মণিহারা

রবিবাবু বলিলেন ··· কুচবিহারের মহারানী ভূতের গল্প শুনিতে বড়ো ভালোবাসিতেন। আমায় বলিতেন, 'আপনি নিশ্চয়ই ভূত দেখিয়াছেন, একটি ভূতের গল্প বলুন।' আমি যতই বলিতাম যে আমি ভূত দেখি নাই, তিনি ততই মাথা নাড়িতেন; বলিতেন, 'না, কখনোই না, নিশ্চয়ই আপনি ভূত দেখিয়াছেন।' অগত্যা আমাকে একটি ভূতের গল্পের অবতারণা করিতে হইল। ভাঙা পোড়ো বাড়ি, কঙ্কালের খট্‌খট্‌ শব্দ, এই-সমস্ত অবলম্বন করিয়া আমি 'মণিমালিকা' [মণিহারা] গল্পটি তাঁহাকে শুনাইলাম। গল্পটি তাঁহার বড়ো ভালো লাগিয়াছিল। ৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৮

—বিপিনবিহারী গুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গ। মানসী ও মর্মবাণী, ফাল্গুন ১৩২৩
ছিন্নপত্র। মানসী, ফাল্গুন ১৩১৯

মাস্টারমশায়

রবিবাবু বলিলেন ··· একদিন Woodlandsএ নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে গিয়াছিলাম, নাটোরের মহারাজও [জগদিন্দ্রনাথ] তথায় উপস্থিত ছিলেন। খাওয়াদাওয়ার পর [কুচবিহারের] মহারানী বলিলেন, 'রবিবাবু, এইবার আপনি একটি ভূতের গল্প বলুন, আপনি যে ভূত দেখেন নাই তা হতেই পারে না, আপনাকে ভূতের গল্প বলিতেই হইবে।' অগত্যা আমি বলিলাম, 'আচ্ছা, তবে একটা ঘটনা বলিতে পারি; নাটোরের মহারাজ সেই ঘটনার কতকটা অবগত আছেন, তিনি এ সম্বন্ধে কতক দূর পর্যন্ত সাক্ষ্য দিতে পারেন। একদিন নিমন্ত্রণ-পার্টি হইতে ফিরিতে অনেক রাত হইল। নাটোরের মহারাজ বলিলেন, রবিবাবু, আমার গাড়ি প্রস্তুত, আসুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া যাইতে পারিব। অনেক দূর গিয়া আমি মহারাজার গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম, বলিলাম কোথায় আপনার বাড়ি আর কোথায় জোড়াসাঁকোয় আমার বাড়ি, অত ঘুরিয়া যাওয়া আপনার পক্ষে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অসুবিধাজনক, আমি এইখান হইতে একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ি করিয়া যাইতে পারি। মহারাজার সনির্বন্ধ নিষেধ আমি মানিলাম না। কিন্তু পরে অনুতাপ করিতে হইয়াছিল!' এই পর্যন্ত বলিয়া আমি একটু থামিলাম। মহারানী সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তার পর?' আমি বলিলাম, 'একখানা মাত্র ভাড়াটিয়া গাড়ি রাস্তার চৌমাথায় দাঁড়াইয়া ছিল। গাড়োয়ানকে বলিলাম জোড়াসাঁকোয় অমুক জায়গায় আমাকে লইয়া চলো। সে কিছুতেই রাজি হইল না। নাটোরের মহারাজ তখন তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, ভাড়াটিয়া গাড়ির টিকিট লইয়া এখানে রহিয়াছ, নিশ্চয়ই যাইতে হইবে, নহিলে পুলিসের হাতে দিব—এই বলিয়া তাহার গাড়ির নম্বর টুকিয়া লইলেন। পুলিসের ভয়ে সে রাজি হইল। আমি গাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম। মহারাজ চলিয়া গেলেন।

'আমি নিশ্চিন্তমনে বসিয়া রহিলাম। গাড়ি চলিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে বুঝিতে পারিলাম যে আমার পরিচিত বড়ো রাস্তা দিয়া গাড়ি চলিতেছে না, অপরিচিত অন্ধকার গলির ভিতর দিয়া গাড়োয়ান গাড়ি হাঁকাইয়া চলিয়াছে। কিছু বলিলাম না; ভাবিলাম, বোধ হয় সহজেই বাড়ি পৌঁছাইব। কিন্তু পথ যেন ফুরায় না। হঠাৎ বোধ হইল যেন গাড়ির মধ্যে আমি একাকী বসিয়া নহি; কে যেন আমার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া আছে; আমি অন্ধকারে হাত বাড়াইলাম, কিছুই হাতে ঠেকিল না; আবার চুপ করিয়া বসিলাম, আবার সেই রকম যেন মনে হইতে লাগিল, মনটা যেন কেমন ছম্ ছম্ করিতে লাগিল; গাড়ির পিছনে যে ছোকরা বসিয়াছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, ওরে, তুই ভিতরে এসে বোস্। সে বলিল, না বাবু, আমি ভিতরে যাব না। যতই আমি তাহাকে আহ্বান করি ততই জোর করিয়া সে বলিতে লাগিল, না বাবু, আমি ভিতরে যাব না। এ দিকে গাড়ি একেবারে গড়ের মাঠে রেড রোডের নিকটে গিয়া উপস্থিত। গাড়োয়ানকে ডাকাডাকি করিলাম, কোনো ফল হইল না। সে বিস্তৃত ময়দানে সেই চন্দ্রালোকিত গভীর নিশীথে, গাড়ি ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। আমার গা ঘেঁষিয়া কী একটা যেন জিনিস রহিয়াছে অনুভব করিতে লাগিলাম, সবলে দুই হাত দিয়া সেটাকে যেন ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলাম। সহসা দেখিলাম যেন গাড়ির ভিতরে একটা বিকট হাসি ফুটিয়া উঠিল।

আমি চিৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিলাম, মাথা ঘুরিয়া গেল। খানিক পরে বুঝিতে পারিলাম ভোর হইয়া আসিতেছে, এবং আমাদের বাড়িরও সন্নিকটবর্তী হইয়াছি।

'পরদিন নাটোরের মহারাজকে রাত্রির কথা বলিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া থানায় গেলেন। দারোগা আমাদের কাহিনী শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের গাড়ির নম্বর কত? নম্বর শুনিয়া বলিল, আপনারা যদি কাল রাত্রে গাড়োয়ানকে ধরিয়া লইয়া থানায় আসিতেন তাহা হইলে এমন হয়রান হইতে হইত না। অনেক দিন হইল একজন কেরানি আপিস হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় ঐ গাড়ি করিয়া গড়ের মাঠে গিয়া ঐ গাড়িতেই আত্মহত্যা করে। তদবধি রাত্রিকালে ও-গাড়িতে লোক চড়িলেই ভয় পায়। আমরা তাহা জানিতে পারিয়া পাছে ঐ গাড়ির লাইসেন্স্ বন্ধ করিয়া দি, এই ভয়ে গাড়োয়ানটা রাত্রে আর সওয়ার লয় না।'

এই পর্যন্ত বলিয়া থামিলাম। কুচবিহারের মহারানী বলিলেন, 'অ্যাঁ, সত্য নাকি?' আমি হাসিয়া বলিলাম, 'না, মোটেই সত্য নয়, গল্প করিলাম মাত্র।' এই গল্পটি পরে নূতন করিয়া লিখিয়াছিলাম। ৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৮

—বিপিনবিহারী গুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গ। মানসী ও মর্মবাণী, ফাল্গুন ১৩২৩

ছিন্নপত্র। মানসী, ফাল্গুন ১৩১৯

বর্তমান প্রসঙ্গে শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী-প্রণীত 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ', প্রথম সংস্করণ, পৃ ১৮৪-৮৫, রবীন্দ্রনাথের উক্তি দ্রষ্টব্য।

বোষ্টমী

বোষ্টমী অনেকখানিই সত্যি। এই বোষ্টমী স্বয়ং আমার কাছে এসে গল্প বলত। শেষ অংশটায় অল্প কিছু বদল করেছি। বোষ্টমী-যে গুরুকে ত্যাগ করেছিল সেটা সত্য নয়—সংসার ত্যাগ করেছিল বটে। ৭ আশ্বিন ১৩৩৮

—রবীন্দ্রনাথ। চিঠিপত্র ৯

সর্বখেপী ··· গেরুয়া শাড়ি পরে এক-আঁচল ফুল নিয়ে এই বৈষ্ণবী দুপুরবেলা খঞ্জনী বাজিয়ে যখন মাঠের আল দিয়ে 'গৌর গৌর' গান গেয়ে যেতেন তখন প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা হত। ··· আমরা এঁর নাম সর্বখেপী বলেই জানতাম; রবীন্দ্রনাথ গল্পে এঁর নাম দিয়েছেন 'আনন্দী'। এঁর প্রকৃত জীবনকাহিনী হয়তো রবীন্দ্রনাথই জানতেন, আমরা জানতাম না। এঁর যৌবনের অপূর্ব কাহিনী যা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তা হয়তো কবির কল্পনাপ্রসূত। কারণ সে বিষয়ে সর্বখেপী কাউকেই কিছু বলতেন না। আমরা তাঁর প্রৌঢ়-জীবনের সঙ্গেই পরিচিত। ··· জনসাধারণের বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ এঁর জীবিকা-নির্বাহের জন্য নাকি কুড়ি-বাইশ বিঘা জমি দিয়েছিলেন বিনা নজরে। ··· রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থাকাকালে ইনি দুবেলা শিলাইদহ কুঠীবাড়িতে যেতেন এবং তাঁর পাতের প্রসাদ পেতেন। এই সব বর্ণনা বোষ্টমী গল্পের সঙ্গে হুবহু মেলে। ইনি ফুল ভালোবাসতেন, সব সময়েই এঁর গেরুয়া আঁচলে দেখতাম একরাশ গন্ধরাজ ফুল ··· ফুলের মালা গেঁথে নিয়ে যেতেন কুঠী-

বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের জন্য। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উঠলেই ইনি ভক্তিতে 'গোর গোর' বলে মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করতেন আবার গুন্‌গুন্‌ নিয়ে গাইতেন— 'গৌরসুন্দর মোর'।

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী। অজ্ঞাতবাসের সঙ্গী। রবীন্দ্রমানসের উৎসসন্ধানে

বোষ্টমী স্নান করে যখন সিক্ত বস্ত্রে চলে আসছে তার গুরু বললে, তোমার দেহখানি সুন্দর। সে সময়ে তার কণ্ঠস্বরে ও মুখভাবে যে চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছিল সেটাতে বোষ্টমীর নিজের মনের প্রচ্ছন্ন আবেগকে জাগিয়ে দিয়েছিল। তাই সে পালিয়ে গিয়ে আপনাকে বাঁচায়। আমার বিশ্বাস গল্পের মধ্যে এই ইঙ্গিতটি বুঝতে বাধা ঘটে না। ইংরেজি তর্জমায় কথাটা স্পষ্ট হয়েছে কিনা জানি নে। ১৩ মাঘ [১৩৪৩]

—রবীন্দ্রনাথ। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র। প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৯

এই বৈষ্ণবীর উল্লেখ রবীন্দ্র-সাহিত্যে অন্যত্রও আছে— যেমন, প্রথমসংস্করণ যাত্রী, পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, পৃ ৯১, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫; পৃ ১৫৮, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ এবং বনবাণী কাব্যের ভূমিকা।

স্ত্রীর পত্র

টীকা-সহ বদনাম গল্পের প্রসঙ্গ দেখিতে হইবে।

অপরিচিতা

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর তাঁহার কবি-কথা গ্রন্থে (পৃ ৭৩-৭৬) কবির দেখা 'অতি সাধারণ ঘরের' একটি মেয়ের কবি-কথিত যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার সহিত তুলনীয় 'অপরিচিতা'র অধ্যায় ৪।

নামঞ্জুর গল্প

গল্পগুচ্ছের নামঞ্জুর গল্পের যে জায়গায় পদসেবা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ার কথা আছে তা আমার নিজের জীবনেই ঘটেছিল। ২৮ জুলাই ১৯৩৪

—রবীন্দ্রনাথের উক্তি। আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ

অপিচ দ্রষ্টব্য : মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, প্রথম সংস্করণ, পৃ ১৩১।

ল্যাবরেটরি

সোহিনীকে নিয়ে যখন কেউ-কেউ আলোচনা করতেন [রবীন্দ্রনাথ] তাঁদের প্রায়ই বলতেন, 'সোহিনীকে সকলে হয়তো বুঝতে পারবে না, সে একেবারে এখনকার যুগের সাদায়-কালোয় মিশনো খাঁটি রিয়্যালিজ্‌ম্‌, অথচ তলায়-তলায় অন্তঃসলিলার মতো আইডিয়ালিজ্‌ম্‌ই হল সোহিনীর প্রকৃত স্বরূপ।'

—শ্রীপ্রতিমা দেবী। নির্বাণ

ল্যাবরেটরি নামে গল্প যখন প্রথম ছাপা হয়…আমি [শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ] যেতেই [কবি] গল্পটা দেখিয়ে বললেন…'আর সকলে কী বলছে? একেবারে ছিছি কাণ্ড তো? নিন্দায় আর মুখ দেখানো যাবে না! আশি বছর বয়সে রবি ঠাকুরের মাথা খারাপ হয়েছে—সোহিনীর মতো এমন একটা মেয়ের সম্বন্ধে এমন করে লিখেছে। সবাই তো এই বলবে যে, এটা লেখা ওঁর উচিত হয় নি?' একটু হেসে বললেন, 'আমি ইচ্ছা করেই তো করেছি। সোহিনী মানুষটা কিরকম, তার মনের জোর, তার লয়াল্‌টি, এই হল আসলে বড়ো কথা—তার দেহের কাহিনী তার কাছে তুচ্ছ। নীলা সহজেই সমাজে চলে যাবে, কিন্তু সোহিনীকে বাধবে। অথচ মা আর মেয়ের মধ্যে কত তফাত সেইটেই তো বেশি করে দেখিয়েছি।'

—শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। কবি-কথা
বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০

বদনাম

প্রথম আমি মেয়েদের পক্ষ নিয়ে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে বলি। বিপিন পাল তার প্রতিবাদ করেন[১২], কিন্তু পারবেন কেন? তাব পরে আমি যখনই সুবিধা পেয়েছি বলেছি। এবারেও সুবিধে পেলুম, ছাড়ব কেন, সদুর মুখ দিয়ে কিছু বলিয়ে নিলুম। ১৭ মে ১৯৪১

—রবীন্দ্রনাথের উক্তি। শ্রীরানী চন্দ। আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ

গল্পসল্প

[এই] ছোটগল্পগুলি ছেলেরা দখল করতে চায়, কিন্তু হাত ফসকে যায়। আসলে এর ভিতরের খবর বড়োদের জন্যই। ২৬ মে ১৯৪১

—রবীন্দ্রনাথের উক্তি। আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ

জীবনের শেষ বর্ষে লিখিত এই গ্রন্থের অনেক কাহিনীতে লেখকের নানা বাল্যস্মৃতি, জীবনের উষাকালে দেখা অনেক মানুষের স্মৃতি উজ্জীবিত হইয়াছে—এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'রাজার বাড়ি', 'ম্যাজিসিয়ান', 'মুক্তকুন্তলা', 'মুনশী', 'ভালোমানুষ'—তুলনীয় জীবনস্মৃতি গ্রন্থের 'ঘর ও বাহির', 'বাংলা শিক্ষার অবসান', 'কাব্যরচনাচর্চা'।

জীবনের শেষ বর্ষে রচিত কয়েকটি গল্প প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : শ্রীপ্রতিমা দেবী-প্রণীত 'নির্বাণ', প্রথম সংস্করণ, পৃ ৫৬-৫৮।

'ইঁদুরের ভোজ' নামে একটি গল্প ও তদানুষঙ্গিক কবিতা পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনী দেবীর নামে বঙ্গলক্ষ্মী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা সম্প্রতি জানা গিয়াছে—এ দুটি গল্পসল্পের ভাবী সংস্করণে সংকলন-যোগ্য।

ছোটোগল্পের প্রকৃতি

ছোটোগল্পের প্রকৃতি ও বড়ো গল্পের সহিত তাহার প্রভেদের কথা রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহার 'শেষ কথা' গল্পের 'ছোটো গল্প'-শীর্ষক পাঠান্তরের সূচনায়, বর্তমান গ্রন্থের ৮৮৭-৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গল্পের প্লট

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় 'যাঁদের দেখেছি' গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—'তাঁর আরো একটি আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।...সংলাপের আসরে ব'সে অনুরুদ্ধ হলে রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখেই নূতন গল্প ও উপন্যাসের প্লট তৈরি করে দিতে পারতেন।'[১০] 'সংলাপের আসরে' 'মুখে-মুখে তৈরি' কয়েকটি গল্পের বিবরণ অন্যত্র পাওয়া যাইবে। শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' (প্রথম সংস্করণ) গ্রন্থের ১৮৫-৮৮ পৃষ্ঠায় এইরূপ 'একটা সত্যি গল্প' বিবৃত আছে।

'মুখে-মুখে তৈরি' একটি গল্পের বিবরণ দিয়াছেন শান্তিনিকেতনের পুরাতন ছাত্রী শ্রীমতী মমতা দাশগুপ্ত—

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ছেড়ে আসবার অনেক দিন পরে আর একটি দিনের কথাও আজ মনে পড়ছে। ১৯৩৫এ গুরুদেব একবার লক্ষ্মৌ আসেন।...

আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার কেমরন রোডে একটি ছোটো বাড়িতে থাকতাম। সেই বাড়ির সামনেই মস্ত একটা তেঁতুল গাছ। আমার সেই ছোটো বাড়িতেই একদিন তাঁর পদধূলি পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কতক্ষণই বা ছিলেন তিনি, কিন্তু সেই বাড়ির কথা তিনি কখনো ভোলেন নি।

১৯৩৬এ আমি কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলাম। তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি ও আমার মা গুরুদেবকে প্রণাম করতে গিয়েছি। আমরা তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি আমাদের মোড়ায় বসতে বললেন। আমরা বসতেই তিনি হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে গল্প বলতে শুরু করলেন।

'সুদূর পশ্চিমের একটি শহরে ছোট্ট একটি বাড়ি। সামনেই প্রকাণ্ড একটা তেঁতুল গাছ।

'সেদিন শীতের সন্ধ্যা, বাইরে বৃষ্টি চলছে। গৃহকর্তা অধ্যাপক গেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে এলাহাবাদে।

'তা সত্ত্বেও গৃহিণী অত্যন্ত ব্যস্ত। বাদলা সন্ধ্যা, বন্ধুরা আসবেন। তাদের জন্য নানারকম সাঁৎলাভাজা, চিঁড়েভাজা, কচুরি তৈরি করে তিনি তাদের অপেক্ষায় আছেন—এমন সময়ে বাইরের দরজায় কে জোরে আঘাত করল। গৃহিণী দরজা খুলে দেখেন সেই দুর্যোগে অন্ধকারে একটি তেইশ-চব্বিশ বছরের সুন্দর ছেলে বৃষ্টিতে ভিজে বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গৃহিণীকে দেখেই ছেলেটি বলে উঠল, 'আজকের রাতটার জন্য যদি একটু আপনার বাড়িতে স্থান পাই। আমি আজ

অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত।' দিনকাল ভালো না, এ কথা শুনেই নানা রকম বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও, গৃহিণী তাকে থাকতে দিলেন। তাকে খাইয়ে-দাইয়ে কর্তার একটা এণ্ডির চাদরও গায়ে দেবার জন্য দিলেন। ছেলেটি শীতে কাঁপছিল।

'পরদিন সকালে তো অধ্যাপক এলাহাবাদ থেকে ফিরে এলেন। নিজের বাড়িতে পুলিসের সমাবেশ দেখে অবাক। ব্যাপার কী? পুলিসকর্তা বললেন, 'দেখুন, আপনার স্ত্রীটি তো কম নন। তিনি একজন এনার্কিস্ট্ পলাতক ছেলেকে আশ্রয় দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তাঁরও যোগ আছে এতে।' অধ্যাপক অত্যন্ত বিব্রত হয়ে উঠলেন। তিনি সমানেই বলে যেতে লাগলেন, 'না, না, আমার স্ত্রী অতিশয় ভালো-মানুষ, তিনি কী ক'রে এসবে যোগ দেবেন?'

'তবুও ছাড়াছাড়ি নেই। অধ্যাপককে তখুনি আদালতে যেতে হল। সেখানে গিয়ে দেখলেন সেই ছেলেটির গায়ে তাঁরই নিজের গায়ের এণ্ডির চাদর। দেখে তো তাঁর চক্ষুস্থির। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই তো আমার এণ্ডির চাদর।' ছেলেটিকে পুলিস হাজতে নিয়ে চলে গেল।'

গুরুদেব এই পর্যন্ত বলে আমার দিকে তাকিয়ে খুব হাসতে লাগলেন। আমায় বললেন, 'কি রে, এ মেয়েটিকে চিনতে পারছিস?'

গুরুদেব যখন গল্পটি আরম্ভ করেছিলেন তখন ধরতেই পারি নি যে তিনি কোথাকার কথা বলছেন।

এরই দু-তিন দিন পর আবার এক সন্ধ্যায় 'শ্যামলী'তে গিয়েছি। যাওয়ামাত্রই হঠাৎ আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'দেখ্ লাবি, চাদরটাও পাওয়া গেছে। ছেলেটি কিন্তু অকৃতজ্ঞ নয়, চাদরটা জেল থেকেই পার্সেল করে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

লিখ্‌বার ক্ষমতা আমার নেই। তিনি যখন গল্পটি বলছিলেন, তখন তাঁর বলার ভঙ্গী আর ভাষার মাধুর্য অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। তাঁর বলার ভঙ্গীটি কানে আজও ভেসে আসছে।

—আনন্দস্মৃতি। দেশ, ২৪ শ্রাবণ ১৩৫৯

'একটি প্লট পাঠিয়েছিলেন পত্রে পুরে সুবিখ্যাত কথাসাহিত্যিক বনফুল ওরফে শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে।'[১৪] 'অনেক প্লট শেষ পর্যন্ত গদ্য-কাব্য ও পদ্য-কথিকায় সংক্ষেপ আকার[১৫] নিয়ে রয়েছে শেষের কাব্যগুলোতে।'[১৪]

'লেখা হয়ে ওঠে নি' এমন একটি গল্পের খসড়া শ্রীরানী চন্দের নিকট বিবৃত করেন ১৭ মে ১৯৪১ তারিখে, 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে (প্রথম সংস্করণ পৃ ১০৪-১০৭) উহা লিপিবদ্ধ আছে। 'গল্পটা আমার মনে এসেছিল যখন সাউথ আমেরিকায় ছিলুম।'

শান্তিনিকেতনের পূর্বতন অধ্যাপক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—'আমি পণ্ডিতমহাশয় ও সতীশকে গুটিকয়েক গল্পের প্লট দিয়া গল্প লিখাইয়াছি।' দ্রষ্টব্য : 'স্মৃতি', মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রসংগ্রহ। অন্যত্র দেখিতে পাই—

রবীন্দ্রনাথ 'যৌতুক' গল্পের প্লটটি শরৎকুমারীকে দেন এবং উহা লইয়া তাঁহাকে একটি গল্প রচনা করিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধ-মত পাঁচ-সাত দিনের

অমনই শরৎকুমারী 'যৌতুক' গল্পটি লিখিয়া ফেলেন। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ ইহা জানিতেন না ; কারণ পরবর্তীকালে তিনি এই প্লটটি আবার চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেন এবং তিনি 'চাঁদির জুতা' গল্পটি লেখেন। গল্পটি চারুবাবুর 'বরণডালা' নামক পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

—সম্পাদকীয় ভূমিকা। শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী

'দেবী' গল্পটির আখ্যানভাগ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমায় দান করিয়াছিলেন—এ কথাটি প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করি নাই। এখন করিলাম।

—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। নব-কথা, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

১৩৩৪ মাঘ সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত শ্রীঅমিয়ভূষণ বসুর 'হট্টমালার দেশে' গল্পটি 'পঁচিশ বৎসর পূর্বে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে শ্রুত গল্পের অস্ফুট স্মৃতি অবলম্বনে' রচিত।

গল্প-উপন্যাসের প্লট বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে একবার কথা-প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন (১৩২১?) এইখানে তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে—'তোমরা সব বড়ো পরে জন্মেছ। বছর কুড়ি আগে যদি জন্মাতে তা হলে তোমাদের আমি দেদার প্লট দিতে পারতাম। তখন আমার মনে হ'ত আমি দু হাতে প্লট বিলিয়ে হরির লুট দিতে পারি।'[১৩]

সৎপাত্র

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন ১৩০৯ পৌষ সংখ্যায় সৎপাত্র নামে স্বাক্ষর-বিহীন একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল, বর্ষসূচীতেও লেখকের নাম ছিল না। সাধারণতঃ এরূপ ক্ষেত্রে রচনাটি সম্পাদকের বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। অবশ্য, ইহাতে প্রমাদের সম্ভাবনা আছে, তাহা লেখনের কতকগুলি কবিতিকার দৃষ্টান্তেই জানা যায়। অতএব, শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এ বিষয়ে শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে যে পত্র লেখেন তাহা এ স্থলে সংকলনযোগ্য—

সৎপাত্র গল্পটি সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠেছে সে বিষয়ে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য জানাচ্ছি।

ইণ্ডিয়ান প্রেসের হাত থেকে কবির বই প্রকাশ করার ব্যবস্থা যখন আমরা বিশ্বভারতী থেকে কিনে নিলাম তার কিছুদিন পরে গল্পগুচ্ছের একটি বিশ্বভারতী-সংস্করণ ছাপানো স্থির হল। গল্পের তালিকা তৈরি করতে গিয়ে দেখি যে কতকগুলি গল্প বাদ পড়েছে। সেইগুলি কবির কাছে নিয়ে গেলাম—তার মধ্যে পুত্রযজ্ঞ আর সৎপাত্র এই দুটি গল্পও ছিল। গল্প পড়ে আমার মনে হয়েছিল, যে, সম্ভবতঃ কবির লেখা।

'পত্রেবক্ত' ভারতীতে প্রথম ছাপা হয় শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে। কিন্তু আসলে এটি কবির লেখা, তাই কবি এই গল্পটিকে গল্পগুচ্ছের মধ্যে নিতে' বললেন। এ সম্বন্ধে সমরবাবুর নিজের উক্তি ছাপা হয়েছে...শুধু একটা কথা মনে পড়ছে, যে, কবির কাছে শুনেছিলাম, ঐ গল্পের আখ্যানভাগটিও কবি নিজে প্রথমে সমরবাবুকে মুখে মুখে বলে দিয়েছিলেন।

তার পরে কথা হল 'সৎপাত্র' সম্বন্ধে। খানিক ক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কবি বললেন—'সৎপাত্র গল্পটা ঠিক আমার বলা চলে না। আমি ওটাতে কিছু কলম চালিয়েছি বটে, কিন্তু ওটা আসলে বেলা[১৮] নিজেই লিখেছিল। ওর আখ্যানভাগ কাঠামো সব ওর নিজের। ওর ক্ষমতা ছিল, কিন্তু লিখত না। আমার কাছে খাতাটা দিল, বলল—একটু দেখে দাও। আমি লেখাটা কিছু বদলিয়ে দিয়েছিলুম, কিন্তু আসলে গল্পটা ওরই লেখা। ওটা আমার লেখা বলে নেওয়া চলবে না। ওটা বাদ দাও।'

কবির স্পষ্ট নির্দেশ-অনুযায়ী 'সৎপাত্র' গল্পটি কবির রচনাবলীর অন্তর্গত করা হয় নি।

—বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৫

রবীন্দ্রনাথ-কৃত

বিভিন্ন গল্পের নাট্যরূপ

মূল কাহিনী	মাসিক পত্রে নাট্যরূপ	গ্রন্থপ্রকাশ	
(১২৯২)		মুকুট	[১৩১৫]
উপায় (১২৯৮)	মুক্তির উপায় (১৩৪৫)	মুক্তির উপায়	১৩৫৫
একটা আষাঢ়ে গল্প (১২৯৯)		তাসের দেশ	১৩৪০
কর্মফল (১৩১০)	শোধবোধ (১৩৩২)	শোধবোধ	[১৩৩৩]
শেষের রাত্রি (১৩২১)	গৃহপ্রবেশ (১৩৩২)	গৃহপ্রবেশ	১৩৩২

১০০১-১০২৭ পৃষ্ঠার টীকা

[১] দ্রষ্টব্য 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্প। [২] বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাধনা-সম্পাদনে সহযোগী।

[৩] দ্রষ্টব্য গল্প : সমাপ্তি। [৪] দ্রষ্টব্য গল্প : ছুটি।

[৫] পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র-রচিত 'গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ'।

[৬] বিস্তারিত গ্রন্থপরিচয়-যুক্ত জীবনস্মৃতি দ্রষ্টব্য।

[৭] হরনাথ পণ্ডিত নামে একজন শিক্ষক এই সময়ে নর্মাল স্কুলে ছিলেন। এই লোকটির প্রকৃতি বড়ো ভালো ছিল না; ছেলেদের সঙ্গে তিনি বড়ো ভালো ব্যবহার করিতেন না। রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষকের উপরে হাড়ে চটা ছিলেন; কখনো ইঁহার সহিত কথা কহেন নাই, ক্লাসে পড়া জিজ্ঞাসা করিলেও রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তর করিতেন না। ইহার জন্য অনেক সময় তাঁহাকে খুব কঠিন শাস্তি পাইতে হইয়াছে··· এত কঠিন শাস্তি দিয়াও হরনাথ পণ্ডিত রবিকে কথা বা পড়া বলাইতে পারেন নাই।

—'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। সখা ও সাথী, শ্রাবণ ১৩০২

হরনাথ, গল্পে শিবনাথ নাম ধারণ করিয়াছেন।

[৮] তুলনীয় : জীবনস্মৃতি, 'নানাবিদ্যার আয়োজন'; ছেলেবেলা, অধ্যায় ৭।

[৯] অনেক বছর আগে, ক্ষুধিত পাষাণ পড়বার অনেক বছর পরে, যখন ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়, তখন তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ হাবভাব এবং কথাবার্তা দেখে মনে হয়েছিল ট্রেনের সহযাত্রী বুঝি তিনিই। রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন যে, ঠিক অঘোরনাথ নন; তবে খানিকটা তিনি, আর খানিকটা ঐ হায়দ্রাবাদেরই ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে—যিনি এক সময়ে St. Petersburg Universityতে সংস্কৃতের lecturer ছিলেন—দেখে (ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল) ট্রেনের সহযাত্রীর ছবিটি আঁকেন।··· 'থিয়সফিস্ট বন্ধু'টি দ্বিজেন্দ্রনাথের জামাতা মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

—শ্রীঅমল হোম। শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে লিখিত পত্র

অঘোরনাথের সহিত আমার আলাপ পঠদ্দশার প্রারম্ভে···বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণ'এর বক্তা ইনি। ডাক্তারই রবীন্দ্রবাবুকে ঐরূপ ভাবে ঐ উদ্ভট গল্পটি বলেন। যাঁহারা ডাক্তারকে ভালো করিয়া জানিতেন তাঁহারা এ খবরে কিছুমাত্র আশ্চর্যান্বিত হইবেন না।

—ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী। স্মৃতিকথা। নব্যভারত, পৌষ ১৩২৪

[১০] প্রবাসী, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৯, পৃ ৩৪৪।

[১১] শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধ্যাপকদের লইয়া এইরূপ গল্প রচনার কথা পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকে মিলিয়া 'মুখে মুখে গল্প রচনা করা'র কথা শ্রীসীতা দেবীও লিখিয়াছেন।—

একদিন আমরা কবির কাছে বসে আছি, কবি তখন বললেন, একটা কৌতুক-জনক বিষয় মনে হচ্ছে—বিষয়টি একটি গল্পের অবয়ব রচনা নিয়েই এইরূপ—আমি একটি গল্প শুরু করে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে যখন থামব, আমার ডান দিকের পরবর্তী অধ্যাপক গল্পের ধারা রক্ষা করে নিজ উদ্ভাবনা-অনুসারে গল্পাংশ রচনা

করে আমার গল্পের মুখে যোজনা করবেন। পরবর্তী অধ্যাপকগণ এইভাবে ক্রমে ক্রমে সংগতি রক্ষা করে গল্পের অবয়ব রচনা ও যোজনা করে তাঁদের পালা সমাপ্ত করলে, আমি শেষে গল্পের উপসংহার করব। কবির কথায় সকলে সম্মতি দিলেন। গল্পও আরম্ভ ও সমাপ্ত হল। কিন্তু এই গল্পটির একটুও মনে হয় না, সে অনেক দিন পূর্বেরই কথা।

—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কবির কথা

পাঁচ-ছয়জন মিলিয়া মুখে মুখে গল্প রচনা করার একটা খেলা তাঁহারা খেলিতেন, সে কাহিনীও শুনিলাম। দলের একজন গল্পকে নানা লোমহর্ষণ অবস্থায় ফেলিয়া হাল ছাড়িয়া দিতেন, উদ্ধারের ভার পড়িত রবীন্দ্রনাথের উপর। অনেক সময় গল্পের আদি ও অন্ত দুয়েরই তাল সামলাইতে হইত তাঁহাকে। 'দুরাশা' 'গুপ্তধন' প্রভৃতি অনেক গল্পই নাকি এইভাবে রচিত হইয়াছিল।

—শ্রীসীতা দেবী। পুণ্যস্মৃতি

[১২] বিপিনচন্দ্র পাল-রচিত 'মৃণালের কথা', নারায়ণ, অগ্রহায়ণ ১৩২১। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' লইয়া তৎকালে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ আন্দোলন হয়।

[১৩] শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় আরও লিখিয়াছেন—'নিজে বেশি উপন্যাস লেখেন নি, কিন্তু নূতন উপন্যাসের প্লট ছিল যেন তাঁর হাত-ধরা! বন্ধুবর চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐভাবে রবীন্দ্রনাথের মুখে মুখে সৃষ্ট কয়েকটি আখ্যানবস্তুর সদ্ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।'

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'স্রোতের ফুল' 'দুই তার' 'হেরফের' ও 'ধোঁকার টাটি' উপন্যাসের 'কাঠামো' 'আভাস' বা 'মূল ধারা' রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। প্রথম তিনখানি গ্রন্থে সে কথা স্বীকৃত আছে; চতুর্থখানির কথা 'রবি-রশ্মি' পশ্চিম ভাগের পরিশিষ্টে উল্লিখিত।

[১৪] শ্রীসুধীরচন্দ্র কর, কবি-কথা, পৃ ৪৪।

সম্প্রতি (২৮.১২.১৯৬৩) শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে জানাইয়াছেন : নির্মোক বইয়ের 'অমর'-নামক চরিত্রটি এই প্লটের সাহায্যে আমি এঁকেছি।

যে পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের প্লট লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন সেটি শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' (১৩৭৫) গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহারই সৌজন্যে লব্ধ নকল হইতে উহার প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে সংকলিত হইল—

সময়টা সেকালের প্রান্ত-ঘেঁষা। মাঠাকরুন বড়ো ঘরের ঘরণী—স্বামী-সহকারে চলেছেন তীর্থপরিক্রমে। শেমিজ-জুতোয় লজ্জা, অশ্বযানে সংকোচ, বাল্যাবধি পাল্কি-বাহিনী, আধুনিক পন্থায় স্বামীর তত আপত্তি ছিল না, কিন্তু যে সনাতনী আচার শ্বশুরকুলের বংশানুগত আভিজাত্য আঁকড়ে ছিল তার কোনো বাত্যয় গৃহিণী সইতে পারতেন না, যদিও পুরুষমানুষের অনাচারে ধৈর্য রক্ষা করতে অগত্যা অভ্যস্ত হয়েছিলেন। তাঁর ছেলেটি আধুনিক লোরেটোতে শিক্ষিত মেয়েকে বাছাই ক'রে বাপ-মায়ের অগোচরেই বিয়ে করেছিল, মেয়েটির বয়স গৌরীর কাছাকাছি যায় নি ব'লে দুঃসহ ক্ষোভ পরিবারে একদা আলোড়িত হয়েছে। অল্পদিনে প্রমাণ

হল এমন সতীলক্ষ্মী মেয়ে হয় না—এমন-কি যে-সকল আচারে ও পূজার্চনায় তার অভ্যাস ও বিশ্বাস ছিল না তারও খুঁটিনাটি সে মেনে চলত, স্বামী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-উত্তেজনার বৃথা চেষ্টা করত। একটা কথা মেয়েটি বুঝতে পারত না, কেন স্বামীসহবাস থেকে সে বঞ্চিত ছিল। সে সমস্যার ইতিহাস এই, স্বামীর স্বভাব-চরিত্র ভালো কিন্তু একবার পদস্খলন হয়ে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছে ভয় নেই, কিছুকাল চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ হবে। সেই আশ্বাসে শ্বশুরের একান্ত ব্যস্ততায় ও সুন্দরীর লোভে সে বিয়ে করলে কিন্তু সংক্রামক সঙ্গ-বিপত্তি থেকে স্ত্রীকে বাঁচিয়ে চললে। রোগ-উপশমের বাহ্য লক্ষণ যতই আশ্বাসজনক হোক তবু ভয় ছিল রোগটা পাছে সন্তানপরম্পরায় সংক্রামিত হয়। এ দিকে স্ত্রীর বিশ্বাস এই সংযম স্বামীর অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক শুচিতার লক্ষণ। তাই জোড় মিলাবার চেষ্টায় নিজের প্রবৃত্তিও দমন করে চলত। অবশেষে হঠাৎ একটা অসংযমের উদ্দীপনার মুখে স্বামীকে অপরাধ স্বীকার করতে হল। ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া। স্ত্রীর গৃহত্যাগ অথচ অন্তরের মধ্যে নিরন্তর জ্বলুনি। একবার শাশুড়ির পায়ের ধুলো নেবার প্রলোভনে স্টেশনের নিকটবর্তী গাছতলায় দুর্যোগের অপরাহ্নে যা ঘটল তার আভাস পেয়েছ। ছেলেটার কলঙ্ক অথচ চরিত্রমাহাত্ম্যের কথা চিন্তা করে দেখো। ইতি ৮ চৈত্র ১৩৪৫

[১৫] এ প্রসঙ্গে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক—সানাই'এর 'পরিচয়' ও 'বাসাবদল' কবিতার 'অবিচ্ছিন্ন আদিপাঠ', রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৪৮৩-৮৬।

[১৬] দ্রষ্টব্য : 'রবি-রশ্মি' পশ্চিম ভাগ (প্রথম সংস্করণ) পৃ ৩৫৮।

[১৭] পরবর্তী তালিকা-ধৃত ৫১-সংখ্যক গল্পের (পৃ ১০৩৭) ১৫-সংখ্যক টীকা (পৃ ১০৪০-৪১) দ্রষ্টব্য।

[১৮] কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবী। ইঁহার রচিত আরও কতকগুলি গল্প 'ভারতী' 'সবুজপত্র' প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়।

প্রত্যেকটি গল্পের সঙ্গে একটি করিয়া কবিতা মুদ্রিত হইয়াছে—বহু ক্ষেত্রেই একই ভাব হইতে গল্প ও কবিতা রচিত। পূর্ববর্তী সূচীতে যে দুইটি করিয়া রচনার নাম একত্র উল্লিখিত হইয়াছে তাহার প্রথমটি গল্পের শিরোনাম, ০ চিহ্নিত দ্বিতীয়টি কবিতার প্রথম ছত্র।

গল্পসল্পে সংকলিত হইতে পারিত অথচ হয় নাই এরূপ দুইটি রচনার বিষয় সম্প্রতি জানা গিয়াছে—ইঁদুরের ভোজ, ০ ওকালতি ব্যবসায়ে ক্রমশই তার। এ দুটি রচনা সমকালীন 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রে রবীন্দ্রনাথ পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনী দেবীর নামে প্রকাশ করিতে দেন। ভবিষ্যতে গল্পসল্পে সংযোজিত হইতে পারিবে।

অধিকাংশ গল্প ও কবিতা ১৯৪১ জানুয়ারি-মার্চে রচিত।

২৭ ॥ গল্পগুচ্ছ ॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত প্রবেশিকাপাঠ্য সংস্করণ। সূচী ॥ দেনাপাওয়া, পোস্ট্‌মাস্টার, গিন্নি, রামকানাইয়ের নিরবুদ্ধিতা, ব্যবধান, সম্পত্তিসমর্পণ, মুক্তির উপায়, জীবিত ও মৃত, স্বর্ণমৃগ, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, দানপ্রতিদান, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪

মন্তব্য

প্রথম প্রকাশের কালক্রমে গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ।

প্রতি গ্রন্থের সূচী-সংকলনের পরে যে প্রকাশ-তারিখ দেওয়া হইয়াছে তাহা বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ হইতে গৃহীত। গল্পসপ্তক এলাহাবাদে মুদ্রিত বলিয়া বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ-ভুক্ত হয় নাই।

ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস-কর্তৃক প্রকাশিত পাঁচ খণ্ড গল্পগুচ্ছের যে সংস্করণের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা যে ঐ প্রকাশালয়ের প্রচারিত গল্পগুচ্ছের প্রথম মুদ্রণ, সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া যায় নাই। তবে বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে প্রদত্ত মুদ্রাকর ইত্যাদির বিবরণ হইতে যতদূর জানা যায় তাহাতে, চতুর্থ খণ্ড ব্যতীত, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে উল্লিখিত ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের প্রথম মুদ্রণ ও এই পঞ্জীতে উল্লিখিত পুস্তক একই বলিয়া বোধ হয়।

১৯০৮-১৯০৯ সালে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ করেন। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে এগুলিকে দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ; ১৩০৭ সালে মজুমদার এজেন্সী/লাইব্রেরী-কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণকে প্রথম সংস্করণ ধরা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস-প্রকাশিত পঞ্চমখণ্ড গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি নূতন, ১৩০৭ সালের গল্পগুচ্ছে সেগুলি ছিল না ; সুতরাং নাম-সাম্য থাকিলেও এই খণ্ডটিকে নূতন গ্রন্থ বলা অসংগত নহে।

সাময়িক পত্রে

প্রকাশ

১	ভিখারিণী[১]	ভারতী	শ্রাবণ-ভাদ্র ১২৮৪
২	করুণা[১]	ভারতী	আশ্বিন ১২৮৪ - ভাদ্র ১২৮৫
৩	ঘাটের কথা	ভারতী	কার্তিক ১২৯১
৪	রাজপথের কথা[২]	নবজীবন	অগ্রহায়ণ ১২৯১
৫	মুকুট[৩]	বালক	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২
৬	দেনাপাওনা[৪]	হিতবাদী	১২৯৮
৭	পোস্টমাস্টার[৪]	হিতবাদী	১২৯৮
৮	গিন্নি[৪।৫]	হিতবাদী	১২৯৮
৯	রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা[৪]	হিতবাদী	১২৯৮
১০	ব্যবধান[৪]	হিতবাদী	১২৯৮
১১	তারাপ্রসন্নের কীর্তি[৪]	হিতবাদী	১২৯৮
১২	খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন[৬]	সাধনা	অগ্রহায়ণ ১২৯৮
১৩	সম্পত্তিসমর্পণ	সাধনা	পৌষ ১২৯৮
১৪	দালিয়া[৬]	সাধনা	মাঘ ১২৯৮
১৫	কঙ্কাল	সাধনা	ফাল্গুন ১২৯৮
১৬	মুক্তির উপায়[৭]	সাধনা	চৈত্র ১২৯৮
১৭	ত্যাগ	সাধনা	বৈশাখ ১২৯৯
১৮	একরাত্রি	সাধনা	জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯
১৯	একটা আষাঢ়ে গল্প[৮]	সাধনা	আষাঢ় ১২৯৯
২০	জীবিত ও মৃত	সাধনা	শ্রাবণ ১২৯৯
২১	স্বর্ণমৃগ	সাধনা	ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯
২২	রীতিমত নভেল	সাধনা	ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯
২৩	জয়পরাজয়	সাধনা	কার্তিক ১২৯৯
২৪	কাবুলিওয়ালা	সাধনা	অগ্রহায়ণ ১২৯৯
২৫	ছুটি	সাধনা	পৌষ ১২৯৯
২৬	সুভা	সাধনা	মাঘ ১২৯৯
২৭	মহামায়া	সাধনা	ফাল্গুন ১২৯৯
২৮	দানপ্রতিদান	সাধনা	চৈত্র ১২৯৯
২৯	সম্পাদক	সাধনা	বৈশাখ ১৩০০
৩০	মধ্যবর্তিনী	সাধনা	জ্যৈষ্ঠ ১৩০০
৩১	অসম্ভব কথা[৯]	সাধনা	আষাঢ় ১৩০০
৩২	শাস্তি	সাধনা	শ্রাবণ ১৩০০
৩৩	একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প	সাধনা	ভাদ্র ১৩০০
৩৪	সমাপ্তি	সাধনা	আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০
৩৫	সমস্যাপূরণ	সাধনা	অগ্রহায়ণ ১৩০০
৩৬	খাতা[১০]		
৩৭	অনধিকার প্রবেশ[১১]	সাধনা	শ্রাবণ ১৩০১

৩৮	মেঘ ও রৌদ্র[১২]	সাধনা	আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১
৩৯	প্রায়শ্চিত্ত	সাধনা	অগ্রহায়ণ ১৩০১
৪০	বিচারক	সাধনা	পৌষ ১৩০১
৪১	নিশীথে	সাধনা	মাঘ ১৩০১
৪২	আপদ	সাধনা	ফাল্গুন ১৩০১
৪৩	দিদি	সাধনা	চৈত্র ১৩০১
৪৪	মানভঞ্জন	সাধনা	বৈশাখ ১৩০২
৪৫	ঠাকুরদা	সাধনা	জ্যৈষ্ঠ ১৩০২
৪৬	প্রতিহিংসা	সাধনা	আষাঢ় ১৩০২
৪৭	ক্ষুধিত পাষাণ	সাধনা	শ্রাবণ ১৩০২
৪৮	অতিথি	সাধনা	ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২
৪৯	ইচ্ছাপূরণ	সখা ও সাথী[১৩]	আশ্বিন ১৩০২
৫০	দুরাশা	ভারতী[১৪]	বৈশাখ ১৩০৫
৫১	পুত্রযজ্ঞ[১৫]	ভারতী	জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫
৫২	ডিটেক্‌টিভ	ভারতী	আষাঢ় ১৩০৫
৫৩	অধ্যাপক	ভারতী	ভাদ্র ১৩০৫
৫৪	রাজটিকা	ভারতী	আশ্বিন ১৩০৫
৫৫	মণিহারা	ভারতী	অগ্রহায়ণ ১৩০৫
৫৬	দৃষ্টিদান	ভারতী	পৌষ ১৩০৫
৫৭	সদর ও অন্দর	প্রদীপ	আষাঢ় ১৩০৭
৫৮	উদ্ধার	ভারতী	শ্রাবণ ১৩০৭
৫৯	দুর্বুদ্ধি	ভারতী	ভাদ্র ১৩০৭
৬০	ফেল	ভারতী	আশ্বিন ১৩০৭
৬১	শুভদৃষ্টি	প্রদীপ	আশ্বিন ১৩০৭
৬২	যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ[১৬]		
৬৩	উলুখড়ের বিপদ[১৬]		
৬৪	প্রতিবেশিনী[১৬]		
৬৫	নষ্টনীড়	ভারতী	বৈশাখ-অগ্রহায়ণ ১৩০৮
৬৬	দর্পহরণ	বঙ্গদর্শন	ফাল্গুন ১৩০৯
৬৭	মাল্যদান	বঙ্গদর্শন	চৈত্র ১৩০৯
৬৮	কর্মফল[১৭]		
৬৯	গুপ্তধন	বঙ্গভাষা	কার্তিক ১৩১১
৭০	মাস্টারমশায়	প্রবাসী	আষাঢ়, শ্রাবণ ১৩১৪
৭১	রাসমণির ছেলে	ভারতী	আশ্বিন ১৩১৮
৭২	পণরক্ষা	ভারতী	পৌষ ১৩১৮
৭৩	হালদারগোষ্ঠী	সবুজপত্র	বৈশাখ ১৩২১
৭৪	হৈমন্তী	সবুজপত্র	জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
৭৫	বোষ্টমী	সবুজপত্র	আষাঢ় ১৩২১
৭৬	স্ত্রীর পত্র[১৮]	সবুজপত্র	শ্রাবণ ১৩২১
৭৭	ভাইফোঁটা	সবুজপত্র	ভাদ্র ১৩২১
৭৮	শেষের রাত্রি[১৯]	সবুজপত্র	আশ্বিন ১৩২১

৭৯ অপরিচিতা	সবুজপত্র	কার্তিক ১০২১
৮০ তপস্বিনী	সবুজপত্র	জ্যৈষ্ঠ ১০২৪
৮১ পয়লা নম্বর[২০]	সবুজপত্র	আষাঢ় ১০২৪
৮২ পাত্র ও পাত্রী	সবুজপত্র	পৌষ ১০২৪
৮৩ নামঞ্জুর গল্প	প্রবাসী	অগ্রহায়ণ ১০০২
৮৪ সংস্কার	প্রবাসী	আষাঢ় ১০০৫
৮৫ বলাই[২১]	প্রবাসী	অগ্রহায়ণ ১০০৫
৮৬ চিত্রকর[২১]	প্রবাসী	কার্তিক ১০০৬
৮৭ চোরাই ধন	ছোট গল্প	১১ কার্তিক ১০৪০
৮৮ রবিবার	আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয়া সংখ্যা	২৫ আশ্বিন ১০৪৬
৮৯ শেষকথা[২২]	শনিবারের চিঠি	ফাল্গুন ১০৪৬
৮৯ ছোটো গল্প[২২]	দেশ	৩০ অগ্রহায়ণ ১০৪৬
৯০ ল্যাবরেটরি	আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয়া সংখ্যা	১৫ আশ্বিন ১০৪৭

নূতন সংকলন

৯১ বদনাম	প্রবাসী	আষাঢ় ১০৪৮
		রচনাকাল : ১৫-২২ মে ১৯৪১
৯২ প্রগতিসংহার	আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া	৩ আশ্বিন ১০৪৮
	পূর্বনাম : কাপুরুষ	রচনাকাল : ১১-২১ জুন ১৯৪১
৯৩ শেষ পুরস্কার[২৩]	বিশ্বভারতী পত্রিকা	শ্রাবণ ১০৪৯
		রচনাকাল : ৫-৬ মে ১৯৪১
৯৪ মুসলমানীর গল্প[২৪]	ঋতুপত্র	বর্ষা-সংখ্যা, আষাঢ় ১০৬২
		রচনাকাল : ২৪-২৫ জুন ১৯৪১

শান্তিনিকেতন-স্থিত রবীন্দ্রসদনের পক্ষ হইতে শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় জানাইয়াছেন : উল্লিখিত তালিকার শেষ চারিটি আখ্যানই মূলতঃ শ্রুতিলিখন বলিয়া মনে হয়, কেননা রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নাই। কেবল 'বদনাম' গল্পের একাংশে তাঁহার হাতে কিছু সংশোধন দেখা যায়, এবং 'প্রগতিসংহার' গল্পের বিভিন্ন কপিতে তিনি স্বহস্তে প্রচুর সংশোধন সংযোজন করিয়াছিলেন। গল্পগুলি প্রধানতঃ শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর ও শ্রীমতী রানী চন্দের হাতের লেখায় পাওয়া যাইতেছে।

উল্লিখিত তালিকার শেষ দুইটি রচনা গল্পের খসড়া বলা যাইতে পারে, রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত কপি হইতে সাময়িক পত্রে মুদ্রিত ; রবীন্দ্রনাথের হাতের কোনো সংশোধন বা সংযোজন দেখা যায় না।

একমাত্র 'ছুটির পড়া' [১৯০...
নাট্যরূপ—মুকুট [১৯০৮]।

[৪] সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটোগল্প সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ... ছোটোগল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছি...
১৩১৭

—রবীন্দ্রনাথের পত্র।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী'তে (শান্তিনিকেতন চিঠি, চৈত্র ১৩৪৬) লিখিয়াছেন—'হিতবাদীর ফাইল পাই নাই, সুতরাং কো... তারিখে কোন্ গল্প প্রকাশিত হয় বলিতে পারিতেছি না। তবে নিম্নলিখিত গল্পগুলি প্রথম ছয় সপ্তাহে বাহির হয়—

দেনাপাওনা, পোস্টমাস্টার, রামকানাইয়ের নিরবুদ্ধিতা, তারাপ্রসন্নের কীর্তি, ব্যবধান, গিন্নি।'

পোস্টমাস্টার গল্প যে হিতবাদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, চন্দ্রনাথ বসু রবীন্দ্রনাথকে লিখিত এক পত্রে (২৫ পৌষ ১২৯৮) তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। ছিন্নপত্রে (২৯ জুন ১৮৯২) রবীন্দ্রনাথও এই গল্পটির হিতবাদীতে প্রকাশের উল্লেখ করেন।

হিতবাদী প্রকাশের তারিখ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাময়িক পত্র' দ্বিতীয় খণ্ডে (আষাঢ় ১৩৫৯) দিয়াছেন : ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮, ৩০ মে ১৮৯১।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস পূর্বোক্ত রবীন্দ্ররচনাপঞ্জীতে আরো অনুমান করিয়াছেন যে, 'খাতা গল্পটিও বোধ হয় হিতবাদীতে সপ্তম সপ্তাহে বাহির হয়।'

খাতা রবীন্দ্রনাথের 'ছোট গল্প' (১৩০০) পুস্তকে প্রথম গ্রথিত হয়। হিতবাদীতে প্রকাশ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থাকায়, গ্রন্থে প্রকাশের কালক্রমে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে।

[৫] 'ছোট গল্প' (১৩০০) গ্রন্থের অন্তর্গত থাকিলেও, ১৩০৭ সালে প্রকাশিত গল্প বা গল্পগুচ্ছ গ্রন্থে গিন্নি বাদ পড়ে; 'হিতবাদীর উপহার' রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী... (১৩১১) পুনরায় মুদ্রিত হয়। ১৯০৮-১৯০৯ সালে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হা... কর্তৃক প্রকাশিত (পাঁচ ভাগ) গল্পগুচ্ছে গল্পটি বর্জিত হয়; বিশ্বভারতী-স... ...পগুচ্ছে পুনরায় মুদ্রিত।

..প, 'তাসের দেশ' (ভাদ্র ১৩৪০)।

...অন্তর্গত। সাধনায় নাম 'অসম্ভব গল্প'।

...দ্রষ্টব্য।

এরূপ একটি ঘটনা—দেশী শ্মশানঘাটে ভারতপ্রেমিক হ্যামান্ড-...কার ও দেশীয় সংবাদপত্রে তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনা, ইহা হইতে ... গল্পের প্রেরণা পাইয়াছিলেন এরূপ অনুমিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য : ...'বিদেশী অতিথি ও দেশীয় আতিথ্য' প্রবন্ধ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২। ...পত্রে একই সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধ ও 'অনধিকার প্রবেশ' গল্প পর পর মুদ্রিত হইয়াছিল।

১২ এই গল্পে উল্লিখিত বিদেশীয়-কর্তৃক এদেশীয় লোকের উৎপীড়নের ...ম্যানেজার সাহেব-কর্তৃক নৌকার পাল লক্ষ্য করিয়া গুলি করা ও পুলিস-সাহেব-কর্তৃক জেলেদের ... —রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতাপ্রসূত, ...মুখোপাধ্যায় ... (রবীন্দ্র-জীবনী ১, বৈশাখ ১৩৫৩, পৃ. ৩৩৪)।

১৩ সখা ও সাথীর ... তাঁহাদের কাগজে একটা গল্প দিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করেন।... আমি একটি নূতন ছোটো গল্প লিখিয়া সম্পাদকীয় perturbed spirit ... শান্তি দান করিয়াছিলাম। ৬ চৈত্র, ১৩০২

—রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পত্র। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৯

গল্পটি বিশ্বভারতী-গল্পগুচ্ছে প্রথম রবীন্দ্রগ্রন্থ-ভুক্ত হয়। ইতিপূর্বে রবীন্দ্র-নাথের জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত শিশুদের বার্ষিক পত্র 'পার্বণী'তে (১৩২৫) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৪ ১৩০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদক ছিলেন।

১৫ ... গল্পের লেখকের নাম ভারতীর সূচীপত্রে ছিল 'শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর'। ... বিশ্বভারতী-গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় খণ্ডে [১৩৩৩] ইহা ...গ্রন্থে স্থান লাভ করে। এ সম্বন্ধে নিম্নের চিঠিখানি দ্রষ্টব্য।—

...গল্পটি রবীন্দ্রনাথের লিখিত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। বলমাত্র উহার আখ্যানবস্তুটি আমার কাছে ছাপায় লিখিয়া খাতায়...ল...র জন্য তাঁহাকে দেখাইয়াছিলাম, তিনি উহা দেখিয়া তাহার ...

সংশোধন করিয়া ও নিজের অতুলনীয় ভাষায় লিখিয়া সেই সভায় আমার লিখিত বলিয়া পাঠ করেন, বোধ হয় সেই কারণে গল্পটি আমার লিখিত বলিয়া সেই সময় উক্ত মুদ্রণপ্রমাদ ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, পরে পুনর্মুদ্রণের সময় গল্পগুচ্ছে সে ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে শুনিয়া আশ্বস্ত ও সুখী হইলাম। ২১ ফাল্গুন ১৩৫১

—শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে লিখিত পত্র

অপিচ দ্রষ্টব্য 'সৎপাত্র'-প্রসঙ্গে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পত্র, পৃ ১০২৭।

[১৬] সাময়িক পত্রে প্রকাশের সন্ধান এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ—গল্পগুচ্ছ (মজুমদার), ১৩০৭। এই প্রসঙ্গে অনুমান—অধুনাদুর্লভ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-সম্পাদিত প্রভাত (প্রকাশ ১৩০৭) পত্রের ফাইল দেখিবার সুযোগ পাওয়া গেলে হয়তো প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান মিলিতে পারে।

[১৭] রবীন্দ্রনাথ-কৃত নাট্যরূপ, শোধবোধ [১৯২৬]।

[১৮] দ্রষ্টব্য পৃ ১০২৯, টীকা ১২।

[১৯] রবীন্দ্রনাথ-কৃত নাট্যরূপ, গৃহপ্রবেশ (১৩৩২)।

[২০] পত্রাকারে লিখিত 'স্ত্রীর পত্র' এবং প্রধানতঃ নাট্যোচিত কথোপকথনে লিখিত 'কর্মফল' প্রভৃতি বাদ দিলে এইটি 'চলিত' ভাষায় লিখিত বা প্রকাশিত প্রথম গল্প। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের সকল গল্পই পুরাপুরি চলিত ভাষায় লিখিত।

[২১] 'শান্তিনিকেতনে বর্ষা-উৎসব উপলক্ষে রচিত' ও রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক পঠিত।

[২২] 'শেষ কথা'র পাঠান্তর 'দেশ' পত্রিকার বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসংখ্যায় (৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৪৬) 'ছোটো গল্প' আখ্যায় প্রকাশিত ও বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত।

[২৩] 'এটা ঠিক গল্প নয়, গল্পের কাঠামো মাত্র। রবীন্দ্রনাথের শেষ অসুখের সময় এটি কল্পিত হয়েছিল। এটিকে সম্পূর্ণ রূপ দেবার তাঁর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা আর য়ে ওঠে নি।'—সম্পাদক

[২৪] 'এই লেখাটি পূর্ণাঙ্গ ছোট গল্প নয়। গল্পের খসড়া মাত্র···এটিই তাঁর শেষ গল্পরচনার চেষ্টা।'—সম্পাদক

শেষ অসুস্থতার সময় মুখে-মুখে বলিয়া লেখানো গল্পগুলি স্বভাবতই কবি ংবার সংশোধন করিবার প্রযত্ন করিতেন। (এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : শ্রীসুধীরচন্দ্র -লিখিত কবি-কথা, পৃ ৬০)। ৯১-৯৪-সংখ্যক গল্পগুলির যে রচনাকাল খিত হইল তাহাতে প্রথম রচনা ও শেষ সংশোধনের তারিখ সংকলন করিবার াধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে।